ছোটদের বিশ্বসেরা চিরায়ত সাহিত্য

রাজা সলোমনের রত্নাগার

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

অনুবাদ : চুনিলাল মুখোপাধ্যায়





'অদ্যাবধি লেখা সবচেয়ে বিস্ময়কর গ্রন্থ'
'কিং সলোমন'স মাইনস' উপন্যাসে নাটকীয় কল্পনার সাথে আফ্রিকা মহাদেশের ভৌগোলিক জ্ঞানকে হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড যেভাবে মিশিয়েছেন তার অন্য রচনায় তা দেখা যায় না।

স্যার হেনরির ছোট ভাই রাজা সলোমনের রত্নাগারের খোঁজে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারই খোঁজে বেরিয়ে পড়ে স্যার হেনরি, ক্যাপ্টেন গুড ও অ্যালান কোয়ার্টারমেইন। যাত্রা পথে তাদের যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় তা টানা উত্তেজনায় ভরা, এক সময় তারা কুকুয়ানাদের দেশে পৌছে যায়, সেখানে ঘটনাচক্রে তারা জড়িয়ে পড়ে এক গৃহযুদ্ধে, যুদ্ধ জয়ের পরেও চলতে থাকে তাদের অভিযান যা তাদের বারবার জীবনের শেষ সীমায় নিয়ে যায়।

কিং সলোমন'স মাইনস উপন্যাসটি ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে পাঠক মহলে সাড়া পড়ে যায়। এই উপন্যাস রচনার পিছনে একটি ঘটনা আছে। ভাইদের মধ্যে একজন হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের সাথে মজা করে জানতে চেয়েছিল যে, রবার্ট লুই স্টিভেনসনের 'ট্রেজার আইল্যান্ড' বইটির মতো কোনো উপন্যাস তিনি লিখতে পারবেন কিনা।

২৮৬৪

রাজা সলোমনের রত্নাগার

ছোটদের বিশ্বসেরা চিরায়ত সাহিত্য

রাজা সলোমনের রত্নাগার

মূল : হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

অনুবাদ : চুনিলাল মুখোপাধ্যায়

শৈশব

রাজা সলোমনের রত্নাগার
মূল : হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
অনুবাদ : চুনিলাল মুখোপাধ্যায়

KING SOLOMON'S MINES BY H. RIDER HAGGARD
First Published 1885

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭

কোড : ৩০১০

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

প্রকাশক : নাজমুন নাহার আলম
শৈশব
৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭।

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার
৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭।

মুদ্রক : কামাল প্রিন্টিং প্রেস
১৫২ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

পরিবেশক : সন্দেশ, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
বুক ক্লাব, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য: ২৯৭.০০ টাকা

ISBN-978-984-92345-1-7

অনুবাদকের উৎসর্গ

গা-ছমছমে অভিযান কাহিনীর একনিষ্ঠ পাঠক
কল্যাণীয়েষু
পৃথ্বীশ মুখোপাধ্যায়কে

সূচিপত্র

১.	হেনরি কার্টিসের সাথে দেখা	১৩
২.	সলোমনের কিংবদন্তী রত্নাগার	১৯
৩.	সাথী উমবোপা	২৬
৪.	হাতি শিকার	৩৩
৫.	বালু সাগরে অভিযান	৪০
৬.	পানি! একটু পানি!	৫০
৭.	সলোমনের রাজপথ	৫৮
৮.	কুকুয়ানাদের দেশে প্রবেশ	৭০
৯.	নৃপতি টোয়ালা	৭৭
১০.	ডাইনির খোঁজে	৮৭
১১.	সংকেত প্রদান	৯৮
১২.	যুদ্ধের প্রাক্কালে	১১০
১৩.	আক্রমণ	১১৮
১৪.	ধূসর বাহিনীর প্রতিরোধ	১২৫
১৫.	অসুস্থ ক্যাপ্টেন গুড	১৩৬
১৬.	মৃত্যুর দেশে	১৪৪
১৭.	সলোমনের রত্নাগার	১৫১
১৮.	আশা মরীচিকা	১৬০
১৯.	ইগনোসির বিদায়	১৬৭
২০.	পুনরাবির্ভাব	১৭৩

ভূমিকা

বইটি যখন মুদ্রিত হয়ে পাঠকদের হাতে যাওয়ার পর্যায়ে চলে এসেছে তৎকন আমার কেবলই মনে হচ্ছে যেন বইটির রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুতে কিছুটা অপূর্ণতা রয়ে গেছে। আমরা যা কিছু দেখেছিলাম বা করেছিলাম তার সম্পূর্ণ বিবরণ বইটিতে দিতে পারিনি বলে আমার মন খারাপ হয়ে আছে। কুকুয়ানা যাওয়ার পথে ঘটে যাওয়া আরো কয়েকটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এইরকম একটি ঘটনা হল— লৌহ জালিকার বর্ম। ঐ বর্মের জন্যই তো যুদ্ধের সময় আমরা অবিশ্বাস্যভাবে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। 'মৌন ত্রিমূর্তি' বা চুনামাটির গুহা সম্বন্ধে যে সব কিংবদন্তী আছে তা বিশদভাবে লিখলে পাঠকদের আনন্দ ও আগ্রহ নিঃসন্দেহে আরও বাড়ত। কুলু ও কুকুয়ানাদের কথ্য ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা তুলে ধরতে পারলে আমি আনন্দিত হতাম। ঐ অঞ্চলের প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে আরো বেশ কয়েকটি পাতা লেখা যেতে পারত। ঐ অঞ্চলে যে আট প্রকারের হরিণ বাস করে সে কথা এর আগে আমার জানা ছিল না। ঐ দেশের সামরিক ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লেখার মধ্যে যে কোনো ভাবে এসে গেলেও তা নিয়ে বিস্তারিতভাবে লেখা হয়নি। জুলুদের সামরিক প্রশাসনের চেয়ে কুকুয়ানাদের প্রশাসন ব্যবস্থা অনেক বেশি উন্নত ছিল। জরুরি অবস্থায় সৈন্য মোতায়ান করা এবং প্রয়োজনে আবার অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়াতে বিলম্বের কোনো অবকাশ ছিল না। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সৈনিকদের বাধ্যতামূলক ব্রহ্মাচর্য পালনের মতো অমানবিক কোনো প্রথা এখানে চালু ছিল না। কুকুয়ানারা ধাতুর প্রয়োজনীয় ব্যবহার জানত। ধাতু গলিয়ে তৈরি করা ভারি ছুরি তারা শত্রুদের তাক করে দূর থেকে ছুড়ে দিত। তবে বিশদ বিবরণের মধ্যে না গিয়ে পুরো ঘটনাগুলো আমি খুব সহজ-সরল ভাষায় লিখেছি।

আমার লেখার হাত নিপুণ না হওয়ার জন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমার হাতে কলম মানায় না; এ হাত হল রাইফেল ধরবারই উপযুক্ত। তবে চুপিচুপি একটা কথা বলে নিই– সহজ সরল জিনিসই মনের মধ্যে প্রভাব ফেলে বেশি। কথায় আছে না, ধারালো বর্শাতে অন্য কোনো জৌলুসের প্রয়োজন পড়ে না। আমার বিশ্বাস, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি ঘটনা ব্যক্ত করবার জন্য কোনো সুন্দর বাক্যের প্রয়োজন পড়ে না।

–অ্যালান কোয়ার্টারমেইন

রাজা সলোমনের রত্নাগার

১
হেনরি কার্টিসের সাথে দেখা

পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পার করে লেখার কাজে হাত লাগানো! নিজের মনের সাধ মিটলেও তা যে অন্যের হাসির খোরাক জোগাবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার লেখার বিষয়বস্তু কী? আমার পরিভ্রমণের বিবরণী। লেখা সমাপ্ত হলে তা যে কী জিনিস দাঁড়াবে সে কথা সহজেই অনুমেয়। যখন অন্য বালকরা বই পত্র নিয়ে স্কুলে যায় সেই বয়স থেকেই আমার কর্মজীবন শুরু হয়েছে বলেই জীবনে আমি যা কিছু করতে পেরেছি তার তালিকা বেশ দীর্ঘ। আমি ব্যবসা করেছি, যুদ্ধ করেছি, শিকার করেছি, এমনকি, খনি শ্রমিক হিসাবেও কাজ করেছি। আট মাস আগে এই লেখায় আমি হাত লাগিয়েছি এবং ইতিমধ্যেই সেটি বিশাল বপু ধারণ করেছে। বইটা একবার শেষ করতে পারলে আগামী দেড় বছরের মধ্যে তার একটা পাতাও আমি উল্টে দেখব না। আমি একটু ভিতু স্বভাবের লোক; মারামারি, কাটাকাটি আমার একেবারেই ভাল লাগে না। দুঃসাহসিক অভিযানের কথা শুনলেই আমি বেশ ভয়ও পেয়ে যাই। সর্বোপরি, সাহিত্য প্রতিভার রেশটুকু পর্যন্ত আমার মধ্যে নেই। তবে যে যে কারণে এই কঠিন কাজে হাত লাগানো সেগুলি হল–

প্রথমত: স্যার হেনরি কার্টিস এবং ক্যাপ্টেন জন গুড দু'জনেই চেয়েছিলেন আমি যেন নিজের অভিজ্ঞতাকে বিষয়বস্তু করে কিছু লিখি।

দ্বিতীয়ত: আমার বাঁ পায়ে ব্যথার জন্য এই সুদূর ডারবান শহরে আমি শয্যাশায়ী। একটা উদ্ভ্রান্ত সিংহ আমার ঐ পায়ে কামড়ে দিয়েছিল এবং বছরের যে সময়ে ঐ ঘটনা ঘটেছিল, প্রতি বছর একই ঋতুতে সেই ব্যথাটা মাথাচাড়া দেয়। আমি তো আগে পঁয়ষট্টিখানা সিংহকে গুলিবিদ্ধ করেছি কিন্তু ছেষট্টি নম্বরের বেলায় এই অঘটন ঘটে গেল। একেই বলে কপাল!

তৃতীয়ত: আমার ছেলে হ্যারি লন্ডনে ডাক্তারি পড়ছে। সব সময় রোগ, ওষুধ আর মড়া কাটার কাজ নিয়েই তো তার দিন কাটে। আমার ভ্রমণ কাহিনী পড়লে তার একঘেয়েমি খানিকটা কাটবে বলে মনে হয়।

চতুর্থত এবং সর্বশেষ কারণ : যে কাহিনী বলতে বলেছি তা একেবারে অনন্য সাধারণ। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এতে নারী চরিত্র নেই বললেই চলে। ফৌলাটা নামের এক মেয়েকে দেখা যাবে তবে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য। দ্বিতীয় আরেকজন নারীকে দেখা যাবে যার নাম গাগুল কিন্তু সে একশো বছরের বৃদ্ধা বলে পাঠকের কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হবে না।

এবার বোঝা ওঠানোর কাজ শুরু করা যাক। দুর্বল বলদকে দিয়ে জমি চাষ করানো যেমন কঠিন, আমার হাতের কলম দিয়ে সুপাঠ্য কিছু লেখা তেমনই এক কষ্টকর প্রয়াস; তবুও তো চেষ্টা করা প্রয়োজন।

বিচারকের সামনে খিবা ও ভেন্টভোগেলের মৃত্যুর বিবরণ দিতে গিয়ে আমাকে বলতে হয়েছিল : আমি অ্যালান কোয়ার্টারমেইন, নাটাল নামক ভূখণ্ডের অন্তর্গত ডারবান শহরের একজন ভদ্র বাসিন্দা শপথ গ্রহণপূর্বক আপনাকে জ্ঞাত করছি...।' সাক্ষ্য প্রদানের সময় না হয় এভাবে বলতে হয় কিন্তু বই লেখার শুরুতে কি এভাবে বলার অবকাশ আছে? তাছাড়া, আমি কি একজন ভদ্রলোক? 'ভদ্রলোক' কথাটার মানে কী? এদেশের কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিরা কি ভদ্রলোক নয়? এটাও সত্য, পয়সাওয়ালা শ্বেতাঙ্গ হলেই যে ভদ্রলোক হবে তা নয়। হীনমনা শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিকে কোনো অবস্থাতেই ভদ্রলোক বলা যায় না।

ব্যবসার খাতিরে আমাকে দেশ থেকে দেশান্তরে যেতে হয়। শিকারও করছি সারা জীবন। বহু নরহত্যা করলেও একটাও আমি মনের আনন্দে করিনি। জোর দিয়ে বলতে পারি, নিরীহ মানুষের রক্ত আমার হাতে কখনোই লাগেনি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের জীবন দান করেছেন কিন্তু তা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। এই বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমি সব কিছু করেছি। এই পৃথিবীতে মায়া দয়া বড় একটা দেখা যায় না, তাই সাবধানে পা ফেলতে হয়। চুরি আমি কখনো করিনি তবে এক কাফের আমার সাথে নোংরা খেলা করতে চেয়েছিল বলে আমিও তাকে ঠকিয়ে ছিলাম। তবে এতে আমার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

প্রায় আঠারো মাস আগে স্যার হেনরি কার্টিস ও ক্যাপ্টেন গুড-এর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। হাতি-শিকারের জন্য আমি বেরিয়েছিলাম। এক সময় বামাংওয়াটো অতিক্রম করলাম কিন্তু ঐ যাত্রায় আমার ভাগ্য একেবারে মন্দ ছিল। পথিমধ্যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। জ্বর কেটে গেলে ডায়মন্ড ফিল্ড নামের জায়গা পর্যন্ত আমি হেঁটেই গেলাম। ঐ সময় আমি এত হাতির দাঁত সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম যে আমার গাড়ি বোঝাই হয়ে গেল। কেপ টাউনে পৌঁছে আমি পুরো একটা সপ্তাহ আরাম করলাম। সেখানে আমি অতি সুন্দর এক বন-উদ্যান এবং পার্লামেন্ট দেখলাম। কিন্তু হোটেলে থাকবার খরচটা যেন খুব বেশি মনে হল। তাই নাটাল ফিরে যেতে মনস্থ করলাম। নাটাল যাওয়ার জন্যে আমি 'এডিনবার্গ ক্যাসল' নামের জাহাজে চড়ে বসলাম।

জাহাজের দু'জন যাত্রীর সাথে পরিচয় করবার জন্য আমি আগ্রহী হলাম। একজনের বয়স তিরিশের কাছাকাছি। তার মতো প্রশস্ত ছাতি ও লম্বা হাতওয়ালা লোক আমি আগে দেখিনি। তার চোখমুখ বেশ কাটাকাটা, গায়ে ধূসর রংয়ের বড় বড় লোম এবং চুল ও দাড়ির রঙ হলুদ। তাকে দেখে মনে হবে সে একেবারে খাঁটি ডেনমার্কের বাসিন্দা। আদি অধিবাসীদের আচার আচরণ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট ধারণা নেই ঠিক কথা, তবে আধুনিক একজন বাসিন্দার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। ঠকিয়ে সে আমার কাছ থেকে দশ পাউন্ড হাতিয়ে নিয়েছিল। একে দেখে শ্বেতকায় জুলু সম্প্রদায়ের একজন মনে হওয়াটা বিচিত্র নয়। ডেকের সিঁড়ির ওপাশটায় দাঁড়িয়ে ওরা মদ খাচ্ছিল। তার মাথার চুল ঘাড় ছাড়িয়ে অনেকটা নিচে নেমে এসেছে। চুলটা যদি আরো একটু বড় হয়ে পিঠে এসে পড়ে এবং তার এক হাতে একটা ধারালো

কুড়াল এবং অন্য হাতে মদ খাবার জন্য শিংয়ের তৈরি একটা মগ ধরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাকে একেবারে ছবির লোকটার মতোই দেখতে লাগবে। ঐ লোকটার নাম স্যার হেনরি কার্টিস।

স্যার হেনরির সাথে অন্য যে লোকটা কথা বলছিল সে ছিল বেঁটে, বলিষ্ঠ এবং তার গায়ের রঙ ছিল তামাটে। প্রথম দৃষ্টিতেই তাকে নৌ-বাহিনীর অফিসার বলেই মনে হবে। এ বিষয়ে আমার ভুল হবার কথা নয় কারণ বহু শিকার অভিযানে তাদের অনেককে আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছি। তারা যথেষ্ট সাহসী, মনের দিক থেকেও তারা সুন্দর এবং সঙ্গী হিসাবে লোভনীয়। তাদের মুখের ভাষাটাই কেবল খুবই অমার্জিত। একটু আগেই আমি প্রশ্ন করেছিলাম : 'ভদ্রলোক মানে কী? উত্তরটা আমিই দিচ্ছি। যারা জাহাজের অফিসার তারাই প্রকৃত অর্থে ভদ্রলোক। তাদের মনের সব সংকীর্ণতাকে দিগন্তহীন সমুদ্রের পানি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং বন্ধনহীন বাতাস ক্ষুদ্রতাকে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যায়।' হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ঐ বেঁটে লোকটা সত্যিই নৌ-বাহিনীর একজন অফিসার ছিল, তার বয়স একত্রিশ। সতেরো বছর ধরে লেফটান্যান্ট পদে চাকরি করবার পর সরকার তাকে সাম্মানিক কমান্ডার খেতাব দিয়ে অবসর প্রদান করেছে। সরকারি চাকরির এটাই তো প্রহসন। তারা যখন যৌবনের শিখরে পৌঁছেছে এবং সব কিছু সম্বন্ধে খানিকটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তখনই তাদের কর্মজীবনের সমাপ্তি। এতে অবশ্য তারা ভেঙে পড়ে না। আমার কথা তো আগেই বলেছি– শিকার করেই আমাকে অর্থ উপার্জন করতে হয়।

যাত্রীদের নামের তালিকা খুঁজে তার নামটিও পেয়ে গেলাম। তার নাম ক্যাপ্টেন জন গুড, তার পোশাক পরিচ্ছদ খুব পরিষ্কার, সুন্দরভাবে গালের দাড়ি কামানো এবং মজার বিষয় হল, তার কেবল একটা চোখে চশমার কাচ লাগানো থাকত। সেটা থাকত তার ডান চোখের ওপর। শুতে যাওয়ার আগে চশমার কাচটা সে পকেটে ভরে নিত, তার মুখের বেশ কয়েকটা দাঁতও বাঁধানো ছিল।

আবহাওয়া হঠাৎ এত খারাপ হয়ে গেল যে তাড়াতাড়ি দিনের আলো নিভে গেল। প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইতে লাগল এবং কুয়াশায় চারদিক ঢাকা পড়ে গেল। ডেকের ওপর থেকে লোকজন সব চলে গেল। আমি অবশ্য ইঞ্জিনের কাছাকাছি একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ইঞ্জিনের গরম হাওয়া আমার গায়ে লাগছিল এবং আমি বেশ আরাম বোধ করছিলাম। এত জোরে বাতাস বইছিল যে মনে হচ্ছিল জাহাজটা এখুনি তলিয়ে যাবে কিন্তু সেটা খুব বেশি চওড়া ছিল বলে জলের ওপর ভেসেই থাকল। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি জাহাজের পেন্ডুলামটা নিরীক্ষণ করতে লাগলাম; কখনো সেটা সামনের দিকে আসছে আবার একটু পরেই পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে। সেটার দুলুনি দেখে গতিপথের কৌণিক মাত্রা বোঝা যায়। কেউ যেন পিছন থেকে বলে উঠল : 'পেন্ডুলামটার ওজন ঠিক নেই।' ফিরে তাকিয়ে দেখি নৌ-বাহিনীর সেই অফিসার। আমি জানতে চাইলাম : 'তোমার কেন এরকম মনে হচ্ছে?'

সে উত্তর দিল : 'এখানে মনে হবার কোনো কারণ নেই। আমি খুব একটা চিন্তা ভাবনা করি না। জাহাজটা যেই দুলছে পেন্ডুলামটা ডান দিকে হেলে যাচ্ছে, এটা হল উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাব।'

ঠিক এই সময় নৈশাহারের ঘণ্টা বাজল। আমি তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। জাহাজের এইসব যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসঙ্গ এসে গেলে নৌ-বাহিনীর অফিসার যে দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের ক্লান্ত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তা আমার জানা ছিল।

ভোজনগৃহে পৌঁছে দেখি স্যার হেনরি কার্টিস ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। ক্যাপ্টেন গুড ও কার্টিস পাশাপাশি বসল এবং আমি বসলাম তাদের উল্টোদিকে। ক্যাপ্টেন ও আমি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে এক সময় আমরা হাতি শিকারের প্রসঙ্গে চলে গেলাম।

ঠিক এই সময় পাশের টেবিল থেকে কেউ যেন মন্তব্য করল : 'ঠিক লোককেই ধরেছেন। শিকারি কোয়ার্টারমেইন হচ্ছেন সেই লোক যিনি হাতিদের সম্বন্ধে শেষ কথা বলবার উপযুক্ত ব্যক্তি।'

এই মন্তব্য শুনে স্যার হেনরি বেশ সচকিত হয়ে আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল : 'তুমিই তাহলে অ্যালান কোয়ার্টারমেইন?'

আমি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম যে, পাশের টেবিলের লোকটা ঠিক কথাই বলছে।

স্যার হেনরি অস্ফুট স্বরে 'ভাগ্যবান' কথাটা উচ্চারণ করল। খাওয়া শেষ হলে স্যার হেনরির আমন্ত্রণে আমি ও ক্যাপ্টেন গুড তার কেবিনে গেলাম। আমাদের জন্য সে এক বোতল হুইস্কি আনবার অর্ডার দিল।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে স্যার হেনরি বলল : 'গত বছর এই সময় তুমি তো ট্রান্সভালের উত্তরাঞ্চলে বামাংওয়াটো নামের একটা জায়গায় ছিলে না?'

তার প্রশ্ন শুনে আমি তো তাজ্জব। এরূপ লোকও আছে যে আমার গতিবিধির ওপর সর্বদা নজর রাখে! আমার চলাফেরা যে অন্যের কৌতুহলের সৃষ্টি করতে পারে এ ধারণা ছিল না। আমি জানালাম যে তার অনুমান একেবারে সঠিক।

আমার কথা বলা শেষ হবার আগেই ক্যাপ্টেন গুড প্রশ্ন করল : 'ওখানে ব্যবসার জন্য গিয়েছিলে, তাই না?'

আমি জবাব দিলাম, 'ওখানে আমি প্রচুর জিনিস নিয়ে গিয়েছিলাম এবং যত দিন পর্যন্ত ঐ সব জিনিসপত্র বিক্রি না হয়েছে ততদিন আমি ওখানে ছিলাম।'

স্যার হেনরি আমার উল্টোদিকে বসেছিল এবং তার হাত দুটো টেবিলের ওপর ছিল। আমার মুখের দিকে ভালভাবে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল : 'আচ্ছা, ওখানে নেভিল, নামের কোনো একজন লোকের সাথে তোমার দেখা হয়েছিল?'

আমি বললাম 'হয়েছিল, আমার গাড়ি টানবার জন্য যে বলদগুলো ছিল তাদের পাশেই সে নিজের বলদগুলো রেখেছিল, এক পক্ষ কাল এইভাবে কেটেছিল, তারপর সে অন্যত্র চলে যায়। কয়েক মাস আগে এক উকিল আমাকে চিঠি পাঠিয়ে নেভিলের খবর জানতে চেয়েছিল। আমি যতটুকু জানি তাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি।'

স্যার হেনরি বলল, 'উকিলবাবু তোমার চিঠিটা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তুমি লিখেছিলে, মে মাসের গোড়ার দিকে একজন গাড়োয়ান, একজন খালাসি ও জিম নামের একজন কাফেরকে নিয়ে নেভিল ঐ জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে সে নাকি তোমাকে বলেছিল যে, ইনইয়াতি তার পরবর্তী গন্তব্যস্থল। নেভিল একথাও তোমাকে বলেছিল যে উপযুক্ত সময়ে সে গাড়িটাকেও বিক্রি করে দেবে কারণ মাল বিক্রি হয়ে গেলে খালিগাড়ি নিয়ে ঘোরার কোনো মানে হয় না। এই ঘটনার মাস দুয়েক পরে নেভিলের

গাড়িকে তুমি এক পর্তুগীজ বণিকের দখলে দেখেছিলে। ঐ বণিক তোমাকে বলেছিল যে ইনইয়াতি শহরে ঐ গাড়িটি সে এক শ্বেতাঙ্গের কাছ থেকে কিনেছে। অবশ্য বিক্রেতার নামটা ঐ সময় সে স্মরণ করতে পারেনি। ঐ বণিক আরো জানিয়েছিল যে, শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি তার ভৃত্যকে নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে গ্রমাঞ্চলের দিকে চলে গিয়েছে।'

খানিকপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে স্যার হেনরি বলল, 'আচ্ছা, মিঃ কোয়ার্টারমেইন, তুমি কি বলতে পারো, কী কারণে এবং উত্তরাঞ্চলের ঠিক কোনো প্রদেশে নেভিল চলে গিয়েছে? তোমার অনুমানের কথাই বল।'

এই প্রসঙ্গ নিয়ে বেশি আলোচনা করবার ইচ্ছা ছিল না বলে আমি শুধু বললাম, 'কিছু কথা অবশ্য আমার কানে এসেছিল।'

আমার কথা শুনে স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুড পরস্পরের দিকে অর্থবহ দৃষ্টিতে তাকাল। একটু পরে হেনরি বলতে শুরু করল, 'একটা কাহিনী তোমাকে শোনাব তারপর তোমার উপদেশ ও সহযোগিতা চাইব। নাটাল প্রদেশের অধিবাসীরা বিচক্ষণতার জন্য তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করে বলে আমার কাছে খবর আছে।'

মনে মনে একটু ঘাবড়ে গেলাম কারণ এত বড় প্রশংসা শোনার মতো মানসিক গঠন আমার নেই। আমি কোনো কথা না বলে চুপচাপ গ্লাসে চুমুক দিতে লাগলাম।

স্যার হেনরিকে এক সময় বলতে শোনা গেল, 'নেভিল ছিল আমার নিজের ভাই।'

তার কথায় আমি চমকে উঠলাম। আজ তাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম আমার খুব চেনা মনে হয়েছিল। তার ভাই চেহারায় একটু ছোট খাটো হলেও চোখের গঠন ও চোখের ভাষাতে দুজনের খুব বেশি মিল ছিল। শারীরিক বৈশিষ্ট্যও খুব একটা পৃথক ছিল না।

স্যার হেনরি বলতে শুরু করল, 'নেভিল আমার ছোট ভাই এবং একমাত্র ভাই। পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত আমরা একে অপরকে মাসাধিক কালও ছেড়ে থাকিনি কিন্তু কী যে দুঃসময় এল! আমাদের দুজনের মধ্যে জোর ঝগড়া হল এবং রাগে অন্ধ হয়ে আমি তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে ফেললাম।'

এই সময় জাহাজটা প্রচন্ডভাবে দুলে উঠল, দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটা একেবারে এদিক ওদিকে নড়ে উঠল।

স্যার হেনরি বলল, 'ইংল্যান্ডের আইন অনুযায়ী উইল না করে যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি তার বড় ছেলে পেয়ে থাকে। যখন আমার সাথে আমার ভাইয়ের মত বিরোধ চলছিল ঠিক সেই সময় আমাদের বাবা মারা যান।

"মৃত্যুর আগে বাবা কোনো উইল করে যাননি, তাই তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তির মালিক হলাম আমি। অপরদিকে, আমার ভাইটা ছিল একেবারে কর্মহীন, তার রোজগার কিছু ছিল না বললেই চলে। বাবার সম্পত্তির একটা অংশ তাকে দেওয়ার জন্য আমি খুব চেষ্টা করলেও তার তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ ছিল না।'

ক্যাপ্টেন গুড বলল : 'মিঃ কোয়ার্টারমেইন, আশা করি, এইসব ব্যক্তিগত কথা আপনি পাঁচ কান করবেন না।' পুরনো কথার খেই ধরে স্যার হেনরি বলল, 'ব্যাংকে আমার ভাইয়ের নামে মাত্র কয়েকশো পাউন্ড রাখা ছিল। একদিন পুরো টাকাটা তুলে নিয়ে ভাগ্যের খোঁজে দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে পা বাড়াল। যাওয়ার আগে সে নেভিল

নাম গ্রহণ করেছিল। এসব কথা অবশ্য পরবর্তীকালে অন্যদের মুখে শুনেছি। আমি তাকে বেশ কয়েকটা চিঠি লিখেছি কিন্তু সেগুলো বোধ হয় তার কাছে পৌঁছায়নি। যত দিন কেটেছে আমার উদ্বিগ্নতাও তত বেড়েছে। শেষে বুঝেছি, রক্তের সম্পর্ক অনেক বেশি দৃঢ়। তার শারীরিক কুশল সংবাদ যে ব্যক্তি আমাকে দিতে সক্ষম হবে তাকে আমি প্রচুর টাকা দিতে প্রস্তুত আছি কারণ এই পৃথিবীতে আমার আত্মীয় বলতে কেবল ঐ ভাইটি।

'দীর্ঘকাল কেটে গেলেও আমি ভাইয়ের কোনো সংবাদ পেলাম না। তখন আমি কিছু গোয়েন্দাকে নিযুক্ত করলাম। তাদের মাধ্যমেই আমি তোমার চিঠি পড়বার সুযোগ পেয়েছি। তোমার চিঠি থেকে জানতে পেরেছি আমার ভাই জর্জ ওরফে নেভিল কিছু কাল আগেও জীবিত ছিল। তাই আমি নিজেই খুঁজতে বের হব স্থির করলাম। আমাকে সাহায্য করতে ক্যাপ্টেন গুড রাজি হয়েছে বলেই আজ আমরা এখানে।'

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'অকালে চাকরি থেকে অবসর নিতে হল বলে আমারও হাতে কোনো কাজ নেই, তাই বেরিয়ে পড়লাম। মিঃ কোয়ার্টারমেইন, নেভিলের সম্বন্ধে তুমি যা জানো তা তোমার মুখ থেকেই শুনি।'

২
সলোমনের কিংবদন্তী রত্নাগার

ক্যাপ্টেন গুডের কথার পুনরাবৃত্তি করে স্যার হেনরি বলল : 'আমার ভাইয়ের বামাংওয়াটো যাত্রার সম্বন্ধে তুমি যা শুনেছিলে আমাকে তাই বল।'

পাইপ ধরিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে আমি ধীরে ধীরে উত্তর দিলাম : 'কী উদ্দেশ্য নিয়ে সে রওয়ানা হয়েছিল সে কথা আজ পর্যন্ত আমি কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিনি। শুনেছিলাম, রাজা সলোমনের রত্ন-খনির খোঁজ পাওয়াই তার লক্ষ্য ছিল।'

আমার কথা শুনে স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুড দু'জনেই একসাথে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল : 'কী বললে, সলোমনের খনি! এই খনির ঠিকানা কী?'

তাদের প্রশ্নের উত্তরে বললাম : 'ঠিকানা আমার জানা নেই, তবে কোথায় হতে পারে তা আমি জেনেছি। খনি অঞ্চলের পাহাড় চূড়াগুলো আমি দূর থেকে দেখেছি। মানে, আমার ও পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে ব্যবধান ছিল একটা বিশাল মরুভূমির যার বিস্তৃতি ছিল একশো তিরিশ মাইল। তবে ঐ জায়গায় কোনো শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি গিয়েছে কিনা এমন কথা আমি অবশ্য শুনিনি। রাজার রত্ন-খনির সম্বন্ধে আমি যা জানি, তা তোমাদের বলতে পারি তবে কথা দিতে হবে আমার অনুমতি ছাড়া এ বিষয় নিয়ে অন্য কারো সাথে আলোচনা করবে না তোমরা।'

তারা দু'জনেই এ বিষয়ে আমাকে আশ্বস্ত করলে আমি বলতে শুরু করলাম, 'যারা হাতি শিকার করতে যায়, তারা অন্য বিষয় নিয়ে বা কাফেরদের জীবন যাত্রা নিয়ে বিশেষ আগ্রহী হয় না। তবে সব শিকারি যে একই রকম তা নয়।

এমন দু'একজন আছে যারা স্থানীয় আদিবাসীদের অতীত সংস্কৃতিতে আগ্রহী হয়ে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের আংশিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে। আজ থেকে বছর তিরিশ পূর্বে আমি যখন প্রথম হাতি শিকারে এসেছিলাম তখন ঐ রকম একজন লিপিকারের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। রাজা সলোমনের খনির কাহিনী আমি তার মুখেই প্রথম শুনেছিলাম। তার নাম ছিল ইভানস। পরের বছর এক আহত মহিষের গুঁতোয় সে মারা যায় এবং জাম্বেসি জলপ্রপাতের কাছে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। ট্রান্সভালের লিডেনবার্গ জেলায় আমি কিছু পুরনো যুগের শিল্পকলার নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলাম। অতি সম্প্রতি সোনার সন্ধানে বেরিয়ে কয়েকজন অভিযানকারী এই ধরনের নিদর্শন দেখতে পেয়েছে। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

একটা বড় পাহাড়কে কেটে তার মধ্য দিয়ে গাড়ি যাওয়ার রাস্তা বানানো হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, ঐ পাহাড়ি রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে সোনা কিংবা দামি পাথরের

স্তূপ পাওয়া যাবে। আমার কথা শুনে ইভানস বলেছিল : তুমি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে পাহাড়ি রাস্তার শেষ প্রান্তে একটা সুন্দর শহরের ধ্বংসাবশেষ আছে। লোকে বিশ্বাস করে বাইবেলে ওফির নামে যে শহরের উল্লেখ আছে, এটাই সেই শহর। ইভানস যা বলেছিল কয়েক শতাব্দী পূর্বে জ্ঞানী লোকেরাও একই কথা বলেছিল। ঐ সময় আমার বয়স অল্প ছিল বলে আমি তার সব কথা গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনেছিলাম এবং প্রাচীন সভ্যতা ও রাশিকৃত সোনা আমার কল্পনাকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। সলোমনের খনির কথা আমি শুনিনি বলায় ইভানস জোর দিয়ে বলেছিল : 'সলোমনের বেশ কিছু সংখ্যক খনি ছিল মানে বেশ কয়েকটা হিরার খনি ছিল। মাসুকুলুমবোয়ে দেশের উভয় পশ্চিমে একটা পর্বত আছে তার নাম সুলিমান পর্বত। এই নামকরণের পিছনে একটা গূঢ় ইঙ্গিত কাজ করছে।'

ইভানসকে প্রশ্ন করেছিলাম : 'তুমি এসব জানলে কী করে?'

সে উত্তর দিয়েছিল : 'সলোমন অপভ্রংশ হয়ে সুলিমান (আরবি ভাষায় সলোমন শব্দকে সলিমান বলা হয়)। মানিকা দেশের এক ইশানুসি বা ডাইনিদের গুণিন আমাকে বলেছিল, ঐ পাহাড়ের আশেপাশে যে সব লোক বাস করে তারা 'জুলু' সম্প্রদায়ের এক শাখা থেকে উদ্ভূত এবং তারা যে ভাষায় কথা বলে তার সাথে জুলুদের ভাষার সাদৃশ্য আছে। এখানকার অধিবাসীরা বিশ্বাস করে বহুকাল আগে যখন সারা পৃথিবীটা তমসাচ্ছন্ন ছিল তখন ঐ অঞ্চলে কতিপয় শ্বেতকায় ব্যক্তি এসেছিল যারা তাদের অনেক কিছু শিখিয়েছিল, এমনকি উজ্জ্বল পাথরের খনির রহস্যও তাদের কাছে অজানা ছিল না।'

ইভানস-এর কথা শুনতে ভাল লাগলেও আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। আসলে এখন পর্যন্ত হিরার খনি কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে ইভানসের বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে, সুলিমান পর্বত অভিমুখে সে রওয়ানা দেয় এবং পথিমধ্যে মারা যায়। প্রায় কুড়ি বছর যাবৎ তার কথা আমার মনেও পড়েনি। কুড়ি বছর বাদে এক হাতি শিকারি আমাকে সুলিমান পর্বত এবং ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাদের কথা শুনিয়েছিল। শিকারের খোঁজে মানিকা দেশ ছাড়িয়ে সিতান্দা ক্রাল বলে একটা জায়গায় পৌঁছলাম। ও সে কী জায়গা! না আছে খাবার-দাবার, না আছে শিকার। ওখানে গিয়ে আমি তো জ্বরে পড়ে গেলাম। ঐ সময় একজন পর্তুগীজের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তার সঙ্গে একজন নিম্ন বর্গের লোকও ছিল। দেলাগোয়া পর্তুগীজরা যে কী ধরনের মানসিকতার লোক তা বোধ হয় তোমরা জানো। অন্য মানুষদের ভাবাবেগ ও পরিশ্রমের সুযোগ নিতে হলে তাদের ক্রীতদাস বানাতে হয়, একথা ঐ পর্তুগীজদের চেয়ে ভাল কেউ আর জানে না। কিন্তু ঐ লোকটা পর্তুগীজ হলেও একেবারে অন্য মানসিকতার ছিল। সে ছিল রোগা, লম্বা, তার গোঁফ ছিল ধূসর রঙের এবং চোখ ছিল কালো। লোকটা ভাঙা চোরা ইংরেজি বলতে পারত এবং আমিও কিছুটা তার ভাষা বলতে পারতাম। ফলে ভাব বিনিময়ে আমাদের তেমন অসুবিধা হয়নি। তার নাম ছিল হোসে ডা সিলভেস্ট্রা এবং দেলাগোয়া উপসাগরীয় অঞ্চলে ছিল তার বাড়ি। একদিন পর দেখা হলে অতীত দিনের কায়দায় মাথার টুপি খুলে সে বলেছিল, 'বিদায়, যদি আমাদের আবার কখনো দেখা হয়, সেদিন আমি কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হিসাবেই তোমার সাথে কথা বলব। তোমার ব্যবহার আমি কখনোই ভুলব

না।' বিদায় নিয়ে সে পশ্চিমের মরু প্রান্তর অভিমুখে চলে গিয়েছিল। কী খুঁজতে সে গিয়েছিল তা বুঝতে পারিনি বলে তাকে উন্মাদ মনে হয়েছিল।

এক সপ্তাহ পরের ঘটনা। আমার জ্বর সেরে গেলেও আমি তখনও বেশ দুর্বল। আমার তাঁবুর সামনে বসে আমি একটা মুরগির ঠ্যাং চিবাচ্ছি, মরু প্রান্তরের ওপারে পশ্চিম দিগন্তে তখন সূর্যাস্ত হচ্ছে, এই সময় একজন লোককে আসতে দেখলাম। তিনশো ফুট দূরে থাকলেও আগন্তুক যে একজন ইউরোপের লোক তার পরনের লম্বা কোটই সে কথা বলে দিচ্ছিল। লোকটা অল্প সময়ের জন্য হাঁটছিল, তারপর হাত ও পায়ের ওপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছিল। এই দৃশ্য দেখে আমি তৎক্ষণাৎ আমার লোকজনদের পাঠালাম তাকে সাহায্য করবার জন্য। অনুমান করতে পারো, কে এই লোকটা।

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'তুমি তো এইমাত্র হোসে ডা সিলভেস্ট্রার কথা বলছিলে। বিপাকে পড়া লোকটা সে ছাড়া আর কে হতে পারে?'

আমি বললাম : 'একেবারে সঠিক অনুমান করেছ। যে লোকটাকে আমি এক সপ্তাহ আগে দেখেছিলাম এ যেন তার কঙ্কাল। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, শরীরে মাংস নেই, চুল সাদা।'

পান্ডুরোগ হলে মুখের রঙ যেমন হলদে হয়ে যায়, তার মুখটাও সেই রকম।

'জল দাও, একটু পানি, বলে সে চিৎকার করছে। শরীরের জলের পরিমাণ কমে যাওয়ায় তার ঠোঁট ফেটে গিয়েছে। ফোলা, কালো ও শুকনো জিভটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

'জলের সাথে একটু দুধ মিশিয়ে তাকে দিতেই এক চুমুকে সেটা পান করল সে। পর মুহূর্তে তার শরীরের উত্তাপ বেড়ে গেল এবং সুলিমান পর্বত নিয়ে সে ভুল বকতে লাগল। মরুভূমি, হিরা ইত্যাদি নিয়ে সে বিড় বিড় করে কিছু যেন বলছিল। তাকে আমি তাঁবুর ভিতরে নিয়ে গেলাম এবং আমার যতটুকু সাধ্য সেই মতো তার সেবা শুশ্রূষা করলাম। রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় সে একটু শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলে দেখি, সে বিছানায় বসে আছে কিন্তু তার চোখ দুটি যেন মরু প্রান্তরের অপর দিকে কোনো কিছু দেখবার চেষ্টা করছে। ওদিকে উদীয়মান সূর্যের প্রথম কিরণ একশো মাইল দূরে অবস্থিত সুলিমান পর্বতের চূড়াকে রাঙিয়ে দিল।

মৃতপ্রায় লোকটি তার শীর্ণ, লম্বা হাত উঠিয়ে পাহাড়ের চূড়াকে নির্দেশ করে বলল : 'ঐ সেই জায়গা যেখানে আমি তো দূরের কথা, কোনো মানুষ কোনোদিন পৌঁছাতে পারবে না।'

এইটুকু বলে সে থামল, পুনরায় মনের জোর সংগ্রহ করে সে বলল : 'বন্ধু আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তুমি কি এখানেই আছো?'

আমি তার পাশেই আছি শুনে সে পুনরায় বলতে শুরু করল : 'দেখ, আমার শেষ সময় উপস্থিত। তোমার সহৃদয় আচরণের জন্য আমার কাছে যে কাগজটি আছে তা তোমাকে দিয়ে যাব। ঐ বালুকা-সাগর আমার সঙ্গীকে গ্রাস করেছে এবং আমাকেও রেহাই দেয়নি। তবে তুমি হয়ত পারবে মরুভূমির ঐ কিনারায় পৌঁছাতে।'

পকেট হাতড়ে সে একটা ছোট চামড়ার থলি বের করে আনল; সেটা আমার হাতে তুলে দিয়ে খুলতে বলল। তার কথা মতো কাজ করে থলির ভিতর থেকে একটা হলুদ কাপড়ের টুকরো পেলাম। সেটার মধ্যে একটা কাগজের টুকরো ছিল।

খুব পরিশ্রম করে সে বলতে লাগল : 'ঐ কাগজে কী লেখা আছে তা পড়ে নিতে আমার কয়েক বছর লেগেছিল। আমার কোনো এক পূর্ব পুরুষ রাজনৈতিক কারণে দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম পর্তুগীজ যিনি এই দেশে এসেছিলেন এবং তিনিই প্রথম শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি ঐ সুলিমান পার্বত্য অঞ্চলে পা রেখেছিলেন। সে সব প্রায় তিনশো বছর পূর্বেকার ঘটনা। তাঁর নাম ছিল হোসে ডা সিলভেস্ট্রা। ঐ অঞ্চলেই তিনি দেহত্যাগ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিচারক এই চামড়ার থলিটি উদ্ধার করে আমাদের বাড়িতে দিয়ে আসে। পরিচারকটি অবশ্য তার মনিবের সাথে পার্বত্য অঞ্চলে যায়নি। মনিব তাকে পাহাড়ের এপাশে থাকবার জন্যই আদেশ দিয়েছিলেন। কাগজটি আমাদের জিম্মায় থাকলেও কেউ তা পড়েনি বা পড়বার চেষ্টাও করেনি। পরে এটি আমার হাতে এলে আমি কৌতুহলী হয়ে উঠি। এই অপার কৌতুহল আমার বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। আমি পারলাম না, তবে তুমি হয়ত পারবে পৃথিবীর সব চেয়ে ধনী ব্যক্তি হতে। একটা অনুরোধ, কাগজটা অন্য কাউকে দিও না।'

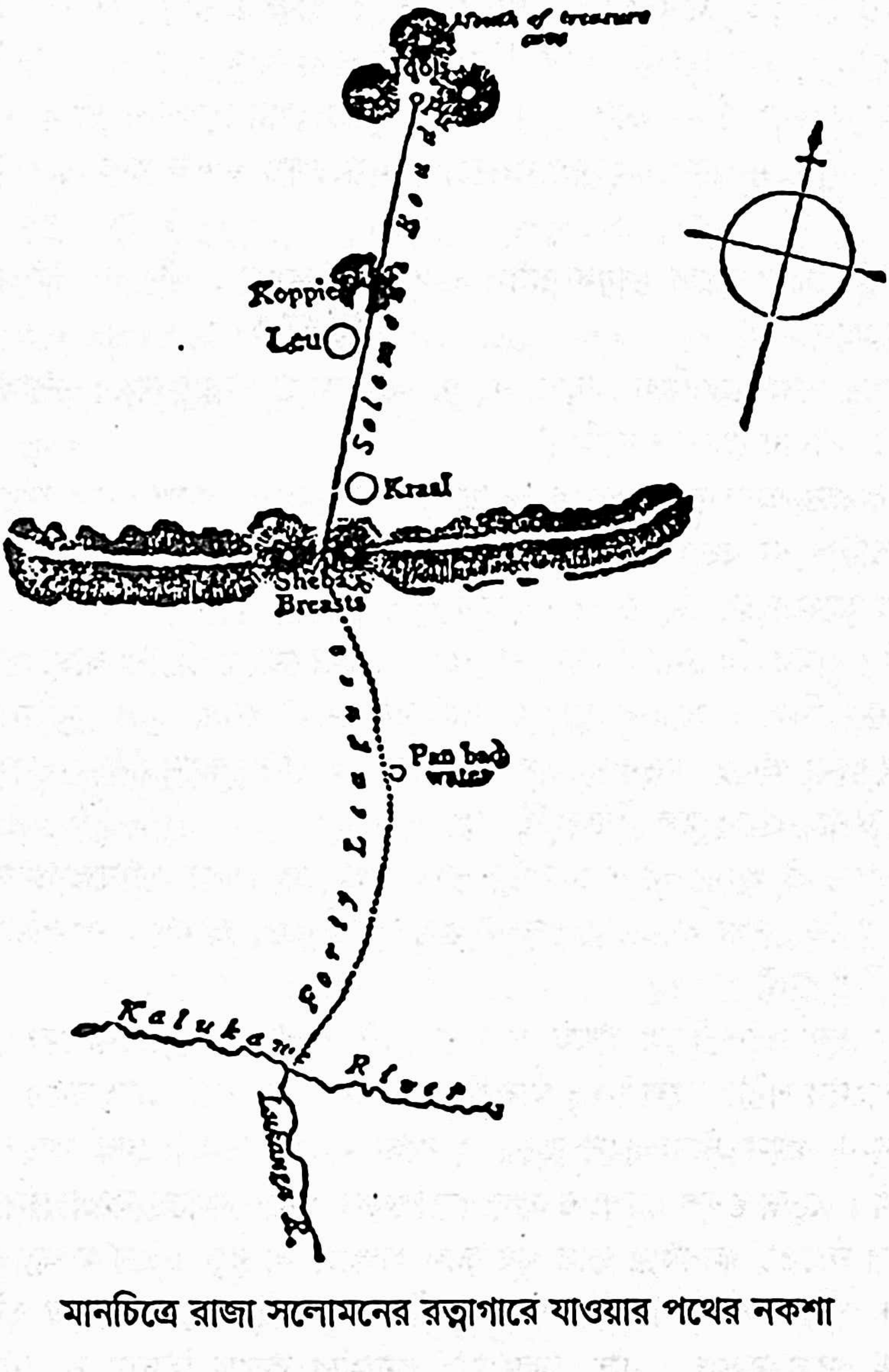
একটু পরেই সে মারা গেলে বালি খুঁড়ে আমি তাকে কবর দিয়েছিলাম। শেয়ালে যাতে তার কবর খুঁড়তে না পারে সে জন্য মৃতদেহের ওপর বেশ কিছু বড় বড় পাথরও চাপিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর ঐ জায়গা ছেড়ে আমি চলে আসি।

স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুড দুজনে প্রায় একই সাথে গভীর কৌতুহলের সাথে সেই কাগজটা কোথায় রাখা আছে জানতে চাইল।

আমি উত্তর দিলাম, 'তোমাদের বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই, ঐ কাগজটা অনেক দিন আগে এক পর্তুগীজ বণিককে দেখিয়ে ছিলাম। সে এর অনুবাদ করে দিয়েছিল। কিন্তু আমার কোনো আগ্রহ না থাকায় বিষয়টা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। তবে হ্যাঁ, ইংরেজি অনুবাদের একটা কপি আমার ব্যাগেই আছে। ঐ রাস্তার মানচিত্রের একটা কপিও আছে আমার সাথে তবে মূল কাগজপত্র ডারবান শহরে আমার বাড়িতে রাখা আছে।

'আমার ব্যাগ খুলে অনুবাদের কপিটা বের করে আমি ওদের সামনে তুলে ধরলাম। এতে লেখা আছে : আমার নাম হোসে ডা সিলভেস্ট্রা। এখানে উত্তর দিকে দুটো পাহাড়ের চূড়া আছে। আমি এদের নাম দিয়েছি 'শেবা-র স্তন।' এখন ১৫৯০ সাল চলছে। এখানকার একটা গুহায় আমি থাকি। কয়েক দিন ধরে খেতে না পেয়ে আমি মরতে বসেছি। আমার ভৃত্যটি যদি আমার মৃত্যুর পর এখানে আসে তাহলে সে যেন এই চিঠিটি নিয়ে দেলাগোয়াতে আমার বন্ধুর কাছে যায় (বন্ধুর নাম অস্পষ্ট)। বন্ধুর কাজ হবে গোটা বিষয়টা দেশের রাজার নজরে আনা। রাজা যদি বিশ্বের এক নম্বর ধনী ব্যক্তি হতে ইচ্ছুক হন তাহলে তিনি যেন সেনাবাহিনী পাঠান যারা মরু প্রান্তর অতিক্রম করে কুকুয়ানা নামক সাহসী আদিবাসীদের পরাজিত করে এই জায়গায় এসে পৌছাতে পারে। আদিবাসীরা যে দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান তা নয়, তারা অনেক তুক-তাক, মন্ত্র-তন্ত্র জানে। সেই কারণে এই বিষয়ে যাদের জ্ঞান আছে তাদেরও যেন সেনাবাহিনীর সাথে প্রেরণ করা হয়। এই গুহার মধ্যে আমি রাজা সলোমনের রত্নাগার দেখেছি। সেই রত্নাগার তো প্রবাদ স্বরূপ। সেখানে এত হিরা আছে যা মানুষ কল্পনা পর্যন্ত করতে পারবে না। গাগুল নামে এখানে এক মায়াবী নারী আছে। তার চোখ এড়িয়ে একটি হিরাও নিয়ে যাওয়া যাবে না। এই চিঠির সাথে

রত্নাগারে পৌছাবার যে রাস্তা আছে তার মানচিত্রও দিলাম। যদি কেউ এখানে আসতে সক্ষম হয় তার প্রথম কাজ হবে গাগুলকে হত্যা করা। বিদায় : হোসে ডা সিলভেস্ট্রা। চিঠি ও রাস্তার মানচিত্র দুটোই লেখকের শরীরের রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে।'



মানচিত্রে রাজা সলোমনের রত্নাগারে যাওয়ার পথের নকশা

বেশ খানিকক্ষণ নীরবতার পর ক্যাপ্টেন গুড মন্তব্য করল, 'জাহাজে করে সারা পৃথিবীটা আমি দুবার ঘুরেছি কিন্তু এইভাবে যে চিঠি লেখা যায় তা আমি কখনো শুনিনি। সত্যি বল তো, তুমি কি আমাদের বোকা বানাতে চাইছো?'

তার কথায় আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। আমি বললাম : মিথ্যা কথা বলে নিজেকে খুব বুদ্ধিমান বলে জাহির করা কিংবা কল্পিত শিকার কাহিনীর কথা শুনিয়ে নিজেকে বীর বলে তুলে ধরবার মতো প্রবৃত্তি আমার নেই। যাই হোক, তোমাদের বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাসে আমার কিছু যায় আসে না। কথাগুলো বলে চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখার জন্য উঠে দাঁড়াতেই হেনরি আমার কাঁধে হাত রেখে

বলল : 'মিঃ কোয়ার্টারমেইন, তুমি আমাদের ভুল বোঝ না। তোমার কাহিনী এতই অভিনব যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।'

আমি বললাম : 'তোমরা যদি চিঠি ও মানচিত্রের মূল কপি দেখতে চাও তাহলে ডারবান পৌঁছে তা দেখতে পারি।' একটু চিন্তা করে দেখলাম, আমার বলা কাহিনীটা এত বিস্ময়কর যে চট করে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। অতএব তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এবার প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে আমি বললাম : তোমার ভাই নেভিলের সম্বন্ধে আমার বলা হয়নি। তার সাথে বেচুয়ানা দেশের বাসিন্দা জিম নামের একটা সঙ্গী ছিল। যেদিন সকালে নেভিল রওয়ানা দেয় জিম তখন আমার গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি প্রশ্ন করেছিলাম : 'কী হল জিম, এবার কি হাতি শিকার হবে না?'

তার উত্তরে জিম বলেছিল : 'বস, এবার আর হাতির দাঁত নয়। এবার যার খোঁজে যাচ্ছি তা হল সোনার চেয়েও দামি।'

জিমের কথায় অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে বা কৌতুহল প্রকাশ করে নিজেকে খাটো করতে মন চাইল না বলে আমি চুপ করে গেলাম। একটু পর জিম নিজের থেকেই বলল : এবার আমরা চলেছি হিরার সন্ধানে।

'তা হলে তোমরা নিশ্চয়ই হিরার খনি যেখানে আছে, সেদিকে যাচ্ছ?'

জিম উত্তর দিল : মাটির তলার খনিতে নয়, আমরা যাব সুলিমান পর্বতে। ওখানেই তো জমা আছে পৃথিবীর সেরা গুপ্তধন। আপনি শোনেননি এর কথা?

– দেখ, জিম, ওসব হল গাঁজাখুরি গল্প।

জিম বলল : ঐ অঞ্চলের এক নারী তার সন্তানকে নিয়ে নাটালে এসেছিল। তার সঙ্গে আমার যখন দেখা হয়েছিল সে ঐ গুপ্তধনের কথা আমাকে বলেছিল, তবে সে তো আর জীবিত নেই।

জিমকে সতর্ক করে দিয়ে আমি বললাম : 'ঐ মনগড়া রূপকথার দেশে পৌঁছানোর আগেই তোমাদের শরীর বলে কিছু থাকবে না; শকুনের পেটে চলে যাবে।'

আমার কথা শুনে দাঁত বের করে হাসতে লাগল জিম, যেন কত মজার কথা বললাম আমি। নতুন দেশ দেখতে তার যে প্রবল আগ্রহ আছে কথা প্রসঙ্গে তাও সে বলল। হাতির দাঁতের কারবার তার খুব ভাল লাগছে না বলেও সে মন্তব্য করল।

আধঘন্টা পর দেখলাম যাত্রার জন্য নেভিলের গাড়ি প্রস্তুত। জিম ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসে বলল : বস, চললাম, তোমার কাছে বিদায় না নিয়ে যাই কী করে! যে জায়গায় যাচ্ছি, সেখান থেকে সত্যিই আর ফিরতে পারব কিনা জানি না। তুমি ঠিক কথাই বলেছিলে। মনিবের মুখে শুনেছি সে হিরার অন্বেষণে চলেছে।

তার কথা শেষ হলে তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে একটা কাগজের ওপর আমি লিখে দিলাম : 'শেবার বাঁ দিকের স্তনের' একেবারে চূড়ায় উঠে উত্তর দিকে এগিয়ে গেলেই সলোমনের বিখ্যাত রাস্তা পেয়ে যাবে।

চিঠিটা জিমের হাতে দিয়ে বললাম : এই চিঠি আরো দু-চার-দিন পর তোমার মনিবকে দিও। এখন দিলে ও ফিরে এসে আমাকে নানা প্রশ্ন করবে যার উত্তর আমি নিজেও জানি না। এখন এসো, তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।

মিঃ হেনরি, 'আপনার ভাই নেভিলের সাথে ঐ ছিল আমার শেষ সম্পর্ক তারপর জানি না, তার ভাগ্যে কী ঘটেছে।'

মিঃ হেনরি বলল, 'আমার ভাইয়ের খোঁজেই আমি বেরিয়েছি। আমি সুলিমান পর্বতেও যাব এবং যতদিন না জানতে পারছি সে জীবিত, না মৃত, ততদিন আমি সন্ধান কার্য চালিয়ে যাব। আমি চাই, তুমিও আমাদের সাথে থাকো।'

খুব সাবধানী লোক হলেও আমি যে ভিতু প্রকৃতির তা স্যার হেনরির কথায় নিজেই বুঝতে পারলাম। এদের সহযাত্রী বা সহ-অভিযাত্রী হলে আমি প্রচুর টাকা পাব ঠিক কথা এবং তাতে আমার সন্তানের পড়াশুনাও নির্বিঘ্নে চলবে সেও ঠিক, কিন্তু তাই বলে সুলিমান পর্বতে গিয়ে বেঘোরে মারা যেতে রাজি নই আমি।

স্যার হেনরিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম : সুলিমান পর্বত অভিযানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি আনন্দিত কিন্তু এই বয়সে আর দুঃসাহসিক অভিযানে যেতে আমি অক্ষম। তাছাড়া, আমার কিছু হয়ে গেলে আমার ওপর নির্ভরশীল ছেলেটা বিপাকে পড়ে যাবে।

আমার কথা শুনে স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুড দু'জনেই মুষড়ে পড়ল।

স্যার হেনরি প্রস্তাব দিল, 'আমার আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল। আমাদের সহযাত্রী হবার জন্য যত টাকা চাও তত টাকাই আমি তোমাকে দিতে রাজি আছি। যাত্রা শুরু করবার আগেই সেই পরিমাণ অর্থ আমি তোমাকে দেব। তোমার কিছু ঘটে গেলেও তোমার ছেলে যাতে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে সে ব্যবস্থাও আমি করব। তোমার সাহচর্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আর রত্নাগারের হদিশ যদি পেয়েই যাই তা আমরা তিনজন সমানভাবে ভাগ করে নেব। যাত্রার সমস্ত খরচ আমার একার। যদি রত্নের বদলে হাতির দাঁত পাই, সেক্ষেত্রেও আমার শর্তাবলি একই রকম থাকবে।'

আমি উত্তর দিলাম, 'স্যার হেনরি, তোমার প্রস্তাবের মতো এত উত্তম প্রস্তাব আমি আগে পাইনি, তবে কাজটাও অত্যন্ত বড়, সন্দেহ নেই। এই বিষয় নিয়ে আমি একটু চিন্তা করতে চাই। ডারবান পৌছানোর আগেই আমি তোমাকে আমার মতামত জানাব।'

স্যার হেনরির কাছে বিদায় নিয়ে আমার কেবিনে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম। সেই রাত্রে আমি হতভাগ্য এবং বহুকাল আগে বিগত হয়ে যাওয়া হোসে ডা সিলভেস্ট্রা ও হিরা ভর্তি সংখ্যাহীন গুহার স্বপ্ন দেখলাম।

৩
সাথী উমবোপা

কেপ থেকে ডারবান যেতে জাহাজে চার পাঁচ দিন সময় লাগে যদি আবহাওয়া জলযানের গতি সন্তোষজনক হয়। ইস্ট লন্ডন বন্দরের উন্নতির জন্য বিস্তর টাকা ঢালা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কোনো পণ্যবাহী জাহাজ যদি ছাড়তে দেরি করে তাহলে যাত্রীবাহী জাহাজের যাত্রাও বিলম্বিত হয়ে যায়। আমরা খুব ভাগ্যবান যে আমাদের জাহাজ নির্ধারিত সময়েই ছাড়াল। জাহাজে কীভাবে মাল উঠানো বা নামানো হয় তা একটা দেখবার বিষয়। জাহাজের খালাসীরা নির্দয়ভাবে সমস্ত মালপত্র নির্বিচারে ছুড়ে। প্যাকেটের মধ্যে কাচের বোতল আছে নাকি কাঠের জিনিস আছে সেই তারতম্য খালাসীরা করে না। একটা বস্তার মধ্যে শ্যাম্পেনের বোতল ছিল। সেটাকে খালাসীরা এমনভাবে ছোট নৌকায় নামালো যে কয়েকটা বোতল একেবারে ভেঙেই গেল। খালাসীগুলো ছিল 'কাফের' সম্প্রদায়ভুক্ত। বস্তা বেয়ে যে শ্যাম্পেনের ধারা বেরিয়ে আসছিল তারা সেগুলো খাচ্ছিল। ঐ সুন্দর সুরাকে তারা নিজেদের ভাষায় 'তাগাদি' বলে উল্লেখ করছিল। এই শব্দের অর্থ হল, মন্ত্রপুত। এই কাজ করতে নিষেধ করার জন্য আমি তাদের বললাম, 'যাকে তোমরা তাগাদি বলছো আসলে তা হল শ্বেতাঙ্গদের রোগ নিরাময়ের ওষুধ। এভাবে ওষুধের শিশি ভেঙে ফেললে তোমাদের অকল্যাণ হবে।' আমার কথা শুনে কাফেরগুলো এত ভীত হয়ে পড়ল যে কাজ ফেলে তারা একেবারে ডাঙায় গিয়ে দাঁড়ালো।

নাটাল যাওয়ার পথে স্যা:: হেনরির প্রস্তাব নিয়ে আমি খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলাম। তবে এ নিয়ে আ·াদের মধ্যে দু-তিন দিন কোনো কথাই হল না। শিকারের কাহিনী নিয়েই আমরা আলোচনা করছিলাম। শিকারের অভিজ্ঞতা এমনিতেই এত রোমাঞ্চকর যে তাতে আর রঙ চড়াতে হয় না।

জানুয়ারি মাসের সুন্দর এক সকালে আমরা নাটাল শহর অতিক্রম করলাম। সূর্যাস্তের পূর্বেই ডারবান বন্দর পৌছে যাওয়ার কথা। ইস্ট লন্ডন থেকে যে তটরেখা শুরু হয়েছিল তা বড় চমৎকার। কখনো বিশাল বিশাল বালির ঢিবি, কখনো অন্তহীন সবুজের মেলা, কোথাও রাশি রাশি সাদা ফেনাপুঞ্জ, আবার কোথাও কাফেরদের বস্তি। তবে ডারবান পৌছানোর ঠিক আগের প্রাকৃতিক দৃশ্য এক কথায় অপরূপ। বড় বড় পাহাড়ের শরীর ভেদ করে নদীর রূপালি স্রোত মাটিতে এসে আছড়ে পড়ছে। এখানে ওখানে ঘন সবুজ বন। এইসব বন প্রকৃতির খেয়ালেই সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্রের কিনারায় বেশ কিছু সাদা রংয়ের বাড়ি। দেখে মনে হচ্ছে সমুদ্রের সৌন্দর্যে তারা মগ্ন। বনে

জঙ্গলে আমি বহুদিন কাটিয়েছি বলেই আমার মনে হয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষের সাহায্যেই পূর্ণতা লাভ করে। মানুষের সভ্যতারও একটা গুরুত্ব বা মূল্য আছে যদিও সভ্যতা বিস্তারের সাথে সাথে পশু প্রাণীরা শহর থেকে বিতাড়িত হয়। মানুষের আগমনের পূর্বেই ঈশ্বর স্বর্গোদ্যান সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু ইভের পদচিহ্ন পড়ায় ঐ উদ্যানের শোভা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ডারবান বন্দরে আমাদের জাহাজ যখন নোঙর ফেলল তখন রাত্রি নেমে এসেছে। ইংল্যান্ডের ডাকবাহী জাহাজ বন্দরে পৌছালে কামান দেগে তার আগমন বার্তা ঘোষিত হত। জাহাজ থেকে ডাকবাক্সগুলো নামিয়ে নেওয়া হলে আমরা নৈশাহার সেরে নিলাম। আমরা যখন ডেকে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন চাঁদের আলোয় সমুদ্রের জল তরল রূপার মতো লাগছিল। তীর থেকে মশলা দিয়ে রান্নার গন্ধ ভেসে আসছিল, বাড়ির শত শত আলোও আমাদের চোখে পড়ছিল, খানিক দূরে মাপিদের গানও শুনতে পাচ্ছিলাম। নোঙর তোলার সময় তারা সকলে মিলে এক সুরে গান করে। সব মিলিয়ে রাত্রির সৌন্দর্য মনকে ভরিয়ে দিচ্ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ধরনের রাত্রি অবশ্য মাঝে মাঝেই আসে। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাকে মনে হচ্ছিল শান্তির শুভ্র আবরণ। আমাদের এক সহযাত্রীর সাথে একটা বুলডগ ছিল। এত মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে সেও বুঝি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। কেবিনের দরজার পাশে খাঁচায় একটা বন মানুষ রাখা ছিল। এই অপরূপ পরিবেশে সে সব কিছু ভুলে সুখের স্বপ্ন দেখছিল।

স্যার হেনরি, ক্যাপ্টেন গুড ও আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে নৈসর্গিক শোভা দেখছিলাম। এক সময় স্যার হেনরি জানতে চাইল, 'মিঃ কোয়ার্টারমেইন, আমার প্রস্তাবের কথা তুমি নিশ্চয়ই ভেবে দেখেছো। আমি তোমার সিদ্ধান্ত জানতে চাই।'

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'আমি নিশ্চিত যে তুমি আমাদের সাথে যাচ্ছো। রাজা সলোমনের রত্নাগার অর্থাৎ যে লোকটাকে তুমি নেভিল নামে চিনতে সে সেখানে গিয়েছে ততদূর পর্যন্ত আমরা তোমার সঙ্গলাভ থেকে বঞ্চিত হতে চাই না।'

তাদের কথা শুনে আমি উঠে দাঁড়িয়ে পাইপটা ধরাতে গেলাম। কিন্তু অন্যমনস্ক থাকায় পাইপের তামাকটা নিচে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। পাইপের মধ্যে তামাক ভরে নিতে একটু সময় লাগল ঠিকই কিন্তু কী উত্তর দেব তা যেন সঠিকভাবে খুঁজে পেলাম। আমি উত্তর দিলাম, 'তোমাদের সাথে যেতে আমার আপত্তি নেই তবে কেন যাব এবং কী শর্তে যাব তা তোমাদের বলছি–

প্রথমতঃ যাত্রার সব খরচ তোমাদের বহন করতে হবে। পথিমধ্যে যদি হাতির দাঁতের সামগ্রী পাই তাহলে আমি ও ক্যাপ্টেন গুড দুজনে তার অংশীদার হব।

দ্বিতীয়তঃ যাত্রা শুরুর পূর্বে তুমি আমাকে পাঁচশো পাউন্ড দেবে এবং আমি বিশ্বস্ততার সাথে তোমার কাজ করব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সফল হচ্ছি অথবা এই অভিযান পরিত্যাগ করছি।

তৃতীয়তঃ তুমি আমার সাথে একটা চুক্তি করবে যেখানে লেখা থাকবে আমি যদি মারা যাই কিংবা পঙ্গু হয়ে যাই তাহলে আমার ছেলে হ্যারিকে তুমি প্রতি মাসে দুশো পাউন্ড দিয়ে যাবে এবং সেটা আগামী পাঁচ বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে। পাঁচ বছর পর সে ডাক্তারি পাশ করবে। বর্তমানে সে গাই কলেজ হাসপাতালে পড়ছে।

স্যার হেনরি বলল, 'আমি যে কাজ হাতে নিয়েছি তা আমি করবই। তোমার সব শর্ত আমি মেনে নিলাম। তোমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্যই তোমাকে আমাদের প্রয়োজন।'

আমি বললাম, 'এবার খুলেই বলি, আমি কেন তোমাদের সাথে যাব। প্রথমত, গত কয়েক দিন ধরে আমি তোমাদের লক্ষ করছি এবং তোমাদের সাথে মেলামেশা করছি। তোমাদের খুব ভাল লেগেছে আমার। আমরা তিনজন মিলিতভাবে কাজ করতে চলেছি। অতএব কাজের ধরন ভালভাবে জেনে নেওয়া দরকার। সুলিমান পর্বত পার হয়ে জীবিত অবস্থায় ফিরে আসা এক অসম্ভব ব্যাপার। তিনশো বছর আগে হোসে ডা সিলভেস্ট্রার কী পরিণতি হয়েছিল তা তোমরা শুনেছ। কুড়ি বছর আগে তার এক উত্তর পুরুষের ভাগ্যে কী ঘটেছিল? তোমার ভাইয়ের কপালে কী জুটেছে? বন্ধু, আমাদের কপালেও ঐ একই জিনিস লেখা আছে।'

বক্তব্য শেষ করে আমি ওদের মুখের প্রতিক্রিয়া বুঝতে চাইলাম। স্যার হেনরি বলল, 'আমি দমবার পাত্র নই, আমরাও একবার চেষ্টা করে দেখব।'

আমি বললাম, 'কেন আমি এই অভিযানে যেতে রাজি হলাম তা এবার তোমাদের বলব। আগেই বলেছি, আমি খুবই শান্ত প্রকৃতির কিন্তু আমি অদৃষ্টে বিশ্বাস করি। কোনো কিছু করবার ডাক যখন আসবে তখন আমার ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক, আমার হাতে সময় থাকুক বা না থাকুক, আমাকে সব কিছু ফেলে ছুটে যেতে হবে। ঈশ্বর যদি চেয়ে থাকেন তাহলে আমাকে সুলিমান পর্বতে যেতেই হবে এবং তাঁর যদি ইচ্ছা হয় যে, আমি ওখানেই মরব তাহলে আমার মৃত্যু ওখানেই হবে। তাহলে নিজের ভালমন্দ নিয়ে আমি চিন্তা করি কেন? দ্বিতীয় কারণ, আমার বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। এতগুলো বছর ধরে আমি শিকার করেছি ও ব্যবসা করেছি কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি এতটুকু হয়নি। তোমরা হয়ত জান না, হাতি শিকারি এই পেশায় চার পাঁচ বছরের বেশি টিকে থাকতে পারে না। সেই হিসাবে আমি তো পাঁচ পুরুষের মেয়াদে এই পেশাতে আছি। এবার আমার সময় শেষ হতে চলেছে। আগামীকালই যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে আমার বকেয়া ধার শোধ করে আমার হাতে কোনো টাকাই থাকবে না। সেক্ষেত্রে আমার ছেলে হ্যারির পড়াশুনাটা আর শেষ করতে পারবে না।'

স্যার হেনরি বলল, 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের প্রচেষ্টা একেবারে বিফল হবে। এর থেকে এটাই পরিষ্কার যে সলোমনের রত্নাগার নিয়ে তোমার লোভ নেই। তাই আমার কাছে তোমার বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়ে গেল। তবে তোমার অনুমান সঠিক হোক বা না হোক, আমি কিন্তু অভিযানের শেষ সীমা পর্যন্ত যাব তা মধুর কিংবা তিক্ত, যাই হোক না কেন। অন্বেষণে যদি বাধা আসেও ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমরা মনোবল অটুট রাখব।'

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'সত্যি কথা বলতে কী, আমরা তিনজনেই বিপদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। বিপদের মুখোমুখি হওয়া আমাদের জীবনের অঙ্গ। তাই আমরা পিছু হটে যাওয়ার কথা চিন্তাও করব না। চল, এক জায়গায় বসে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই পরীক্ষা করি।'

পরের দিন স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুডকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে বানানো আমার কুটিরে গেলাম। কুটিরে রান্নাঘর ছাড়াও তিনটা ঘর আছে। সামনের জায়গাটাতে

কয়েকটা গাছ ছিল; সেগুলোকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। জ্যাক নামের গ্রিকোয়া সম্প্রদায়ের একজনকে সব কিছু দেখা শোনার ভারও দিয়েছি। মহিষের গুঁতোয় তার একটা উরু এমনভাবে ভেঙে গিয়েছে যে শিকার করতে সে আর কোনোদিন যেতে পারবে না। জুলু জাতির লোক বাগান করবার মতো শান্তশিষ্ঠ কাজ পছন্দ করে না বলেই জ্যাককে কাজে বহাল করেছিলাম।

বাগানে তাঁবু খাটিয়ে স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুডের শোবার ব্যবস্থা হল কারণ আমার কুটিরের ঘরগুলি ছিল খুবই ছোট। পরের দিন সকালে ফুলের সুগন্ধ, গাছে গাছে ঝুলে থাকা ফলের সৌন্দর্য ছিল বাগানের আরো একটা আকর্ষণ। মশা এখানে দেখাই যায় না বলা চলে, খুব ভারি বর্ষা হলে তবেই এখানে মশার দর্শন মেলে। এক স্থানীয় উকিলের সাহায্য নিয়ে আমার প্রার্থিত চুক্তিপত্র তৈরি করা হল। উকিল এ জন্য কুড়ি পাউন্ড নিল তার ফী বাবদ। আমার মনে হল, সে বেশ মোটা টাকাই আদায় করে নিল। আমার প্রাপ্য পাঁচশো পাউন্ড আমিও পেলাম।

আমাদের ব্যবহারের জন্য একটা গাড়ি কিনে আনলাম। গাড়িটা বাইশ ফুট লম্বা। তলায় পাতলা লোহার চাদর লাগানো থাকলেও খুব হালকা এবং গাড়ির অন্যান্য অংশ পোক্ত কাঠের তৈরি। এই গাড়ির আর একটা বিশেষত্ব ছিল। গাড়ির তলা থেকে বারো ফুট উচ্চতা পর্যন্ত কোনো আবরণ ছিল না। ফলে, আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমরা সুবিধা মতো এর ভিতর রাখতে এবং বের করে আনতে পারতাম। বারো ফুটের ওপরের অংশটা কাঠের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। স্থানীয় ভাষায় একে আধা তাঁবু বলা হত। উপরের অংশে দুজন মানুষ স্বচ্ছন্দে ঘুমাতে পারত এবং রাইফেল ও নানা ধরনের জিনিস রাখবার জন্য তাক তৈরি করাও ছিল।

এই গাড়ি টানবার জন্য ষোলটা বলদ লাগে কিন্তু জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য আমি আরো চারটা বেশি কিনলাম। এখানে দুই ধরনের বলদ পাওয়া যায়। একটা হল, জুলু প্রজাতির, অন্যটা আফ্রিকান্দার। জুলু প্রজাতির বলদ অন্য প্রজাতির দৈহিক আকৃতির অর্ধেক। দুর্গম অঞ্চলে মাল বহন করবার জন্য এদের ব্যবহার করা হয়। খাবারের অভাব পড়লেও এরা টিকে থাকতে পারে বেশ কয়েক দিন। সাধারণ ওজনের বোঝা নিয়ে এরা দিনে পাঁচ মাইল পর্যন্ত চলে যেতে পারে এবং এদের পায়ে ঘা হবার সম্ভাবনা খুব বিরল। শুধু পার্বত্য অঞ্চল নয়, বনাঞ্চলে যাওয়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য এদের এক ধরনের ওষুধ খাওয়ানো হয়ে থাকে। ফলে, জলবায়ুর তারতম্য হলেও এদের অসুবিধা হয় না। ফুসফুসের পীড়া-র জন্যও এদের এক ধরনের টীকা দেওয়া হয়। সেই কারণে এদের নিউমোনিয়া হয় না। টীকা দেওয়ার পদ্ধতি বেশ অভিনব। বলদের লেজের খানিক অংশ চিরে দিয়ে ঐ রোগে মৃত বলদের ফুসফুসের একটা অংশ এখানে বেঁধে দেওয়া হয়। এর ফলে জীবিত বলদের রোগটা হয় বটে কিন্তু তা খুবই অল্প। সংক্রমণ অল্প হবার জন্য রোগগ্রস্ত প্রাণীর মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এত বেড়ে যায় যে এই রোগে সে আর কখনো আক্রান্ত হয় না। তবে এই প্রক্রিয়ায় জীবিত বলদের লেজটি একেবারে খসে যায়। যে দেশে মশা-মাছির প্রাদুর্ভাব বেশি সেখানে লেজের মূল্য অসীম, তবে লেজের চেয়ে জীবনের মূল্য আরো বেশি।

আমাদের পরবর্তী কাজ হল কিছু খাবার-দাবার ও ওষুধপত্র সঙ্গে নেওয়া। ভাগ্যক্রমে, ক্যাপ্টেন গুড এক সময় চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর একটা কোর্স করেছিল।

শল্য-চিকিৎসা ও ওষুধপত্র সম্বন্ধে তার ভাল জ্ঞান ছিল বলতে হবে যদিও নামের শেষে এম.ডি ডিগ্রী লিখবার অধিকার তার ছিল না। কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ ও শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ভরা একটা বাক্স সব সময়ই তার সাথে থাকত। শল্য চিকিৎসায় তার এত ভাল হাত ছিল যে এক কাফেরের পচন ধরা পায়ের বুড়ো আঙুলটা এমনভাবে বাদ দিয়েছিল যে রোগী সজ্ঞানে নিজের চোখে পুরো অপারেশনটা দেখেছিল। তার অপারেশনের পদ্ধতি দেখে রোগী মন্তব্য করেছিল : ডাক্তার বাবু চাইলেই তো আর একটা বুড়ো আঙ্গুল ওখানে লাগিয়ে দিতে পারে।

গাড়ি, বলদ, খাবার-দাবার ইত্যাদি সমস্যার সমাধান হবার পর আরো দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হল। এইগুলি হল, কী কী ধরনের অস্ত্র নেওয়া হবে এবং ক'জন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে। ইংল্যান্ড থেকে স্যার হেনরি বেশ ভাল পরিমাণের গুলি গোলা এসেছিল। তাছাড়া আমার সাথেও অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ কম ছিল না। হাতি শিকারের জন্য আমাকে তো ওগুলো সাথেই রাখতে হত। আমার অস্ত্রগুলো বেশ উন্নতমানের এবং নির্ভরযোগ্য ছিল। ঐ বন্দুক দিয়ে আমি বহু সংখ্যক হাতিকে ঘায়েল করেছিলাম।

ঠিক হল, তিনটা এক-নলা এবং আটটা দো-নলা বন্দুক আমরা সব সময়ের জন্য হাতের কাছে রাখব। সেগুলোতে গুলি ভরাই থাকবে যাতে নিজেদের সুরক্ষার জন্যে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে আমরা ওগুলো ব্যবহার করতে পারি। এছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে গুলি ও বারুদ আমাদের হাতের সামনেই থাকবে।

তিনটা দো-নলা ৫০০ এক্সপ্রেস দিয়ে যে কোনো মাঝারি আকৃতির পশুকে চিরদিনের জন্য ঘুম পাড়ানো যেতে পারে এবং খোলা ময়দানে একদল মানুষের মোকাবিলা করবার জন্য তা যথেষ্ট উপযুক্ত। একটা দো-নলা-১২ বন্দুক হাতে থাকলে শিকারকে আর পালিয়ে যেতে হবে না। মুহূর্তের মধ্যে তাকে মাটিতে ফেলে দেওয়া কোনো কঠিন কাজ নয়।

তিনটা উইনচেস্টার রাইফেল, তিনটা কোল্ট রিভলবার আমরা তিনজনেই নিজেদের সঙ্গে রাখব ঠিক করে নিলাম।

আমাদের তিনজনের বন্দুকগুলোতে একই ধরনের কার্তুজ লাগবে। একজনের কার্তুজ শেষ হয়ে গেলে অন্যজনের কাছে রাখা কার্তুজ নিয়ে বন্দুকটা ব্যবহার করা যাবে। এটা যে কত বড় সুবিধাজনক তা যে কোনো অভিজ্ঞ শিকারিই জানে।

আমরা ঠিক করলাম, আমাদের দলে পাঁচজনের অধিক লোক রাখব না– একজন গাড়ির চালক, একজন পথ প্রদর্শক ও তিনজন ভৃত্য। প্রথম দুজনকে অতি সহজেই পেয়ে গেলাম। গোজা নামের লোকটিকে নেওয়া হল চালক হিসাবে এবং টিম নামের লোকটির কাজ হবে পথ প্রদর্শকের। এরা দুজনেই জুলু সম্প্রদায়ের কিন্তু তিনজন ভৃত্য খুঁজে পাওয়া খুব সহজ ছিল না। খুব সাহসী ও অতি বিশ্বস্ত না হলে আমাদের পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যায়। আমরা যে কাজে চলেছি তাতে নির্ভরযোগ্য পরিচারকের খুবই প্রয়োজন। চেষ্টা করে দুজনকে পেলাম। একজনের নাম ভেন্টভোগেল বা হাওয়া পাখি। সে হোটেনটট সম্প্রদায়ভুক্ত; দ্বিতীয়জন জুলু জাতির। তার নাম খিবা। খিবার একটা গুণ ছিল। সে নির্ভুল ইংরেজি বলতে পারত। ভেন্টভোগেল লোকটিকে আমি আগের থেকেই চিনতাম। কোন পথে গেলে শিকার

অতি অবশ্য পাওয়া যাবে তা খুব সহজে আঁচ করতে পারত সে এবং ক্লান্তি শব্দটা একেবারে অজানা ছিল তার। তবে তার জাতের লোকদের মধ্যে যে দুর্বলতা প্রায়শই দেখা যায় সে তার থেকে মুক্ত ছিল না। এই দুর্বলতা হল মদের আসক্তি। তাকে অন্য সব কিছুতেই বিশ্বাস করা যেত কিন্তু বিশ্বাস করে এক বোতল মদ তার জিম্মায় রাখলে সেই বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে সে ছিল অপারগ। তবে আমরা যে অঞ্চলে যাব বলে ঠিক করেছিলাম সেখানে মদের দোকান না থাকায় আমরা ও নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিলাম না।

দু'জন লোক তো না হয় পাওয়া গেল কিন্তু তৃতীয় জনের আর দেখা নেই। অবশেষে ভাগ্যের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করতে মনস্থ করলাম। যাত্রার নির্ধারিত দিনের ঠিক আগের রাতে খিবা এসে জানাল যে এক কাফের আমার সাথে দেখা করবার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। নৈশাহারের জন্য আমরা তখন তিনজনেই বসে পড়েছি। লোকটাকে ভিতরে নিয়ে আসার আদেশ দিলে দেখতে সুন্দর, লম্বা, বছর তিরিশের একটা লোক ভিতরে এল। জুলু সম্প্রদায়ের হলেও তার গায়ের রঙ খানিকটা ফর্সা, হাতের গাঁটওয়ালা লাঠি মাথার ওপরে তুলে সে যেন আমাদের স্যালুট করল এবং ঘরের কোণায় চুপচাপ বসে পড়ল। এখানকার লোকদের সাথে দেখা হওয়া মাত্র কথা বললে নিজেদের গুরুত্ব কমে যায়। তাই প্রথমটায় তাকে আমরা উপেক্ষা করলাম। পরে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম সে একজন 'কেশলা'। তার মাথায় একটা কালো রঙের বলয়াকৃতির কালো মালা লাগানো ছিল। নানা রকম আঠা ও চর্বি মালার গায়ে ছিল বলে ওটাকে খুব চকচকে লাগছিল। ঐ ধরনের মালা সামাজিক মর্যাদার পরিচায়ক। তার মুখ দেখেই মনে হল তাকে যেন আগে কোথাও দেখেছি।

এবার আমি প্রশ্ন করলাম, 'তোমার নাম কী?

খুব শান্ত ও ভারি গলায় সে উত্তর দিল, 'উমবোপা।'

– তোমার মুখটা আমার চেনা মনে হচ্ছে কেন?

– সেবার যুদ্ধের ঠিক আগের দিন আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছিল প্রভু।

এবার সব কিছু আমার মনে পড়ল। জুলু যুদ্ধে আমি লর্ড চেমসফোর্ডের একজন উপদেষ্টা ছিলাম। ঐ যুদ্ধের পর আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে বেঁচে গিয়েছিল। ঐ বেদনাময় ঘটনার কথা আমি মুহূর্তের জন্যও স্মরণ করতে চাই না। যুদ্ধের সময় এই উমবোপা নামের লোকটা স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে যোগসূত্র হিসাবে আমাদের কাজ করত। যুদ্ধের ঠিক আগের দিন এই লোকটা আমাদের শিবিরের নিরাপত্তার ক্রুটি নিয়ে কথা বলতে উদ্যত হলে ধমক দিয়ে আমি ওকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলাম। তবে বলেছিলাম, তোমার চেয়েও বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ লোক এখানে আছে। এ ব্যাপারে তোমার মুখ না খোলাই ভাল।'

আমি জানতে চাইলাম, 'তোমার এখানে কী প্রয়োজন?'

উমবোপা বলল, 'আমার নামের অর্থ হল : যে লোক মাঝরাতে ঘুম থেকে ওঠে পড়ে। ইংরেজিতে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় : যে সব সময় নিজের চোখ খুলে রাখে। আমি শুনলাম, আপনারা নাকি উত্তর দিকে খুব দুর্গম স্থানে এক অভিযানে চলেছেন। আমি যা শুনেছি তা কি সঠিক?'

– একদম ঠিক।

– আমি এটাও শুনেছি যে মানিকা দেশ ছাড়িয়ে এক পক্ষ কালের পথ পার হয়ে আপনারা লুকাংগা নদীর কাছাকাছি কোথাও যাবেন, এটাও কি সঠিক?

আমাদের গন্তব্যস্থল তো খুব গোপনীয় রাখা হয়েছিল। তার কথা শুনে আমি সন্দিগ্ধভাবে বললাম, 'এসব কথায় তোমার কাজ কী?'

সে উত্তর দিল, 'হে শ্বেতাঙ্গ সাহেব, যা শুনেছি তা যদি সত্য হয়, তাহলে আমিও আপনাদের সাথে যেতে ইচ্ছা করি।'

লোকটার ব্যবহৃত 'শ্বেতাঙ্গ সাহেব' শব্দ দুটো শুনে আমি চমকৃত হলাম। গম্ভীর হয়ে তাকে বললাম, 'কীভাবে কথা বলতে হয় সে জ্ঞানও তোমার নেই। তবে তোমার নাম কী এবং কোথায় থাকো তা না জানলে তোমার সাথে আলোচনা করব কীভাবে?'

সে বলল, 'আমার নাম উমবোপা, জাতিতে আমি জুলু হলেও তারা আমাকে সেই হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না। আমাদের সম্প্রদায়ের লোকরা সুদূর উত্তরাঞ্চলে বাস করত। সে প্রায় এক হাজার বছর আগেকার কথা। তখন জুলু দেশের রাজা ছিল 'চাকা' নামের একজন। ঐ সময় জুলুরা ওখান থেকে নেমে চলে আসে। আমার বাল্যকাল কেটেছে ঐ উত্তরাঞ্চলে; তারপর ভাগ্যের ফেরে কত বছর এখানে ওখানে ঘুরেছি। এক ক্যাপ্টেনের সাথে থেকে যুদ্ধ বিদ্যাও রপ্ত করেছি। পরে আমি নাটাল চলে আসি শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানতে কৌতূহলী হয়ে। নাটালে তো দীর্ঘ কয়েক বছর কাটালাম, এখানে আমার বসত বাটিও নেই। আমি উত্তরাঞ্চলে ফিরে যেতে চাই। তোমরা যদি আমাকে টাকা পয়সা না দাও আমার কোনো আপত্তি নেই। তোমাদের সাথে পেলে আমি উত্তরাঞ্চলে একদিন পৌছাতে পারব। ভয় ডর বলে কোনো বস্তু আমার জানা নেই। এবার তোমাদের ইচ্ছা।'

লোকটার চেহারা এবং কথাবার্তায় আমি বিস্মিত হলাম। সে যা বলল তার অধিকাংশই সত্য এবং সে যে আর দশটা জুলু সম্প্রদায়ের লোক থেকে আলাদা তা বেশ বুঝতে পারছিলাম। তবে বেতন না পেলেও সে আমাদের সঙ্গী হতে রাজি এই প্রস্তাবে আমি একটু আশ্চর্য হলাম। স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুডের কাছে তার বক্তব্যের অনুবাদ করে শোনাতেই স্যার হেনরি আমাকে বলল, 'গায়ের জামাটা খুলে ওকে উঠে দাঁড়াতে বল তো একবার।' আমার আদেশে সে পরণের লম্বা মিলিটারি কোট খুলে প্রায় উলঙ্গ হয়ে নিজের শরীর প্রদর্শন করল। তার দৈহিক উচ্চতা ছ'ফুট তিন ইঞ্চি এবং সুঠাম শারীরিক গঠন। তার গলায় ঝুলছে সিংহ নখরের এক হার। তার গাত্রবর্ণ একেবারে নিকষ কালো নয়। স্যার হেনরি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে গিয়ে খুব ভাল করে তাকে দেখতে লাগল।

ক্যাপ্টেন গুড মন্তব্য করল, 'পাশাপাশি দুজনকে দেখতে বেশ লাগছে।'

স্যার হেনরি সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'তোমার প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করলাম। আজ থেকে আমাদের পরিচারকের কাজে লেগে যাও তুমি।'

উমবোপা যেন স্যার হেনরির বক্তব্যের মর্মার্থ বুঝতে পারল। স্যার হেনরির লম্বা চওড়া চেহারা দেখে জুলু ভাষায় বলল, 'খুব চমৎকার! আমরা সত্যিকারের পুরুষ– তুমি ও আমি।'

৪
হাতি শিকার

লুকাংগা নদী যেখানে কালুকোয়ে নদীর সাথে মিলিত হয়েছে সেই জায়গা ডারবান শহর থেকে এক হাজার মাইলেরও বেশি। এই সুদীর্ঘ পথ আমরা যে কীভাবে অতিক্রম করলাম তার বিশদ বর্ণনা আর দিচ্ছি না। এই পথের শেষ তিনশো মাইল আমরা পায়ে হেঁটে গেলাম কারণ এখানে 'শি-শি' নামের এক ধরনের মাছির প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। এই মাছির কামড়ে মানুষ ও গাধা ছাড়া অন্য সকল প্রাণী মারাই যায়।

জানুয়ারি মাসের শেষে আমরা ডারবান ছেড়ে মে মাসের মাঝামাঝি সিতান্দা ক্রাল-এ পৌছলাম। আফ্রিকা মহাদেশে যারা শিকার করতে যায় তাদের যে ধরনের অসংখ্য ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়, আমাদের বেলায় তাই হয়েছিল। আমি কেবল একটি অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতার কথাই এখানে বলব।

মাতাবেলে দেশের সীমান্তবর্তী বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম ইনইয়াতি। তখন ঐ দেশের রাজা ছিল একটা অসভ্য শয়তান যার নাম লোবেনগুলা। আগেই বলেছি, যাত্রার সময় ডারবান শহরে আমরা কুড়িটা বলদ কিনে ছিলাম। রাস্তায় গোখরো সাপের কামড়ে মারা যায় একটা, খাদ্য ও জলের অভাবে তিনটা শেষ হয়ে যায়, একটা নিখোঁজ হয়ে যায়। বিষাক্ত ফুলের গাছ চিবিয়ে অন্য তিনটা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। আরো পাঁচটা বলদকে আমরা প্রায় হারাতে বসেছিলাম, সেই বলদগুলো ঐ বিষাক্ত ফুলের গাছ খেয়েছিল। কিন্তু ঐ গাছের কাণ্ডে বিষ থাকলে কী হয়, ওর পাতাগুলোকে জলে সেদ্ধ করলে আবার বিষ ক্ষয় হয়ে যেত। ঐ পদ্ধতিতে আমরা পাঁচ পাঁচটা বলদের প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলাম।

ইনইয়াতি নামক জায়গায় আমরা আমাদের গাড়ি ও বলদগুলো রেখে দিয়ে পায়ে হেঁটে যাত্রা করলাম। আমার গাড়ির চালক গোজা এবং পথ প্রদর্শক টমকে ওখানেই থাকবার নির্দেশ দিলাম। তাদের কাজ হবে আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের মালপত্রের ও বলদগুলোর তদারকি করা। কাছাকাছি বাস করে এমন একজন স্কট ল্যান্ডের মিশনারিকে অনুরোধ করলাম যাতে সে আমাদের লোক দুটিকে একটু চোখে চোখে রাখে। এসব কাজ শেষ করে আরো জনা ছয়েক কুলিকে ভাড়া করে এনে উমবোপা, খিবা ও ভেন্টভোগেলকে নিয়ে আমাদের রোমাঞ্চকর অভিযান পুনরায় শুরু হল। গাড়ি, মালপত্র ইত্যাদি ফেলে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বটে, আমাদের প্রত্যেকের মনে কিন্তু সংশয় থাকল যে আমরা হয়ত এখানে আর ফিরেই আসতে পারব না। মন ভারাক্রান্ত থাকার জন্য কেউ কোনো কথা বলছিল না। উমবোপা

একদম সামনের দিকে ছিল, বাকিরা ছিলাম তার পিছনে। এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করে জুলু ভাষায় সে একটা গান গাইতে শুরু করল। গানের বিষয়বস্তু ছিল, বৈচিত্র্যহীন জীবনে বিরক্ত হয়ে নতুনত্বের খোঁজে কয়েকজন সাহসী যুবক গভীর অরণ্যের পানে এগিয়ে চলল। অরণ্য গভীর থেকে গভীরতর হল কিন্তু এক সময় দেখা গেল, সেটা এক সুন্দর সমভূমি যেখানে রয়েছে সুন্দর সুন্দর শিকারযোগ্য পশু, অঢেল খাদ্য আর মন কেড়ে নেওয়া যুবতীদের দল।

তার গান শুনে আমরা সকলে প্রাণ খুলে হাসলাম। উমবোপা ছিল দিলখোলা মানুষ। নিজে মনমরা না হয়ে থেকে মজার মজার কথা বলে অন্যদের সে সর্বক্ষণ হাসাতে থাকত। এই সুন্দর স্বভাবের জন্য খুব শীঘ্রই আমরা সকলে তাকে ভালবেসে ফেললাম।

ইনইয়াতি থেকে রওয়ানা দেওয়ার পর পনেরো দিন কেটে গিয়েছে। আমরা তখন এমন একটা জায়গায় পৌছেছি যেখানে প্রচুর জলাশয় ও গাছ-গাছালি আছে। পাহাড়গুলো সবুজ গাছে এমনভাবে ঢাকা রয়েছে যে মনে হবে সেখানে কোনো অসমান জায়গা নেই। ঐ অঞ্চলে আর একটা জিনিস চোখে পড়বার মতো। সেটা হল, 'মাকাবেল' গাছের অধিক্য, এই গাছে হলুদ রঙের ফল ধরে এবং ফলের মধ্যে অসংখ্য শক্ত বীজ থাকে। হাতিরা এই গাছ খেতে খুব পছন্দ করে। জঙ্গলে মাকাবেল গাছ আছে মানেই ধরে নিতে হবে ঐ বিশালকায় প্রাণীটি আশে পাশে কোথাও আছে। হাতি যে এই গাছের পাতা খেয়ে পরিতৃপ্ত হয় তা নয়, গাছের ডাল ভেঙে এমনকী, গাছটিকে মাটি থেকে উপড়ে ফেললে তবেই শান্তি হয় তার।

সারাদিন হাঁটবার পর সন্ধ্যার মুখোমুখি আমরা এক মনোরম জায়গায় এসে পৌছলাম। জায়গাটা ছিল সবুজ পাহাড়ের একেবারে পাদদেশে। পাশেই রয়েছে একটা নদী কিন্তু তাতে পানি নেই তবে নদীর বুকে স্থানে স্থানে বেশ কিছু পানি জমা হয়ে আছে। জমা পানি খেতে যে বনের পশুরা আসে তা বালির ওপর তাদের পদচিহ্ন দেখেই বোঝা যায়। পাহাড়ের বিপরীত দিকে ছিল একটা উন্মুক্ত প্রান্তর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে কেবল দু'চারটা মাকাবেল গাছ। সারা অঞ্চলটাই ছিল নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতায় ঢাকা।

ঐ সময় নদীতে পানি খেতে এসেছিল এক পাল জিরাফ। আমাদের পদ শব্দে ভয় পেয়ে তারা ছুটতে শুরু করল। তাদের ছুটে চলার দৃশ্যটা কী সুন্দর! পিঠের ওপর লেজ খাড়া করে এক অপরূপ ছন্দে তারা ছুটে চলল। পাথরের ওপর তাদের পায়ের চাপ পড়তেই যে শব্দের সৃষ্টি হচ্ছিল অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে তা বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন গুডের হাতে গুলিভরা একটা বন্দুক ছিল। পলায়মান পশুর দলের দিকে তাক করে সে একটা গুলি ছুড়ল এবং সেটা গিয়ে একটা জিরাফের ঘাড়ের পিছনে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে পশুটা মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। ব্যাপারটা হল, ক্যাপ্টেন গুড আসলে মারতে চেয়েছিল সারির একেবারে শেষের জন্তুটাকে কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অন্য আরেকটা পশুর প্রাণ হরণ করেছিল।

ক্যাপ্টেন গুডের নিজস্ব বিশ্বাস ছিল যে, বন্দুক চালানোয় সে খুব পটু। স্যার হেনরি ও আমি তার কৃতিত্বের প্রশংসা না করলে কী হবে, আমাদের কৃষ্ণকায় সঙ্গীরা তার পারদর্শিতা দেখে তো মুখের কথাই হারিয়ে ফেলল।

শুকনো নদীর বুকে একটা জলাশয় বেছে নিয়ে তার থেকে প্রায় তিনশো ফুট দূরে আমরা তাঁবু খাটানোর কাজ শুরু করলাম। কাঁটা গাছগুলো কেটে মধ্যবর্তী স্থানটাতে আমাদের শোবার জায়গা তৈরি করা হবে স্থির হল। শোবার জায়গাটাকে গোল করে ঘিরে কেটে ফেলা গাছগুলোকে সাজানো হল। রাতের দিকে প্রয়োজন পড়লে আগুনের সাহায্যে একটা বৃত্ত করে আমাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ইত্যবসরে শিকার করা প্রাণীটার মাংস ছাড়ানোর ভার দেওয়া হল কয়েকজন ভৃত্যের ওপর।

খানিক পর সব কাজই হয়ে গেল। চিহ্নিত জায়গার মাঝখানে শোবার ব্যবস্থা হল, জিরাফের মাংসও রান্না করা হল। আকাশের চাঁদের আলোয় নিকট ও দূরের সব কিছুই বেশ ভালভাবে দেখা যাচ্ছিল। জিরাফের হাড়ের মজ্জা খেতে যে কী দারুণ তা আমি অন্যকে বোঝাই কী করে! তবে হ্যাঁ, হাতির কলজের স্বাদের সাথে অন্য কোনো কিছুর তুলনা চলে না। চাঁদের আলোয় নৈশাহার সেরে আমরা ধূমপান করতে লাগলাম। ক্যাপ্টেন গুডের হাতের টিপের প্রশংসা আমাদের কথায় বার বার ফিরে আসছিল। আমার সাথে স্যার হেনরির শারীরিক আকৃতির প্রভেদ বেশ ভাল মতোই ছিল। আমি হলাম রোগা, বেঁটে এবং গায়ের রঙ বেশ চাপা, আমার ওজন সাড়ে নয় স্টোন। স্যার হেনরি লম্বা, চওড়া, গৌরবর্ণ এবং তার দেহের ওজন পনেরো স্টোন তো হবেই। আমাদের তিন জনের মধ্যে ক্যাপ্টেন গুডকে দেখতে একটু অন্য রকম লাগছিল। খুব সুন্দর পরিষ্কার পোশাক পরে একটা চামড়ার ব্যাগের ওপর বসেছিল। মনে হচ্ছিল, শহরে বেশ আরাম করে সারাদিন ধরে শিকার করে এই জঙ্গলে ফিরে বিশ্রাম নিতে বসেছে। তার চোখে ছিল চশমা, গালের দাড়ি পরিষ্কারভাবে কামানো। এই বুনো জায়গায় সে ছিল একমাত্র লোক যাকে এক নজর দেখেই সুসভ্য বলা যেতে পারত।

আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'এখানে যারা বাস করে তাদের ঠিক মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। আমি সব সময় সভ্য ভদ্র হিসাবেই পরিচিত হতে চাই।' হায়! আমি যে ভাবতেও পারিনি একটু পরই কী ঘটবে।

যখন রূপালি চাঁদের আলোয় বসে আমরা তিনজন গল্প করছিলাম তখন আমাদের কাফের ভৃত্যরা ওপাশটায় বসে মদ খাচ্ছিল। একটা পাত্রে বেশ খানিকটা মদ রাখা ছিল এবং তার মধ্যে একটা লম্বা নল ডোবানো ছিল। নলের অপর প্রান্তে একটা হরিণের শিং লাগানো। শিংটা মুখে পুরে টান মারতেই পাত্র থেকে মদ উঠে আসবে মুখে। কাফেরদের হাতে হাতে নলটা ঘুরছিল এবং একটু পর পরেই তারা আগুনের পাশে নিজেদের কম্বলের ওপর নেতিয়ে পড়ছিল। চাকরদের সকলে এভাবে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলেও একজন কিন্তু এক পাশে চুপচাপ বসেছিল। তার নাম উমবোপা, চিবুকে হাত রেখে গভীরভাবে সে কিছু চিন্তা করছিল। অন্য কাফেরদের সাথে বড় একটা মেলা মেশা করত না সে।

আমাদের পিছন দিকে যে জঙ্গল ছিল সেখান থেকে একটা বন্যপ্রাণীর ডাক শুনে একটা ঠান্ডা স্রোত আমাদের শির দাঁড়া বেয়ে নিচে নেমে গেল। ডাকটা ছিল সিংহের। সেটার রেশ মেলাতে না মেলাতেই নদীর বুকে যেখানে পানি দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে কান ফাটানো হাতির ডাক ভেসে এল। একটু পরেই কয়েকটা বিশাল ছায়ামূর্তি নদী গর্ভ থেকে উঠে জঙ্গলের দিকে অলস গতিতে এগোতে লাগল।

হাতিদের দেখে ক্যাপ্টেন গুড বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার ধারণা, জিরাফ মারতে যেমন কোনো কষ্ট হয়নি, হাতির পালকে মারতেও তেমন কোনো ঝুঁকি নেই।

তার হাত চেপে ধরে তাকে বসিয়ে দিয়ে বললাম, 'ওদের শান্তিতে চলে যেতে দাও'

স্যার হেনরিকেও বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। সে বলল, 'আমাদের কী সৌভাগ্য! এত শিকারে ভরা জঙ্গল! এখানে আরো দু একটা দিন থাকতেই হবে।'

প্রায় দু'বছর আগে নেভিল নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক এই অঞ্চলে তার গাড়িটা বিক্রি করেছিল। এই খবরটা আমি ইনইয়াতি থাকার সময় স্যার হেনরিকে দিয়েছিলাম। তারপর থেকে স্যার হেনরি ভাইকে খুঁজে পাবার জন্য মানসিকভাবে এত অশান্ত হয়ে উঠেছিল যে কোথাও আমাদের অলসভাবে সময় কাটাতে দিত না। কিন্তু আজ রাত্রে শিকারি সত্তা তার অন্য সব মানসিক ভাবাবেগকে ছাপিয়ে গেল।

গুড তো শিকার করবার জন্য তৈরিই ছিল। এতগুলো হাতিকে হাতের নাগালে পেয়ে ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা তার একেবারেই ছিল না। সত্যি কথা বলতে কী, বিপুল পরিমাণ গজদন্ত পাবার সুযোগ ফসকে যাক আমিও চাইছিলাম না। বাকিদের উৎসাহিত করবার জন্য বললাম, 'কাল সকালেই তো আমরা এই জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তাই আজ রাতে একটু আনন্দ করা যাক না কেন। খাওয়া শেষ হলে তো হাতিরা চলে যাবে, এখনই বেরিয়ে পড়লে ওদের ধরা যাবে।'

আমার প্রস্তাবে সকলে তৎক্ষণাৎ রাজি হল। ক্যাপ্টেন গুড টুইডের কোট খুলে ফেলে, নকল দাঁত ও চশমা পকেটে ভরে নিয়ে রণমূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকল। আমি ও স্যার হেনরি নিজেদের শরীরে একটা করে কম্বল জড়িয়ে নিলাম কারণ ইতিমধ্যেই হালকা হিম পড়তে শুরু করেছিল। রাতের ঘুম তো মাথায় উঠল; অবশ্য সে জন্য আমাদের কোনো আক্ষেপ নেই। অভিযাত্রীদের কতই না বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়!

বের হতে যাব এমন সময় এক বন্যপ্রাণীর একটানা আর্তরব শুনতে পেলাম। কোন প্রাণীর চিৎকার তা আর কাউকে বলে দিতে হবে না। সিংহের গর্জন। সচকিত হয়ে আমরা জলাশয়ের দিকে তাকালাম। চাঁদের আলোয় যা দেখলাম তা হল, কালো ও হলুদ রঙের একটা বড় কিছু লড়াই করতে করতে এবং গড়াতে গড়াতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এই দৃশ্য দেখবার পর এক জায়গায় তো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। হাতে রাইফেল নিয়ে এগিয়ে আসা বস্তুটাকে তাক করে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। অল্প একটু সময় পরেই গড়িয়ে আসা জিনিসটা একেবারে থেমে গেল। সেই সঙ্গে আর্তরবও আর শোনা গেল না। ঘটনাটা কী তা জানবার জন্য আমরা এগিয়ে গেলাম।

যা দেখলাম তা একেবারে অকল্পনীয়। আফ্রিকার জঙ্গলের বিশেষ এক সৌন্দর্য হল কৃষ্ণসার মৃগ। ঘটনাটা হয়ত এইভাবে ঘটতে পারে– একটা কৃষ্ণসার হরিণ নদীর বুকে জমে থাকা পানি খেতে এসেছিল। সেই সময় কাছে পিঠে একটা সিংহ ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল কারণ খানিক আগেই আমরা সিংহের গর্জন শুনতে পেয়েছিলাম। হরিণটা যখন পানি খাচ্ছিল সিংহটা তখন তার ওপর লাফিয়ে পড়ে। ঘটনাচক্রে হরিণের ঢেউ খেলানো শিংয়ের ওপর পড়ে সিংহের পাঁজরাটা একেবারে গাঁথা হয়ে

যায়। নিজেকে মুক্ত করবার প্রয়াসে সিংহ এবার হরিণের কাঁধে ও পিঠে কামড়াতে শুরু করে। যন্ত্রণায় হরিণও ছুটতে শুরু করে। এক সময় দু'জনেই মারা যায়।

আমাদের আর গুলি চালানোর প্রয়োজন পড়ল না। কাফেরদের ডাকতেই তারা দৌড়ে এসে মৃত প্রাণী দুটোকে আমাদের শিবিরের কাছে টেনে এনে ঝটপট তাদের চামড়া ছাড়িয়ে নিল। আমরা আর রাত না জেগে শুয়ে পড়লাম। পরের দিন যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল হয়ে গিয়েছে।

আবার শিকারে যাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত হতে লাগলাম। তিনটা রাইফেল ও যথেষ্ট পরিমাণে কার্তুজ সঙ্গে নিলাম। কয়েকটা ফাঁকা জলের বোতলে ঠান্ডা চা ভরে নিলাম। শিকারে গিয়ে শরীরকে চাঙ্গা রাখতে হলে চায়ের খুব প্রয়োজন পড়ে। সামান্য একটু প্রাতরাশ খেয়ে খিবা, উমবোপা ও ভেন্টভোগেলকে সাথে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। অন্য কাফেরদের নির্দেশ দিয়ে এলাম তারা যেন মৃত সিংহের চামড়া ছাড়িয়ে রাখে এবং কৃষ্ণসার হরিণের মাংস রান্নার জন্য কেটে কুটে রাখে।

যাওয়ার পথে বিভিন্ন লক্ষণ যাচাই করে ভেন্টভোগেল জানাল কুড়ি-তিরিশটা হাতির একটা পাল আমাদের আগে আগে গিয়েছে এবং পালের সব হাতিগুলোই প্রাপ্ত বয়স্ক। ইতিমধ্যে সকাল ন'টা বেজে গিয়েছে এবং বেশ গরম লাগতে শুরু করেছে উপড়ে ফেলা গাছ, মোচড়ানো গাছের ডাল ও হাতির গরম বিষ্ঠা দেখে বুঝতে পারলাম ঐ পালটা আমাদের থেকে খুব একটা দূরে নেই।

প্রায় দুশো গজ দূরে একটা নিচু জায়গায় আমরা এবার তাদের দেখতে পেলাম। ভেন্টভোগেল নামের চাকরটা ঠিক কথাই বলেছিল। হাতিরা সংখ্যায় কুড়ি তিরিশ তো হবেই। ইতিমধ্যে তারা নিশ্চয়ই পেট পুরে গাছের ডাল পাতা খেয়েছে। মনের সুখে কুলোর মতো কানগুলো তারা নাড়িয়ে চলেছে। হাওয়া কোন দিকে বইছে তা জানবার জন্য এক মুঠো ঘাস আমি ওপরের দিকে ছুড়ে দিলাম। ঘাসগুলো হাতিদের দিকে না গিয়ে আমাদের দিকে ফিরে এল। যদি ওদের দিকে যেত তাহলে ওরা হয়ত পালিয়ে যেত। আমাদের আগমনের কথা বুঝতে পারেনি বলে ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম। হঠাৎ আমাদের চোখে পড়ল তিন তিনটা হাতি। তার মধ্যে একটা হাতির দাঁত ছিল অসাধারণ সুন্দর। নিচু গলায় আলোচনা করে স্থির করলাম, আমি গুলি করব মাঝখানের প্রাণীটাকে, বাঁ দিকের হাতিটাকে মারবে স্যার হেনরি এবং বিশাল দাঁতওয়ালা হাতিটা পড়ল ক্যাপ্টেন গুডের ভাগে।

আমি সংকেত দিতেই রাইফেল তিনটা গুড়ুম গুড়ুম করে গর্জে উঠল। স্যার হেনরির গুলি খেয়ে বাঁ দিকের হাতিটা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। যে হাতিটাকে আমি গুলি করলাম সেটা তো সাথে সাথে মাটিতে এমনভাবে বসে পড়ল যেন এখুনি মারা যাবে। কিন্তু পা মুড়ে কয়েক সেকেন্ড বসে থাকবার পরেই সে উঠে দাঁড়াল এবং প্রচন্ড গতিতে আমাকে অতিক্রম করে ছুটতে লাগল। আমি দ্বিতীয় গুলি ছুড়লাম। সেটা গিয়ে তার পাঁজর ফুটো করে দিতেই সে আবার মাটিতে পড়ে গেল। অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে আমি বন্দুকে দু'টো গুলি ভরে নিলাম এবং আহত হাতির কাছে ছুটে গিয়ে তার মাথা লক্ষ্য করে আর একটা গুলি চালিয়ে দিতেই হাতিটা একেবারে নিশ্চল হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। এবার আমি ক্যাপ্টেন গুডের দিকে চোখ ফেরালাম।

দাঁতাল হাতিটা গুলি খেয়ে বিরাট একটা চিৎকার করে তার আক্রমণারীর দিকে তেড়ে আসতে লাগল। গুলির শব্দ ও আহত হাতিদের চিৎকারে ভীত হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা হাতির পাল এদিক ওদিকে দৌড়াতে শুরু করল। ইত্যবসরে ক্যাপ্টেন গুড একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেলে হাতিটা তাকে দেখতে না পেয়ে সোজা ছুটে চলল।

এখন আমাদের সামনে দুটো করণীয় ছিল। এক, আহত হাতিটার পিছনে ছুটে চলা অথবা, যে হাতিগুলো উদ্ভ্রান্তের ন্যায় জঙ্গলের মধ্যে ছুটছিল তাদের অনুসরণ করা। বিশাল শরীরের চাপে বড় বড় ঝোপগুলো তারা একেবারে ঘাসের মতো মাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই তাদের গতি পথ বুঝতে আমাদের অসুবিধা ছিল না।

শুধু বুঝতে পারা আর তাদের বন্দুকের নাগালের মধ্যে পাওয়া দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। প্রখর রোদে পাকা দু'ঘণ্টা ছুটবার পর সেই পালকে দেখতে পাওয়া গেল। একটা দাঁতাল হাতি বাদে অন্য সবগুলো একত্রে দাঁড়িয়েছিল এবং শূন্যে শুঁড় তুলে যেন বাতাসে বিপদের গন্ধ শুঁকছিল। যে দাঁতাল হাতিটা একাকী দাঁড়িয়েছিল তার থেকে আমাদের দুরত্ব ছিল প্রায় ষাট গজ। আমাদের দেখতে পেলে কিংবা উপস্থিতি টের পেলে সে নিশ্চয়ই অন্যদের সচকিত করে দেবে এবং তারা আবার দৌড় লাগাবে। যে জায়গায় আমরা পৌছে ছিলাম সেখানে ঝোপের আবরণ খুব ঘন ছিল না। তাই ঠিক করলাম, আর এতটুকুও না এগিয়ে হাতিটাকে নিশানা করে আমরা তিন জনেই একসাথে গুলি ছুড়ব। আমাদের গুলি তিনটা গায়ে লাগতেই হাতিটা মাটিতে পড়ে গেল এবং তার সঙ্গীরা প্রাণভয়ে ছুটতে শুরু করল। তাদের কপাল এত খারাপ ছিল যে অল্প দূরেই উঁচু পাড়ওয়ালা নালার মধ্যে সব প্রাণীগুলোই গিয়ে পড়ল। এটা আসলে ছিল একটা শুকনো নদী। তাদের পিছনে ধাওয়া করে এসে দেখলাম আমাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তারা ওদিকের পাড়ে উঠবার চেষ্টা করছে; সেই সাথে মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে সব ক'টা প্রাণীই আর্তনাদ করছে। তাদের চিৎকারে আমাদের কানে তালা লেগে গেল। বিলম্ব না করে আমরা গুলি চালালাম এবং পাঁচটা হাতিকে শেষ করে ফেললাম। জীবিত হাতিগুলোর যেন বুদ্ধি একটু খুলল মনে হল। উঁচু পাড় বেয়ে তারা আর ওপরে উঠবার চেষ্টা না করে নালা ধরে তারা নিচের দিকে পালাতে লাগল। আমরা তাদের আর অনুসরণ করলাম না কারণ এক দিনে আট আটটা হাতি শিকার করা যে কোনো বড় শিকারির স্বপ্ন।

কাফেরগুলো ইতিমধ্যে আগে শিকার করা তিনটা হাতির মধ্যে দু'টোর কলজে কেটে ফেলেছে। এবার আমরা তাঁবুর দিকে ফিরে যেতে মনস্থ করলাম। ঠিক হল, মরা হাতির দাঁত কেটে নেবার জন্য আমরা কয়েকজন কাফেরকে পাঠাব।

যে জায়গায় ক্যাপ্টেন গুড একটা হাতিকে জখম করে নিজে ঝোপের আড়ালে বসেছিল বলে বেঁচে গিয়েছিল ক্রমে আমরা সেই জায়গায় ফিরে এলাম। সেখানে আবার এক পাল হরিণ দেখলাম। আমাদের সাথে প্রচুর পশু মাংস ছিল বলে আমরা আর বন্দুক উঠালাম না। হরিণগুলো লাফাতে লাফাতে কিছু দূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখতে লাগল। ক্যাপ্টেন গুডের খুব কৌতুহল ছিল কৃষ্ণসার হরিণ দেখার। উমবোপার হাতে নিজের রাইফেলটা দিয়ে ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে সে ঐ হরিণের পালের দিকে লঘু পায়ে এগিয়ে গেল। ঝোপের আড়াল থেকে

কৃষ্ণসার হরিণদের প্রাণ ভরে দেখবার সাধ মেটাবে ক্যাপ্টেন গুড। পরিচারক খিবা তার সাথে গেল। খানিকটা সময় বিশ্রাম করে নেবার সুযোগ পাব বলে আমাদেরও ভাল লাগল।

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আমি ও স্যার হেনরি অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখছি। হঠাৎ একটা হাতির চিৎকারে আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম। অস্তগামী সূর্যের ঠিক বিপরীতে শুঁড় উঁচিয়ে একটা হাতিকে ছুটে আসতে দেখলাম। ক্যাপ্টেন গুড ও খিবা যে ঝোপটাতে বসেছিল সেটাকে লক্ষ্য করেই হাতিটা ছুটে আসছে। হাতিকে আসতে দেখে তারাও ঝোপ থেকে বেরিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে আমাদের দিকে আসতে লাগল। আমরা বন্দুক হাতে উঠিয়ে নিলাম বটে কিন্তু হাতির থেকে আমাদের দূরত্ব এতখানি ছিল যে বন্দুক ছুড়েও কোনো লাভ হত না। বরং আমাদের গুলিতে আমাদের সঙ্গীদেরই প্রাণহানির অবকাশ ছিল। এদিকে ক্যাপ্টেন গুড ও খিবা তো আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন তার জুতা ও পোশাকের ব্যাপারে এত খুঁতখুঁতে যে প্রাণের চেয়েও পোশাকের ইজ্জত তার কাছে বেশি। ছুটতে ছুটতে জুতার দিকে নজর দিতে গিয়ে পা পিছলে উপুড় হয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল। হাতিটা তখন তার খুব নিকটেই এসে গিয়েছে।

আমাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। হাতির পায়ের তলায় তো ক্যাপ্টেনকে মরতেই হবে। দু'এক মুহূর্তের মধ্যেই তার জীবন শেষ হয়ে যাবে। হঠাৎ খিবা নামের জুলু ছেলেটা একটা অবিশ্বাস্য কাজ করে বসল। হাতের ছোরাটা সে হাতির মুখে ছুড়ে মারল। যন্ত্রণায় হাতিটা আরেক বার চিৎকার করল এবং একটু থমকে গেল। আমরাও ওদিকে ছুটতে ছুটতে খানিকটা এগিয়ে এসেছি।

পর মুহূর্তে হাতিটা একটা কান্ড করে বসল। খিবাকে শুঁড় দিয়ে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলল এবং তার পেটে একটা পা তুলে দিল। তারপর খিবার শরীরের ওপরের অংশটা সুঁড় দিয়ে আবার পেঁচিয়ে ধরে বিরাট জোর একটা টান মারতেই তার শরীরটা দু'টুকরো হয়ে গেল।

এই দৃশ্য দেখে পশুটাকে লক্ষ্য করে আমরা দু'জনেই গুলি চালিয়েছি খেয়াল ছিল না। গুলির আঘাতে হাতিটা খিবার মৃত শরীরের ওপরই প্রচন্ড শব্দে পড়ে গেল।

ক্যাপ্টেন গুড মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং যে লোকটির জন্য সে বেঁচে গিয়েছে তার ছিন্নভিন্ন শরীরে পরম আদরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে চাপা কষ্টে আমার গলা বুজে আসতে লাগল। উমবোপা অনেকক্ষণ একই জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। এক সময় সে মন্তব্য করল, 'লোকটা মারা গেল বটে, সত্যিকারের পুরুষ মানুষরাই এভাবে মরতে পারে।'

৫
বালু সাগরে অভিযান

মোট ন'টা হাতি মেরে আমরা প্রচুর পরিমাণে গজদন্ত পেলাম। এত চমৎকার গজদন্ত আমি আগে দেখিনি। শিকার করা হাতিগুলোর মুখের এক পাশের দাঁতের দাম চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পাউন্ড হবে। তবে যে হাতিটা খিবাকে মেরে ফেলেছিল তার এক জোড়া দাঁতের দাম কমপক্ষে একশো সত্তর পাউন্ড তো হবেই। এত ভারি গজদন্ত নিয়ে তো পথ চলা যাবে না। আমাদের শিবিরের কাছে একটা বড় গাছ ছিল যেটাকে বহু দুর থেকে দেখা যেত। বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে ওটাই ছিল পথের নিশানা। গাছের কাছে বালি খুঁড়ে গজদন্তগুলোকে আমরা লুকিয়ে রাখলাম।

খিবার দেহাবশেষও আমরা সমাধিস্থ করলাম। আরো একটা সুন্দর পৃথিবীতে যাওয়ার জন্য তারও কিছু সুরক্ষার প্রয়োজন সেই কারণে একটা বড় ছোরা আমরা তার কবরে রেখে দিলাম। এই জায়গায় হয়ত আমরা আবার ফিরে আসতে পারব সেই আশা নিয়ে তৃতীয় দিনে আমরা বেরিয়ে পড়লাম এবং লুকাংগা নদীর কাছে সিতান্দা ক্রাল নামের একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। আমাদের প্রকৃত অভিযান ঐ স্থান থেকেই শুরু হবে। জায়গাটার ডানদিকে স্থানীয় আদিবাসীদের একটা গ্রাম ছিল। গরু-মহিষের কয়েকটা গোয়ালঘর চোখে পড়ছিল। নিচের দিকে নদীর পাড়ে তাদের চাষের জমিও দেখা যাচ্ছিল। ওসব ছাড়িয়ে গেলে একটা বনভূমি পড়বে। শুনেছিলাম, ঐ বনভূমিতে ছোটখাটো শিকারযোগ্য প্রাণী পাওয়া যায়। বাঁদিকে ছিল অন্তহীন মরুভূমি। প্রকৃতির যে কী খেয়াল! মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ করে একটা উর্বর ও বাসযোগ্য জায়গা জেগে উঠেছে!

আমরা যে জায়গায় তাঁবু ফেললাম তার ঠিক নিচে ছিল একটা ঝরনা। খানিকটা এগিয়ে গেলে দেখা যাবে একটা পাথুরে ঢল ঝরনার দিকে নেমে এসেছে। ওটা চোখে পড়তেই আমি কুড়ি বছর পিছনে ফিরে গেলাম। রাজা সলোমনের রত্নাগার অন্বেষণে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সিলভেস্ট্রাকে ঐ পথেই ফিরে আসতে দেখেছিলাম। পাথুরে ঢলের ঠিক ওপাশেই শুরু হয়েছিল শুষ্ক মরুপ্রান্তর যেখানে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটা কাঁটা গাছের ঝোপই কেবল দেখা যেত।

বিরাট আগুনের গোলাটা মরুপ্রান্তরের ওপারে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছিল। তাঁবু ফেলার দায়িত্ব ক্যাপ্টেন গুডের ওপর সমর্পণ করে আমি ও স্যার হেনরি একটু দূরে গিয়ে বসলাম। আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল বলে দূরে বরফঢাকা সুলিমান পর্বতের চূড়াও দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমি বললাম, 'ঈশ্বর জানেন, আমরা ঐ জায়গায় পৌছাতে পারব কিনা।'

স্যার হেনরি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলল, 'আমার ভাই তো ওখানেই আছে। যে কোনো ভাবেই হোক, আমি ওখানে ঠিক পৌঁছে যাব।'

তার কথায় সায় দিয়ে তাঁবুতে যাব বলে মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলাম আমাদের ঠিক পিছনে উমবোপা দাঁড়িয়ে আছে। দিগন্তের ওপারে সুলিমান পর্বতের চূড়ায় তারও দৃষ্টি নিবদ্ধ।

উমবোপা নিজেকে স্যার হেনরির ভৃত্য বলেই মনে করত। স্যার হেনরিকে উদ্দেশ করে বলল, 'হে ইনকুবু, তুমি কি ঐ পাহাড়েই যেতে চাও?' (স্থানীয় ভাষায় ইনকুবু-র অর্থ হল, হাতি)

একজন শ্বেতাঙ্গকে এত ঘরোয়াভাবে সম্বোধন করায় আমার রাগ হল। এখানকার আদিবাসীরা নিজেদের বন্ধু বান্ধবকে যে নামে খুশি ডাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান দেখাব না! আমার উষ্মা দেখে উমবোপা হাসতে হাসতে বলল, 'আমিও যে তোমাদের সমকক্ষ নই তা কী করে মনে হল তোমার? স্যার হেনরি যে বড় বাড়ির ছেলে তার আচরণ ও চেহারা দেখে তা বোঝা যায়। আমিও তার চেয়ে কম নই। হে ইনকুবু, আমার প্রভু, আমার মনের কথা একটি বার শোন।'

একটা কাফের আমাদের সাথে এত স্বচ্ছন্দভাবে কথা বলবে তা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। কিন্তু কেন জানি না, তাকে আমার ভাল লেগেছিল বলেই হোক কিংবা সে যা বলতে চেয়েছে তাতে আমার কৌতূহল হয়েছিল বলেই হোক, তার কথা আমি অনুবাদ করে স্যার হেনরিকে শোনালাম। সেই সাথে তার এই উদ্ধত আচরণ যে আমার পছন্দ নয় তাও বললাম।

স্যার হেনরি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, উমবোপা, তুমি ঠিকই ধরেছ, আমাদের গন্তব্যস্থল ওটাই।'

উমবোপা বলল, 'এই মরুভূমি অন্তহীন এবং কোথাও এক বিন্দু পানি পাওয়া যাবে না। দূরের পাহাড়গুলো খুবই উঁচু এবং দুর্গম; তার ওপর বরফঢাকা। সূর্য যেখানে অস্ত গেল তার ওপারে যে কী আছে তা মানুষের অজানা। ঐ ভয়াবহ অঞ্চলে তুমি যাবে কী করে এবং যাওয়ার প্রয়োজনই বা কী?'

তার কথা তর্জমা করে শোনাতেই স্যার হেনরি বলল, 'ঐ অঞ্চলে এমন একজন লোক গিয়েছে যার সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক আছে। সে আমার ভাই, তাকে খুঁজতে আমি ওখানে যেতে চাই।'

– কিছু দিন আগে একজন হোটেনটট জাতির লোকের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সে আমাকে জানিয়েছিল, যে বছর দুই আগে এক শ্বেতকায় ব্যক্তিকে সুলিমান পর্বতের দিকে যেতে দেখেছে। তার সাথে একটা চাকরও ছিল। তবে তারা আর ফিরে আসেনি।

– তুমি জানলে কী করে যে শ্বেতকায় লোকটি আমারই ভাই?

– আমি আর জানব কী করে! তবে ঐ হোটেনটট লোকটা বলেছিল যে শ্বেতাঙ্গ লোকটির চোখ ঠিক তোমার মতোই ছিল এবং তার মুখে কালো দাড়ি ছিল। চাকরটা অবশ্য শিকার করতেও পারদর্শী ছিল। তার নাম ছিল জিম, লোকটা বেচুয়ানা দেশের এবং জামা কাপড়ও পরে।

– আমার ভাইকে তো আমি চিনি, সে যদি কোনো কাজ করবে বলে তো করেই ছাড়বে। বাল্যকাল থেকেই তার এইরকম প্রকৃতি। সে যদি সুলিমান পর্বতের ওপাশে যেতে মনস্থ করে থাকে তাহলে সে নিশ্চয়ই চলে গিয়েছে। তবে দুর্ঘটনা ঘটলে আলাদা কথা।

– হ্যাঁ, পথটা অনেক দূরের সন্দেহ নেই।

উমবোপা ইংরেজি বলতে পারত এবং বুঝতেও পারত, তবে কদাচিৎ সে ইংরেজি বলত।

স্যার হেনরি বলল, 'নিশ্চয়ই অনেক দূর, তবে মানুষ যদি মন থেকে চায় তাহলে যে কোনো কাজই সে করতে পারে। এই দুনিয়ায় এমন কোনো পর্বত নেই যা সে চড়তে পারবে না; এমন কোনো মরুপ্রান্তর নেই যা সে অতিক্রম করতে পারবে না। যদি তার মনে কাজের প্রতি টান থাকে এবং যে কোনো ঝুঁকি নিতে সে রাজি থাকে তাহলে যে কোনো কাজেই সে সফল হতে পারবে। সফল হতে গেলে বাঁচব, কি মরব এসব ভাবলে চলবে না। বাঁচা-মরার হিসাবটা ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়ে কাজে এগোতে হবে।'

স্যার হেনরির কথাগুলো জুলু ভাষায় অনুবাদ করে দিলে উমবোপা বলল, 'হে পিতা, আপনি অসাধারণ কথা বলেছেন। এসব কথা শুনলে বুকে সাহস আসে। তবে আমিও বলি। জীবন কথাটার মানে কী? জীবন হল একটা পালক, জীবন হল ঘাসের বীজ যা হাওয়ায় উড়তে উড়তে এখানে ওখানে গিয়ে পড়ে। বীজ থেকে নতুন গাছ জন্ম নেয়, আবার কখনো বীজ শুকিয়ে মারা যায়, কখনো বা স্বর্গেও পৌঁছে যায়। বীজ যদি ভাল ও ভারি হয় তাহলে নিজের রাস্তা ধরে সে বেশ কিছু দূর চলে যায়। তাই প্রত্যেকের উচিত বাতাসের সাথে লড়াই করে নিজের পছন্দসই রাস্তায় এগিয়ে যাওয়া। মানুষ তো মরবার জন্যই জন্মেছে। তবে হ্যাঁ, ঝুঁকি নিলে সে হয়ত কিছুদিন আগে মারা যেতে পারে। সেই জন্য আমি ভীত নই। তোমাদের যাত্রার সাথী হয়ে আমি মরুভূমি অতিক্রম করতে চাই, পাহাড় ডিঙাতে চাই। রাস্তায় যদি আমার মৃত্যুও হয় সেজন্য আমি চিন্তা করি না।'

একটু থেমে সে আবার অলংকারপূর্ণ ভাষায় নিজের কথা বলতে শুরু করল। জুলু সম্প্রদায়ের লোকেরা এইরকম ভাষা প্রায়ই ব্যবহার করে। এতে পুনরাবৃত্তি দোষ থাকলেও বক্তার বুদ্ধিমত্তা ও কাব্যিক উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উমবোপা বলতে থাকল, 'জীবন মানে কী? হে শ্বেতকায় ব্যক্তিরা যারা জ্ঞানী বলে পরিচিত, যারা এই বিশ্বের রহস্য, তারকাদের দেশের রহস্য, তারকাদের দেশ ছাড়িয়ে যে মহাবিশ্ব আছে তার রহস্যের কথা জানে! যারা শব্দ কিংবা কাব্য ছাড়াই অতিদূর থেকে মনের ভাষা ব্যক্ত করতে পারে, তারা আমাকে বলে দিক এই জীবনের অর্থ কী, জীবন কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় চলে যায়।

'তোমরা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না, উত্তর তোমরা জানো না। তাহলে আমিই বলে দিই। তিমির থেকে আমরা এসেছি আবার তিমিরেই ফিরে যাব। আঁধার রাতে ঝড়ের কবলে পড়ে যাওয়া পাখির মতো আমরা অসীম শূন্য থেকে ভেসে আসি ক্ষণিকের জন্য। আমাদের ডানায় আলো পড়লে আমরা দৃশ্যমান হই, আবার মহাশূন্যে হারিয়ে যাই। জীবন মানে শূন্য, জীবন মানে পূর্ণ। এটাই হল সেই হাত যা

দিয়ে আমরা মরণকে আটকে রাখতে পারি। এটা হল একটা জোনাকি যা রাতের বেলায় চকচক করে কিন্তু দিনের আলোতে ম্লান হয়ে যায়। শীতের দিনে এটা হল গরুর সাদা নিশ্বাস। তৃণভূমির ওপর দিয়ে ছুটে চলা এটা একটা ছোট্ট ছায়া সূর্যাস্তের সময় যা বিলীন হয়ে যায়।'

তার বলা শেষ হলে স্যার হেনরি তাকে অভিনন্দন জানাল, 'বাহ্ ভারি চমৎকার লোক তো তুমি!'

হাসতে হাসতে উমবোপা উত্তর দিল, 'তোমার সাথে আমার খুব মিল আছে। তোমার মতোই আমিও চলেছি আমার ভাইয়ের খোঁজে যে পাহাড়ের ওপাশে থাকে।'

তার কথা শুনে আমি সন্দিগ্ধভাবে তার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলাম, 'ঐ পাহাড়গুলো সম্বন্ধে তুমি কী জানো?'

সে বলল, 'খুব সামান্য। যৎ সামান্য। পাহাড়ের ওপারে যে দেশটা রয়েছে, সেটা বড় রহস্যময়। জাদুর দেশ, সৌন্দর্যের দেশ সেটা। কী নেই সেখানে! গাছের সারি, ঝরনা, সাহসী লোকজন, বরফ ঢাকা পাহাড় চূড়া, সুদূর বিস্তৃত শুভ্র এক পথ। এসব কথা আমি শুনেছি মাত্র। কিন্তু কথা বলেই বা কী লাভ? এখন চল, তাঁবুতে ফেরা যাক। যারা দেখবার জন্য বেঁচে থাকবে তারাই দেখবে সব কিছু।'

তার কথা শুনে মনে হল সে এমন কিছু জানে যা আমরা জানি না। সন্দেহভরা দৃষ্টিতে আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আমার কৌতুহলী দৃষ্টি দেখে সে বলল, 'আমাকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই তোমার। তোমাকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার জন্য আমি তো গর্ত খুঁড়ছি না আর আমি কোনো ষড়যন্ত্রও করছি না। যেখানে সূর্যটা অস্ত গিয়েছে আমরা যদি কখনো সেই জায়গাটা পার হয়ে ঐ পাহাড়ের কোলে পৌঁছাতে পারি তাহলে আরো অনেক কথা আমি তোমাদের শোনাব। তবে ওটা হল মৃত্যুর দেশ। এখান থেকেই যদি আমরা ফিরে যাই তা আমাদের পক্ষেই মঙ্গলজনক হবে। যাক, আমার কথা এবার ফুরোল।'

আর একটিও শব্দ উচ্চারণ না করে হাতের বর্শাটা তুলে সে আমাদের সেলাম জানাল। আমরা যখন তাঁবুতে ফিরে এলাম তখন দেখলাম অন্য কাফেরদের মতোই সে বন্দুক পরিষ্কার করছে।

স্যার হেনরি তার প্রতিক্রিয়া জানাল, 'লোকটা বড়ই বিচিত্র!'

আমি বললাম, 'ও অনেক কিছু জানে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে ওর মুখ ফোটানো শক্ত, রাগারাগি করেও লাভ নেই কারণ আমাদের যাত্রাপথ ও অভিযানের লক্ষ্য এই জুলুর মতোই রহস্যময়।'

পরের দিন ওখান থেকে আমাদের চলে যাওয়ার কথা। হাতি শিকারের জন্য যে ভারি ভারি রাইফেল ছিল সেগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে খুব কষ্টকর হত। তাই ঠিক করলাম, আদিবাসীদের এক বুড়ো মোড়লের কাছে ওগুলো রেখে যাব। মোট বাহকদের বিদায় করে দিয়ে মোড়লের জিম্মায় আমরা রাইফেলগুলো দিয়ে দিলাম। মোড়লটা যে খুব ধূর্ত এবং লোভী তার চোখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম। তবে আমিও বোকা নই, রোগের ওষুধ আমারও জানা আছে।

সব ক'টা রাইফেলে আমি গুলি ভরলাম। মোড়লকে বললাম এগুলো সে যেন নাড়াচাড়া না করে। রাইফেল থেকে গুলি বেরিয়ে গেলে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যেতে

১৬
মৃত্যুর দেশে

তিন দিন পর সন্ধ্যার মুখোমুখি আমরা 'মৌনী ত্রিমূর্তি' অর্থাৎ পাহাড় তিনটা যেখানে একটা ত্রিভূজ তৈরি করেছে সেখানে গিয়ে পৌছলাম। সলোমনের রাজপথটা ওপাশ দিয়েই গিয়েছে। আমরা তিনজন ছাড়াও দলে ছিল তিনজন ভৃত্য, ইনফাদুস, ফৌলাটা যে আমাদের তিন জনকে দেখাশুনা করলেও ক্যাপ্টেন গুডের খেয়াল বেশি রাখত এবং গাগুল। তাকে একটা পালকি করে বয়ে আনা হয়েছিল এবং সারাটা রাস্তা সে দলের সব লোক জনকে গালি গালাজ করতে করতে এসেছিল। আমাদের সাথে বেশ কয়েকজন রক্ষীও ছিল। পাহাড় তিনটার একটা ছিল আমাদের ডানদিকে, আরেকটা ছিল বাঁদিকে এবং তৃতীয়টা ছিল একেবারে আমাদের সামনের দিকে। পরের দিন সকালে সূর্যের প্রথম আলোয় পাহাড় তিনটার চূড়াগুলো কী যে অপরূপ লাগছিল! বরফের সাদা মালা পরে শৃঙ্গ তিনটা আমাদের থেকে অনেক অনেক ওপরে নীল আকাশের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। বরফ রেখার নিচের অংশটা ছিল বেগুনি, আরো নিচের অংশটা ছিল ঝোপঝাড়ে ভর্তি। সলোমনের রাজপথটা পাঁচ মাইল দূরে মাঝের পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওটাই ছিল রাজপথের শেষ প্রান্ত।

সকালে আমরা যখন ঐ স্বপ্নপুরীর উদ্দেশে রওয়ানা দিই তখন আমাদের মধ্যে যে কী উন্মাদনা ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা সেই রত্নের খনিতে পৌছাতে চলেছি যার জন্য তিনশো বছর আগে পতুর্গীজ অভিযাত্রী হোসে ডা সিলভেস্ট্রা এবং তার বংশধর এবং আরো পরবর্তীকালে স্যার হেনরির ভাই জজ কার্টিসকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। আমাদের কপালে কি ভাল কিছু লেখা আছে? বুড়ি গাগুল তো বলেই দিয়েছে, আগেও লোকে খালি হাতে ফিরেছে এবং আমাদেরও ফিরতে হবে। আমাদের গন্তব্যস্থলের শেষ পর্যায়ে পৌছে নিজেকে বেশ সংস্করাচ্ছন্ন মনে হতে লাগল। আমার মনে হয়, স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুডের মানসিক অবস্থা একই রকম ছিল।

মনের উত্তেজনায় ঘণ্টা দেড়েক আমরা তিনজন ছুটতেই শুরু করেছিলাম বলা যায়। আর একটুখানি গেলেই হিরার খনি চলে আসবে আমাদের হাতের মুঠোয়। সে যে কী আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমাদের ছুটবার ফলে গাগুলের পালকি বাহকরা আমাদের সাথে তাল রাখতে না পেরে বারবার পিছিয়ে পড়ছিল। পালকির ঝাঁকুনিতে ব্যথা পেয়ে গাগুল আরো বেশি গালি গালাজ করছিল।

পালকি থেকেই সে চিৎকার করছিল, 'আরে সাদা ভুতের দল, অত জোরে ছুটছিস, কেন? রতনের টানে, না মরণের টানে ছুটছিস তোরা?' কথাগুলো বলে সে এমনভাবে হাসছিল যে, উৎসাহ হারিয়ে আমরা একেবারে ভেঙে পড়ছিলাম।

তার কথাকে উপেক্ষা করে আরো কিছুদূর যাওয়ার পর পাহাড়ের গায়ে একটা বড় গহ্বর দেখতে পেলাম। দূর থেকেই মনে হল ওটার গভীরতা কম পক্ষে তিনশো ফুট হবেই। গহ্বরের মুখটা অন্তত আধ মাইল চওড়া হবে এবং বাইরের দিকটা বেশ ঢালু।

অদ্ভুত আকারের এই গিরি বিবর দেখে আমি প্রশ্ন করলাম, 'এটা কী হতে পারে বলে তোমাদের মনে হয়?' স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুড দুজনেই অপার বিস্ময়ে গুহার দিকে তাকিয়ে আছে দেখলাম। আমার প্রশ্ন শুনে তারা কেবল ঘাড় নাড়ল। বুঝলাম, গুহার বিশেষত্ব তারা অনুমান করতে পারছে না।

আমি বললাম, 'কিমবার্লিতে খনি থেকে কীভাবে হিরা তোলা হয় তা তোমরা দেখনি মনে হচ্ছে। আমি জোর দিয়ে বলছি ওটাই হল সলোমনের হিরার খনি। গুহার আশে পাশে নীল রংয়ের পাথরগুলো দেখ। ওখান থেকে কীভাবে পাথর কেটে কেটে সিঁড়ির ধাপ তৈরি করেছিল দেখ। ঐ ধাপ দিয়ে ওরা নিচে ঐ নদীতে এসে খনি থেকে বের করে আনা পাথরগুলো ধুয়ে নিত।'

এখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে পড়ল হোসে ডা সিলভেস্ট্রার কাছে দেখা একটা মানচিত্রের কথা। এইখানেই তো রাস্তাটা ভাগ হয়ে গিয়েছে যার একটা ভাগ আংটির মতো গোল হয়ে এই পাহাড়টাকে ঘিরে রেখেছে। পাহাড় কেটে রাস্তাটা তৈরি করা হয়েছে এবং যাতে ধস না নামে সেজন্য পাহাড়ের অংশগুলোকে থাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বহুদূর থেকে পাহাড়ের ঢালু জায়গায় তিনটা বড় বড় থাম অস্পষ্টভাবে দেখা যেত। ওগুলো যে কী বস্তু তা জানবার আগ্রহ আমার আগের থেকেই ছিল। আজ সুযোগ পেয়ে ঐ থাম তিনটার দিকে এগিয়ে যেতেই বুঝলাম, স্থানীয় অধিবাসীরা এগুলোকেই 'মৌন ত্রিমূর্তি' বলে উল্লেখ করে। এগুলো আসলে তিনটা বিশাল আকারের মূর্তি, থাম মোটেই নয়। 'লু' লোকালয় থেকে ওগুলোর দূরত্ব প্রায় ষাট মাইল। মাথার মুকুট থেকে নিচের বেদী পর্যন্ত ওগুলোর দৈর্ঘ্য আঠারো ফুট। মূর্তিগুলোর মধ্যে একটা নারী মূর্তি, অন্য দুটো হল পুরুষের।

খোলা আকাশের নিচে থাকবার ফলে মূর্তিগুলোর অনেক ক্ষয় হয়েছে। নারী মূর্তিটা একেবারে আবরণহীন। পুরুষ মূর্তি দুটোর মধ্যে একটার মুখের ভাব তো একেবারে শয়তানের মতো। একটা পাশবিক নিষ্ঠুরতার ছাপ রয়েছে দ্বিতীয় মূর্তির মুখে। তৃতীয় মূর্তির মুখে রয়েছে একটা অন্য ধরনের ভাব। অন্য মানুষের কষ্ট উপভোগ করবার ভাব নয়, বরং বলা চলে কোনোরকম প্রতিক্রিয়া ছাড়াই অন্যের কষ্ট দেখে যাওয়ার ভাব। বিগত কয়েক শতাব্দী মুখের ঐ ভাব ও চোখের ঐ দৃষ্টি নিয়ে এই তিন 'মৌন মূর্তি' লু লোকালয়ের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে।

মূর্তি তিনটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বেশ কিছু প্রশ্ন আমার মনে ভিড় করতে শুরু করল। যেমন, কারা এই মূর্তিগুলো বানিয়েছিল, কার আদেশে ঐ বিশাল খনির মতো গর্তটা খোঁড়া হয়েছিল কিংবা ঐ রাজপথটা তৈরি করা হয়েছিল। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার মনে পড়ল বাইবেলের পুরনো সংস্করণে উল্লিখিত একটা ঘটনার কথা, যেখানে বলা আছে তিন দেবদেবীর সান্নিধ্যে সলোমন একবার নিরুদ্দেশ হয়ে

সত্ত্বেও ঐ মানচিত্রটিই ছিল আমাদের একমাত্র পথ প্রদর্শক এবং সেটার ওপরই আমাদের অভিযানের সাফল্য নির্ভর করছিল। ঐ মানচিত্রে একটা অপেয় জলের পুকুরের উল্লেখ ছিল যেটা আমাদের যাত্রা শুরুর স্থান থেকে ষাট মাইল দূরে এবং সুলিমান পর্বতের দিক থেকে এলে একই দূরত্বে অবস্থিত ছিল। কিন্তু সুবিশাল বালির সমুদ্রের মধ্যে ঐ জলাশয় খুঁজে বের করা আর খড়ের গাদায় সূচ খুঁজে পাওয়া একইরকম ভাবে দুরূহ। জলাশয় খুঁজতে খুঁজতে আমাদের কাছে রাখা পানীয় জলের ভান্ডার শেষ হয়ে যাবে এবং পিপাসা সহ্য করতে না পেরে আমরা বালির মধ্যেই মরে পড়ে থাকব। আরো একটা ব্যাপার, সিলভেষ্ট্রার তৈরি মানচিত্র তিন শতাব্দী পুরাতন। এর মধ্যে একটা বংশে কত পুরুষ এসেছে এবং চলে গিয়েছে তার হিসাব করা কঠিন। এতগুলি বছরের মধ্যে সেই জলাশয় হয়ত বাতাসে উড়তে থাকা বালিতে চাপা পড়েই গিয়েছে।

রাতের আলোতে চলতে গিয়ে আমাদের অন্য অসুবিধা হচ্ছিল। কখনো খুব ছোট ছোট আগাছায় আমাদের পা আটকে যাচ্ছিল আবার কখনো নরম বালিতে পা পড়ে যাওয়ার ফলে জুতার মধ্যে বালি ঢুকে যাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন গুডের পায়ে ছিল শিকারির জুতা। মাঝে মধ্যে তাকে থামতে হচ্ছিল জুতা থেকে বালি বের করার জন্য। তাপমান কম থাকার জন্য আমাদের গতি ভালই ছিল যদিও মরুস্থলীর নীরবতা আমাদের অসহনীয় লাগছিল।

এক সময় একটা ছোট ঘটনা ঘটে গেল যেটা প্রথমে আমাদের চমকে দিয়েছিল কিন্তু পরে যথেষ্ট হাসির খোরাক জুগিয়েছিল। নৌ-বাহিনীতে চাকুরি করার সুবাদে দিক-নির্ণয় যন্ত্র সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন গুডের ভাল জ্ঞান ছিল। ঐ যন্ত্রটা হাতে নিয়ে সে আগে আগে ছিল আর আমরা পিছনে পিছনে। এক সময় সে বিস্ময়সূচক চিৎকার করল এবং পর মুহূর্তে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আমরা নানা রকম শব্দ শুনতে পেলাম। ঘোঁত ঘোঁত শব্দ, গোঙানি, ছুটে চলা পায়ের শব্দ ইত্যাদি। ভৃত্যস্থানীয় দুজন নিজেদের কাঁধ থেকে মালপত্র ফেলে দিয়ে বন্দুক ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু যখন আত্মরক্ষার জন্য কোনো আবরণ নেই তখন তারা মাটিতে শুয়ে পড়ে চিৎকার করতে লাগল যে আমরা সকলে শয়তানের কবলে পড়েছি। আমি ও স্যার হেনরি দুজনেই যথেষ্ট আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমাদের বিস্ময়ের মাত্রা আরো বেড়ে গেল যখন দেখলাম ক্যাপ্টেন গুড একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে পর্বতের দিকে ছুটে চলেছে এবং সেই সঙ্গে উচ্চৈ স্বরে চিৎকার করে চলেছে। কিছু দূর যাওয়ার পর সে আকাশের দিকে হাত তুলল এবং প্রচন্ড শব্দে মাটিতে পড়ে গেল।

ব্যাপারটা এইরকম হয়েছিল : দিক নির্ণয় যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে সে একটা নিচু জায়গায় পড়ে যায়। সেখানে তখন কতকগুলো খচ্চর জাতীয় পশু শুয়েছিল। পড়বি তো পড়, ক্যাপ্টেন গুড একটা খচ্চরের পিঠে পড়ে যায় এবং জন্তুটাও ঘাবড়ে গিয়ে ছুটতে শুরু করে। তাকে ওভাবে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে অন্যদের সচকিত করে আমি তার দিকে ছুটে গেলাম এবং অক্ষত অবস্থায় তাকে বালির ওপর বসে থাকতে দেখে বেশ স্বস্তি পেলাম। সে খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তার শরীরে কোনো চোট লাগেনি এবং তার চোখের ওপর লাগানো চশমাটি স্বস্থানেই শোভা পাচ্ছিল।

এরপর আর কোনো অঘটন ঘটল না। রাত একটা বাজলে আমরা এক জায়গায় বিশ্রাম নিতে বসলাম। ওখানে গলা ভেজানোর মতো সামান্য পরিমাণ পানি আমরা সকলে পান করলাম। পানিই ছিল ওখানকার সবচেয়ে মহার্ঘ বস্তু।

আবার হাঁটা শুরু হল। এক সময় পুব দিকটা হালকা গোলাপি রঙ ধারণ করল। সেখান থেকে তারপর প্রথমে লাল ও পরে সোনালি রশ্মি বেরিয়ে এসে চরাচরকে আলোকিত করল। মাথার ওপর তারকাদের সংখ্যা কমতে কমতে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। চাঁদ তার উজ্জ্বলতা হারিয়ে আকাশের এক পাশে উপেক্ষিত হয়ে ভেসে থাকল, সূর্যের কিরণ বর্শার আকারে ছুটে এসে কুয়াশার আবরণকে আঘাত করে ছিন্নভিন্ন করে দিল এবং সারা মরুভূমি সোনালি দীপ্তিতে ভেসে যেতে লাগল।

একটু দাঁড়িয়ে আলোর এই পরিবর্তন দেখতে পারলে আনন্দ পেতাম কিন্তু তা করা সম্ভব ছিল না কারণ সূর্য আর একটু ওপরে উঠলে হাঁটতে কষ্ট হবে। আরো এক ঘণ্টা চলার পর পাথরের একটা ছোট ঢিবি আমাদের চোখে পড়ল। ওখানে পৌঁছালে পাথরের ছায়ায় বসা যাবে ভেবে আমরা নিজেদের টেনে নিয়ে চললাম। কাছে গিয়ে দেখলাম একটা পাথর এমনভাবে আড়াআড়ি বেড়েছে যা ছাতার কাজ করবে এবং সেই ছাতার নিচে মসৃণভাবে বালি বিছানো আছে। ওখানে বসে একটু পানি ও খাবার মুখে দিতেই ঘুমে আমাদের চোখ বন্ধ হয়ে এল।

বেলা তিনটার সময় আমাদের ঘুম ভাঙল। সুন্দর ছুরি উপহার পাবার লোভেও কুলিরা আর এক পা যেতে রাজি নয়। তার মানে, অব্যবহৃত জলের ড্রামগুলো ওখানে ফেলে রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে কারণ জলের ড্রাম বয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই যতটা পেটে ধরে ততটা পানিই আমরা সকলে খেয়ে নিলাম। কুলিরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। তাদের তো কুড়ি মাইল পথ হাঁটতে হবে বাড়ি ফিরতে হলে।

বিকাল সাড়ে চারটায় আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। কী নিঃসঙ্গ সেই যাত্রা! অন্তহীন বালু-সমুদ্রে প্রাণের স্পন্দন দেখতে পাওয়া গেল কেবল কয়েকটা উটপাখির মধ্যে। এত শুষ্ক জায়গায় উটপাখিগুলোকে আর শিকার করতে মন চাইল না। বালির মধ্যে দু-একটা গোখরো সাপ ছাড়া অন্য সরীসৃপ প্রাণী চোখে পড়ল না। একটা পতঙ্গ অবশ্য প্রচুর পারিমাণে মরুভূমিতে দেখলাম। তারা যেখানে ছিল, একটা দুটো ছিল না। সংখ্যায় তারা শয়ে শয়ে ছিল। এই পতঙ্গের নাম হল মাছি আমাদের খাবার টেবিলে অহরহ দেখা যায় এদের বয়স অন্তত পাঁচ লক্ষ বছর হবে। পৃথিবীর বুক থেকে যখন শেষ মানুষটি চলে যাবে তখনও এই পতঙ্গ তার মৃতদেহের পাশে ভনভন করে উড়বে এবং তার মুখে নাকে বসবে।

দিনের আলো নিভে এলে আমরা এক জায়গায় বসে পড়লাম। চাঁদ ওঠার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। যথা সময়ে জ্যোৎস্নায় মরুভূমি আলোকিত হলে আমরা আবার পথ চলা শুরু করলাম। রাত দুটোর সময় একটু বিশ্রাম নিয়ে ভোর পর্যন্ত হাঁটলাম। ভোর হয়ে আসছে মানে, আমাদের বিশ্রাম নেবার সময় এগিয়ে আসছে। একটু পানি খেয়ে বালির ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম আমরা। জিনিসপত্র পাহারা দেওয়ার জন্য কারো জেগে থাকার প্রয়োজন ছিল না। ঐ বালির সাগরে মানুষ কোথায় যে আমাদের ওপর চড়াও হতে পারে? ওখানে শত্রু বলতে

তিনটি– রৌদ্রের উত্তাপ, পিপাসা আর মাছি। এই ত্রিমূর্তির চেয়ে ভয়ানক ও হিংস্র কোনো শত্রু মরুভূমিতে থাকতে পারে না। গতকাল আমাদের ভাগ্য যতটা ভাল ছিল আজ তা নেই। গতকাল আমাদের মাথার ওপর একটা লম্বা পাথরের ছায়া ছিল; আজ সেটুকুও নেই। আকাশে সূর্য একটু উঠলেই আমাদের মুখে রোদ এসে পড়বে। ফলে, সকাল সাতটায় অবস্থা এমন হল যে আমাদের ঘুম গেল ছুটে। রোদের তেজ এত তীব্র যে, দেহের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে মনে হল। আমাদের গরম লাগলেও মাছিদের কিন্তু গরম লাগছিল না। তারা সমানে আমাদের মাথার চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

গরমের জ্বালায় আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম। কাছাকাছি না আছে একটা বড় পাথরের আড়াল, না আছে গাছের ছায়া। গরম উনুনের উপরিভাগে গরম হাওয়া যেভাবে নাচ করে সাত সকালে মরুভূমির মাঝখানে উত্তপ্ত হাওয়া সেইভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল।

স্যার হেনরি বলল, 'এই অবস্থায় তো আমরা বেশিক্ষণ বাঁচতেই পারব না। কী করা যায়?'

আমরা একে অন্যের দিকে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে থাকলাম। ক্যাপ্টেন গুডের মাথা বিপদের সময় খেলে ভাল। সে বলল, 'বড় করে একটা গর্ত খোঁড়া যাক এবং গর্তের মুখে কিছু ছোট গাছ চাপা দেওয়া যাক।'

প্রস্তাব হিসাবে একে সর্বোত্তম বলা যাবে না কিন্তু যে অবস্থায় আমরা পড়েছিলাম তাতে সর্ব সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হল এবং আমরা কাজে নেমে পড়লাম। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা দশ ফুট লম্বা, বারো ফুট চওড়া ও দুই ফুট গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে ফেললাম। শিকারের ছুরি দিয়ে কিছু আগাছা কেটে গর্তের ওপর ছড়িয়ে দিলাম। তারপর আমরা গুঁড়ি মেরে গর্তের ভিতর ঢুকে গেলাম। কেবল ভেন্টভোগেল বাইরেই বসে থাকল– হোটেনটট সম্প্রদায়ের লোকরা গরমে কাবু হয় না। সহজে মাটির তলায় ঢুকে যাওয়ার জন্য আমাদের শরীরে সরাসরি সূর্যের আলো পড়ছিল না ঠিকই কিন্তু সেখানে যে কী দমবন্ধ অবস্থা হয় তার বর্ণনা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। কলকাতায় 'অন্ধ কূপ হত্যা'র সাথে আমাদের দুরবস্থার তুলনা করা যেতে পারে। মনে হয়, সেখানকার কষ্ট আমাদের তুলনায় কিছুটা হলেও কম ছিল। আমরা আর শুয়ে থাকতে পারছিলাম না; আমাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল এবং মুখ ও ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছিল। এক টুকরো কাপড় জলে ভিজিয়ে আমরা মুখ মুছে নিচ্ছিলাম। ঐ সময় আমাদের জলের পিপাসা অদম্য হয়ে উঠেছিল কিন্তু মনের ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিয়ে প্রাণ ভরে পানি খেয়ে নিলে দুঘণ্টার মধ্যে আমাদের জলের ভাভার একেবারে শেষ হয়ে যাবে। তারপর শুরু হবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা।

যে জিনিসের শুরু আছে তার শেষ আছে; তবে শেষ দেখার জন্য বেঁচে থাকতে হবে। আমরা জানতাম সন্ধ্যা নেমে এলে খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যাবে। তবে বেলা যখন তিনটা তখন গর্তের মধ্যে শুয়ে থাকা আর সম্ভবপর হল না। বাইরে বেরিয়ে একটু হাঁটতে না পারলে আমরা আর বাঁচব না। বাইরে গেলে রোদের তেজটা হঠাৎ আমাদের শরীরে লাগবে; ভিতরে থাকলে গরমে সেদ্ধ হয়ে যাব এবং সেই সঙ্গে থাকবে প্রবল তেষ্টা। গর্তের মধ্যে রাখা পানিও তো গরম। একটু করে পানি খেয়ে আমরা বাইরেই চলে এলাম।

এতক্ষণ পর্যন্ত মরুভূমির ওপর দিয়ে আমরা পঞ্চাশ মাইল হাঁটলাম। সিলভেস্ট্রার মানচিত্র অনুযায়ী আড়াআড়িভাবে মরুপ্রান্তর একশো বিরানব্বুই কিলোমিটার লম্বা এবং মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গায় জলের উৎস রয়েছে। চল্লিশ লীগ মানে একশো কুড়ি মাইল। মানচিত্র যদি সঠিক হয় তাহলে বারো থেকে পনেরো মাইল হেঁটে গেলেই আমরা জলাশয়ের কাছে পৌছে যাব।

সুর্য ডোবার আগে পর্যন্ত আমরা খুব ধীর গতিতে হাঁটলাম। ঐ সময় আমাদের গতি ছিল ঘণ্টায় দেড় মাইল। সূর্যাস্তের পর আমরা বিশ্রাম নিতে বসলাম কারণ চাঁদ না উঠলে আমরা চলতে পারব না। বসে থাকতে থাকতেই আমাদের ঘুম এসে গেল।

ঘুম আসার আগে উমবোপা মাইল আটেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা টিবির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। টিবিটাকে খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল না এবং ঘুমে আমার চোখ টেনে আসছিল বলে ওটা যে ঠিক কী হতে পারে তা নিয়ে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলাম না।

চাঁদ উঠলে আমাদের যাত্রা আবার শুরু হল। তবে তৃষ্ণা ও গরমে আমাদের চলবার শক্তিটুকুও চলে গিয়েছিল। এইরকম পরিস্থিতিতে না পড়লে আমাদের দুর্দশা কেউ বুঝতে পারবে না। আমরা এখন হাঁটছিলাম না; বলা যেতে পারে, পা টেনে টেনে চলছিলাম এবং মাঝে মাঝেই বালিতে বসে পড়ছিলাম। এইভাবে বসে পড়াটা প্রায় এক ঘণ্টা পর পর হচ্ছিল। কথা বলার স্পৃহাও আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল। যে ক্যাপ্টেন গুড নানা মজার কথা বলে আমাদের হাসাত সেও চুপচাপ হয়ে গেল।

রাত দুটোর সময় আমরা টিবিটার কাছে এসে পৌছলাম। তখন আমরা সবাই শারীরিক ও মানসিকভাবে চূড়ান্ত ক্লান্ত। টিবিটা প্রায় একশো ফুট উঁচু এবং দুই একর জমি জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

এই জায়গাটাকে বিশ্রামের জন্য আমরা বেছে নিলাম। তৃষ্ণায় আমরা এতটাই কাহিল হয়েছিলাম যে এক কাপ করে পানি খেয়ে নিলাম। যেখানে এক গ্যালন জলের প্রয়োজন ছিল সেখানে এক কাপে কী হবে!

গলা ভেজাতেই চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এল। চোখের পাতা বন্ধ হবার আগে উমবোপাকে বলতে শুনলাম : যদি পানি না পাওয়া যায় তাহলে আগামীকাল রাতে চাঁদের মুখ আর দেখতে পাব না; আজকের চাঁদই হবে আমাদের জীবনের অন্তিম চাঁদ।

জুলু ভাষায় উমবোপা যা বলল তাতে একটা শীতল স্রোত আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নিচে নেমে গেল। মৃত্যু এত কাছে এসে গেলে ভয় তো লাগবেই। তবুও মৃত্যুভয় আমাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিতে পারল না।

৬
পানি! একটু পানি!

ঘণ্টা দুই পরে আমার ঘুম ভেঙে গেল। এখন ভোর চারটা। শরীর যখন খুব অবসন্ন থাকে তখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন পড়ে নিদ্রার। সেই প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পর আবার তেষ্টার কশাঘাত অনুভব করতে লাগলাম। একটু আগে স্বপ্নে দেখছিলাম আমি একটা নদীতে স্নান করছি। কী সুন্দর জলের স্রোত। নদীর দুই পাড়ে কত সবুজ গাছ গাছালি। ঘুম ভাঙতেই অনুভব করলাম তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। মনে পড়ল, আগের দিন উমবোপা বলছিল আজ যদি পানি না খেতে পাই তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। ঐ গরমে পানি ছাড়া কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না। বসে বসেই খসখসে হাত দিয়ে আমার ঠোঁট ও চোখের পাতাগুলো ঘষতে লাগলাম। চোখের ওপরের পাতা এবং নিচের পাতা দুটো যেন আঠা দিয়ে কেউ আটকে দিয়েছে; কিছুতেই চোখ খুলতে পারলাম না। খানিকক্ষণ চোখের পাতা রগড়ানোর পর চোখ খুলল। দেখলাম ভোরের আলো তখনও ফোটেনি এবং ভোরের শীতল বাতাসও বইছে না; চারিদিকে কেমন যেন গুমোট একটা ভাব। ধীরে ধীরে সূর্যের আলো বাড়তে লাগল। আমার সাথে ছোট একটা বই ছিল। বইটার পাতা উলটাতে উল্টাতে আমার চোখ একটা জায়গায় আটকে গেল যেখানে লেখা আছে : সুন্দর ছেলেটার ছোট হাতে ছিল একটা সোনার বাটি, তাতে রাখা ছিল পবিত্র বারি যার প্রবাহ রেইম ও নামুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। শীতল জলের ধারা কথাটা চিন্তা করতেই আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। ঐ মুহূর্তে যদি ক্যাথলিক চার্চের কোনো যাজক ঐ জলের ধারে একটা বই, ঘণ্টা ও মোমবাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে আমি তার ওপর লাফিয়ে পড়ে তার হাত থেকে পানিটা কেড়ে নিয়ে খেয়ে নিতাম। মহামান্য পোপের হাত ধোবার জন্য সেই জলে যদি সাবান মেশানো থাকত তাহলেও আমি তা কেড়ে নিতে দ্বিধা করতাম না। আমার মাথায় আর কোনো চিন্তা আসছিল না; কেবল জলের চিন্তা ছাড়া। ঘুরে ফিরে সেই একটাই চিন্তা। রোদে পোড়া চেহারা, রক্তাক্ত চোখ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল এইরকম একটা শিকারি হঠাৎ কোথা থেকে এসে লাফ মেরে যাজকের হাতের ঘটির পানি খেয়ে নিচ্ছে দেখে যাজক ও তার সঙ্গের বালকটি তো একেবারে অবাক হয়ে যাবে– এই দৃশ্যটা ভাবতে ভাবতে মজা পেয়ে আমি কখন যেন জোরে জোরে হেসে ফেলেছিলাম। আমার হাসিতে অন্যদের ঘুম ভেঙে গেল। তারাও হাত দিয়ে রগড়ে রগড়ে আটকে যাওয়া চোখের পাতা খুলবার চেষ্টা করতে লাগল।

আমাদের সকলের ঘুম ভাল করে কাটলে পরিস্থিতির গম্ভীরতা নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। আর একটি ফোঁটাও পানি অবশিষ্ট নেই। জলের বোতলগুলো পুরোপুরি উল্টে দিয়েও কিছু পেলাম না। বোতলগুলো যেন এক একটা শুকনো হাড়। ক্যাপ্টেন গুডের কাছে একটা ব্র্যান্ডির বোতল ছিল। ব্যাগ থেকে বের করে এনে সেটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে। স্যার হেনরি এক ঝটকায় সেটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিল। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মদ খাওয়া মানে অন্তিম অবস্থাকে ত্বরান্বিত করা।

'এখন পানি না পেলে আমাদের মরতে হবে,' সে বলল।

আমি বললাম, 'আমরা যদি বৃদ্ধ ডমের তৈরি মানচিত্র ঠিক বলে মানি তাহলে আমাদের কাছাকাছি কোথাও পানি রয়েছে।' আমার মন্তব্যে অন্যেরা যে খুশি হল তা মনে হল না। তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হল ঐ মানচিত্রে তাদের খুব একটা আস্থা নেই। দিনের আলো ধীরে ধীরে ফুটছিল। হোটেনটট সম্প্রদায়ের লোকটা মানে, ভেন্টভোগেলকে মাটির দিকে চোখ রেখে হাঁটতে দেখলাম। কয়েক পা হাঁটার পর সে একটা বিস্ময় সূচক শব্দ করল এবং কাছাকাছি একটা জায়গার প্রতি আঙুল দিয়ে নির্দেশ করল।

ব্যাপারটা কী জানবার জন্য আমরা সকলে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি বললাম, 'বালির ওপর যা দেখা যাচ্ছে তা কৃষ্ণসার হরিণের পায়ের ছাপ।'

ডাচ ভাষায় সে উত্তর দিল, 'এই ধরনের হরিণ সেখানেই থাকে যেখানে পানি পাওয়া যায়।'

এই ক্ষুদ্র আবিষ্কারটি আমাদের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করল। সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, মানুষ যখন একেবারে ভেঙে পড়ে তখনও ছোট আশার আলো তাকে শক্তি জোগায়। ঘোর অন্ধকারে মাথার ওপর একটা তারা দেখলেও আমরা সাহস ফিরে পাই।

ভেন্টভোগাল জোরে জোরে শ্বাস টেনে কিছু যেন বুঝে নিতে চাইল। এক সময় সে বলল, 'কাছে পিঠে কোথাও পানি আছে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

এই সময় পুব আকাশে সুর্য উঠল এবং সেই মহাজাগতিক বিস্ময়ের দিকে তাকাতেই আমাদের মধ্যে জলের জন্য যে কাতরতা ছিল তা একেবারে উবে গেল।

পাহাড়ের যে দুটো শৃঙ্গকে লোকে 'শেবার স্তন' বলে উল্লেখ করত সেই দুটো এখন আমাদের থেকে চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ মাইল দূরে আছে। উদীয়মান সূর্যের আলোয় সেগুলো রূপার মতো চকচক করছিল। ঐ শৃঙ্গদুটোর দুপাশে কয়েকশো মাইল জুড়ে বিস্তৃত ছিল সুলিমান পর্বত। ঐ অপার্থিব সৌন্দর্য ও গরিমার বর্ণনা করার মতো উপযুক্ত ভাষা আমার জানা নেই। এই অনন্য সাধারণ দৃশ্যের স্মৃতি ধরে রাখতেও আমি অপারগ। আমাদের চোখের সামনে যে দুটো শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছিল তাদের উচ্চতা কমপক্ষে পনেরো হাজার ফুট এবং সারা আফ্রিকাতেও এদের তুলনা মিলবে না। এক শৃঙ্গ থেকে অপরটার দূরত্ব কয়েক ডজন মাইল এবং দুটোই তুষারাবৃত। আকাশচুম্বী বলতে যা বোঝায় তারা তাই।

পাহাড়ের নিচের দিকটা একেবারে গোল ও মসৃণ। তারপর দুটো পাহাড়ই স্তনবৃন্তের মতো সরু হয়ে ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে। এই কারণেই পাহাড়ের শৃঙ্গদুটোকে 'শেবার স্তন' নাম দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ের নিচের দিকটা ছায়া ও কুয়াশায় ঢাকা। এক নজরে মনে হবে যেন এক নারী হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পাহাড়-চূড়া দুটো ছিল আগ্নেয়গিরির মুখ। আগ্নেয়গিরি অনেক কাল পূর্বে ছিল; বর্তমানে মৃত, তবুও তাদের দেখলে বুক ঢিপ ঢিপ করে। এখন পাহাড়ের ওপরের দিকে সূর্যের আলো এবং নিচের দিকে কুন্ডলী পাকানো কুয়াশা। দুই মিলিয়ে পাহাড়ের একটা রূপরেখা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। কুয়াশার ভারি আচ্ছাদনের জন্য পাহাড়টাকে সম্পূর্ণভাবে কোনোদিনই দেখা যায় না। তবে আমাদের ভাগ্য ভাল থাকার জন্য আজ পরিষ্কারভাবে সেটাকে দেখতে পেলাম।

নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে আমরা এত অভিভূত হয়েছিলাম যে, শারীরিক চাহিদার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু আবার সেই দুর্নিবার পিপাসার কবলে পড়লাম।

ভেন্টভোগেল জলের ভান্ডারের টের পেয়েছে জেনে আমরা খুশি হয়েছিলাম। এবার সবাই মিলে খুব ভাল করে খুঁজে দেখতে মনস্থ করলাম। কিন্তু যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি তাপ শোষণকারী বালি আর বালি। উষ্ণ বালু রাশির মধ্যেও কীভাবে যেন এখানে ওখানে ছোট ছোট আগাছার ঝোপ জন্মেছে! আমরা সকলে এদিক ওদিক খুঁজে বেড়ালাম কিন্তু একটি তরল বিন্দুও আমাদের চোখে পড়ল না। পুকুর এমনকী, একটা জলের গর্তও আমাদের নজরে এল না।

আমি ভেন্টভোগেলকে বললাম, 'কী বোকার মতো কথা বলছ! এখানে এক ফোঁটাও পানি নেই।'

আমার কথা সে গায়ে মাখল না। নাকটা উঁচু করে সে শ্বাস টানল তারপর হেসে বলল, 'আমি কিন্তু জলের গন্ধ পাচ্ছি, বস্।'

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আকাশে মেঘের গায়ে লেগে থাকা জলের গন্ধ তুমি পাচ্ছ। মাস দুই পরে ঐ পানি এখানে নামবে এবং তখন আমাদের শরীরের হাড়গুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে দেবে।'

স্যার হেনরি তার হলুদ রংয়ের দাড়িতে চিন্তিতভাবে হাত বোলাতে বোলাতে মন্তব্য করল, 'জল তো আছেই, ঐ যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে ওর ওপরের দিকে।'

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'পাহাড়ের চূড়ায় পানি পাওয়া যায় এরকম কথা কে কবে শুনেছে!'

পিপাসার চোটে আমরা পানি খুঁজতে ঢিবির কাছে গেলাম। আমাদের আগে আগে চলছিল উমবোপা। হঠাৎ সে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। পরক্ষণেই তার চিৎকার শোনা গেল, 'জল, পানি পাওয়া গিয়েছে।'

তার কথা কানে যাওয়া মাত্রই আমরা ছুটে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। যা বলছে তা কি সত্যি? হ্যাঁ, বালির একটা গর্তে বেশ খানিকটা পানি জমে আছে। সেই জলের রঙ এতই কালো যে ছুঁতে পর্যন্ত ঘেন্না করবে। তবুও এটা তো পানি কিংবা বলা যায়, পানির মতো কিছু একটা। দেবতাদের কাছে অমৃত যেমন প্রিয় এই পানিও আমাদের কাছে সেই রকম মনে হল। আমরা তো মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আঁচলা ভরে সেই অপরিষ্কার পানি পান করে প্রভূত তৃপ্তি লাভ করলাম। একমাত্র ঈশ্বর জানেন, কীভাবে আমরা ঐ পানি খেয়ে ফেললাম। পানি পানের পর আমরা গায়ের জামা খুলে ঐ জলের ধারে বসে থাকলাম। মনের ইচ্ছা, বাতাসে যে জলকনা আছে ত্বকের সাহায্যে তা শুষে নেওয়া। এখানে বসে থাকার বিলাসিতা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে থাকার চেয়ে অনেক গুণ বেশি।

গত চব্বিশ ঘণ্টায় খাবার ইচ্ছাটাই আমাদের চলে গিয়েছিল। এবার কিছু খেতে মন চাইল। খাওয়া শেষ হলে আবার ঐ জলের ধারেই বসে থাকলাম এবং একটা পাথরের ছায়ায় শুয়ে দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিলাম।

দিনের বাকি অংশটুকুও আমরা এখানে বসে থাকলাম। জীবন রক্ষার জন্য পানি পেয়ে আমাদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম। আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা তিন শতাব্দী আগেকার সিলভেস্ট্রার কথা স্মরণ করলাম। কত সঠিকভাবে তিনি মানচিত্রটি তৈরি করেছিলেন! আশ্চর্যের বিষয় হল, তিনশত বছর আগে যেখানে পানি পাওয়া গিয়েছিল আজও সেখানে পানি পাওয়া গেল। তার মানে, মাটির তলায় নিশ্চয়ই জলের ফল্গুধারা আছে।

এখন তো পেটের মধ্যে পানি, বোতলের মধ্যে পানি। মনে আমাদের প্রচণ্ড উৎসাহ। চাঁদ ওঠার সাথে সাথে আমাদের পথ চলা শুরু হল এবং একরাতে আমরা পঁচিশ মাইল এগিয়ে গেলাম। তবে রাস্তায় আর কোথাও পানি দেখলাম না। পরের দিন সকালে একটা ঢিবির ছায়ায় আমরা বিশ্রাম নিতে বসলাম। সূর্য উঠলে কুয়াশা একেবারে কেটে গেল। সুলিমান পর্বতের ঢাল ও 'শেবার স্তন' খুব পরিষ্কারভাবে আমাদের চোখে পড়ল। আর মাত্র কুড়ি মাইল এগিয়ে যেতে পারলে আমাদের পরিশ্রম সফল হবে। সূর্য অস্তমিত হবার সাথে সাথে আমরা বেরিয়ে পড়লাম এবং পরের দিন যখন ভোরের আলো ফুটল তখন আমরা 'শেবার বাম স্তনের' ঢালু জায়গায় চলে এসেছি। আবার সেই জলের আকাল, সেই বিধ্বংসী তেষ্টা! আশেপাশে জলের কোনো চিহ্ন নেই। পাহাড়ের ওপরের দিকে পৌঁছাতে পারলে বরফ পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই স্থান তো বেশ দুর এবং যাওয়াটাও কষ্টকর। তৃষ্ণা মেটানোর তাড়নায় সূর্যের তেজ উপেক্ষা করে আমরা পাহাড়ের ওপরের দিকে উঠতে শুরু করলাম। এই পাহাড়ের সাথে অন্য পাহাড়ের তফাৎ আছে। এখানে এক কালে ছিল আগ্নেয়গিরি, পাহাড়ের ঢাল বালি কাঁকরের নয়, একেবারে লাভা দিয়ে ঢালাই করা যে লাভার উৎস ছিল আগ্নেয়গিরির বিবর।

বেলা যখন এগারোটা বাজল তখন আমাদের শরীরের সবটুকু শক্তি শেষ হয়ে এল। আমাদের যাওয়ার পথটা ছিল আগ্নেয় শিলার। অন্য শিলার চেয়ে আগ্নেয় শিলা অনেকখানি মসৃণ হলেও আমাদের পা ছড়ে গিয়েছিল এবং হাঁটতে আমাদের যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছিল। যে জায়গায় আমরা পৌঁছে ছিলাম সেখান থেকে কয়েকশো গজ দূরে লাভার একটা ঢিবি ছিল। ওখানে পৌঁছাতে পারলে ঢিবির ছায়ায় বসে রোদের উত্তাপ থেকে মাথা বাঁচাতে পারব চিন্তা করে আমরা কোনোক্রমে সেই দিকে এগোতে লাগলাম। ওখানে পৌঁছে আমরা যা দেখলাম তাতে অবাক হয়ে গেলাম। বলতে বাধা নেই, আমাদের সব ক্ষমতা হারিয়ে গেলেও অবাক হবার ক্ষমতাটুকু তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। দেখলাম, ঐ ঢিবির একটা অংশে বেশ কিছু গাছ-পালা হয়ে আছে। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। বাতাসে ধূলিকণা উড়ে এসে ওখানে জমা হয়েছে এবং গাছের বীজ এসেছে পাখির মাধ্যমে। সবুজ গাছ দেখে আমাদের তো কোনো লাভ নেই। নেবুকাডনেজারের মতো আমরা তো আর ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে পারব না। এর জন্য প্রয়োজন পড়ে বিশেষ ধরনের হজম শক্তি ও দৈবী আনুকূল্য। আমরা তো ঢিবির ছায়ায় বসলাম এবং এই প্রথমবার আমার মনে হল যে, আকাট মূর্খের মতো

এই অভিযানে এসে আমি ভুলই করেছি। সবুজ-আচ্ছাদিত জায়গাটার দিকে উমবোপাকে যেতে দেখলাম। দু-এক মিনিট পর সেই গম্ভীর ও সম্ভ্রান্ত লোকটাকে উন্মাদের মতো নাচতে দেখলাম এবং হাতে একটা গাছের ডাল নিয়ে চিৎকার করতে শুনলাম। অত্যন্ত অবসন্ন থাকলেও আমরা নিজেদের পা দুটোকে টেনে টেনে তার দিকে এগোতে লাগলাম। আমাদের সকলের মনে একটাই আশা ছিল সে হয়ত পানি দেখতে পেয়েছে।

জুলু ভাষায় আমি ধমকে উঠলাম, 'আরে গাধা, অত চেঁচাচ্ছিস কেন?'

হাতের সবুজ ডালটা নাড়িয়ে সে বলল, 'হুজুর, তাড়াতাড়ি চলে এসো, এখানে পানি ও খাবার দুটোই আছে।'

যা দেখলাম তাতে হতবাক হয়ে গেলাম। একটা বিশাল তরমুজের খেতের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। হাজার হাজার পাকা তরমুজ পড়ে আছে আমাদের হাতের নাগালে।

আমরা প্রত্যেকে প্রায় ছটা করে তরমুজ খেলাম। কী অপূর্ব স্বাদ!

তরমুজের শাঁস খেয়ে আমাদের শরীর ঠান্ডা হল বটে কিন্তু খিদে মিটল না। ক্ষুধার শান্তির জন্য চাই অন্য ধরনের শক্ত খাবার। শুকনো মাংস আমাদের সাথে থাকলেও তা খেতে ইচ্ছা করছিল না। অদূর ভবিষ্যতে যে পছন্দ মতো খাবার পাব সে সম্ভাবনাও নেই। এই সময় হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, গোটা দশেক বড় বড় পাখি আমাদের দিকে উড়ে আসছে।

হোটেনটট ভেন্টভোগেল মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে মাটিতে শুয়ে পড়ল এবং পাখিদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে বলল। আমরা সকলে তাকে অনুকরণ করলাম কিন্তু সেই সঙ্গে উইনচেস্টার বন্দুকটা হাতে ধরে রাখলাম। পাখির ঝাঁক কাছাকাছি আসতেই আমি তড়াক করে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং গুলি চালিয়ে দিলাম। দুই রাউন্ড গুলি ছুড়লাম কিন্তু একটা পাখির গায়ে তা লাগল। ঘুরতে ঘুরতে পাখিটা মাটিতে এসে পড়ল। শুকনো তরমুজ লতা দিয়ে আগুন জ্বালালাম এবং কুড়ি পাউন্ড ওজনের পাখিটাকে ঝলসে নিলাম। গত এক সপ্তাহে এত সুন্দর খাবার আমাদের কপালে জোটেনি। পুরো পাখিটা উদরস্থ করতে পেরে আমাদের সে কী আনন্দ!

সেই রাতেও চাঁদ উঠলে আমাদের যাত্রা শুরু হল। এবার আর ঝুঁকি নিলে চলবে না তাই যে যতগুলো পারলাম তরমুজ সঙ্গে নিলাম। যতই পাহাড়ের ওপরের দিকে উঠতে থাকি বাতাস ততই ঠান্ডা হতে থাকে। এতে আমাদের বেশ আরামবোধ হতে লাগল। সকাল হলে দেখলাম, আর মাত্র মাইল ছয়েক হাঁটলে আমরা তুষার রেখার কাছে পৌঁছে যাব। এই জায়গাতেও প্রচুর সংখ্যক তরমুজ দেখতে পেলাম। জলের জন্য আমাদের যে দুশ্চিন্তা ছিল এবার তা কেটে গেল কারণ সামনেই পড়ে ছিল বরফের স্তূপ। এখান থেকে খাড়া চড়াই শুরু হয়েছে বলে আমদের গতি বেশ শ্লথ হয়ে গেল। এখন আমরা ঘন্টায় এক মাইল পথ অতিক্রম করছিলাম। এক জায়গায় থেমে আমাদের সঙ্গে রাখা শুকনো মাংস খেয়ে নিলাম। এই পাহাড়ের ওপর কয়েকটি পাখি ছাড়া অন্য কোনো জীবন্ত প্রাণী আমরা দেখতে পাইনি। পাহাড়ের মাথায় তো প্রচুর বরফ রয়েছে এবং সূর্যের তাপে সেই বরফ গলে পানি হচ্ছে। তবুও আমরা কোথাও ঝরনা কিংবা জলের প্রবাহ দেখতে পাইনি। পরে অবশ্য আমরা আবিষ্কার

করেছি, কোনো এক দুর্জ্ঞেয় কারণে বরফ-গলা জলের ঝরনা পাহাড়ের উত্তর দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে।

খাবার নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল। হয়ত অনাহারে মরতে হবে বলেই আমরা তৃষ্ণায় মারা যাইনি। পরবর্তী তিনটা দিন কীভাবে কেটেছে তা আমি একটা খাতায় লিখে রেখেছিলাম। যা লিখেছিলাম তা হল–

'তারিখ ২১ মে, সময় সকাল এগারোটা, আবহাওয়া এত ঠান্ডা যে হাঁটা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় ঘাড়ে করে তরমুজ বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবুও আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সারা দিনের মধ্যে আমরা না পেলাম একটা তরমুজ, না পেলাম কোনো শিকার। সূর্য অস্ত গেলে আমরা বিশ্রাম নিতে বসলাম। বিগত বেশ কয়েক ঘণ্টায় আমাদের পেটে কিছুই পড়েনি। রাতের বেলায় কী অসহনীয় ঠান্ডা! মনে হচ্ছে আমরা জমে যাব।

'তারিখ ২২ মে, সকাল হল, আর আমাদের হাঁটাও শুরু হল। দুর্বলতার জন্য পা আর চলছে না। দিনের শেষে দেখলাম পাঁচ মাইল পথ হেঁটেছি। বরফের টুকরো পাওয়া গেল। তাই খেয়ে পেট ভরালাম। খানিকটা সমতল জায়গা দেখতে পেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমরা এত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত যে চোখ খুলতে পারছি না। ভেন্টভোগেলকে দেখে মনে হল ও আর জীবিত নেই, গত রাতেই মারা গিয়েছে।

'তারিখ ২৩ মে, সকালের সূর্যের উত্তাপে আমরা বেশ আরামবোধ করলাম। আর দেরি না করে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। এটা ঠিক, যদি আজ খাবার কিছু না জোটে তাহলে আজই আমাদের জীবনের অন্তিম দিন। বোতলে একটুখানি ব্র্যান্ডি পড়েছিল। হোটেনটট সম্প্রদায়ের লোকেরা ঠান্ডা একবারেই সহ্য করতে পারে না। তাই আমরা চারজন এক ফোঁটাও ব্র্যান্ডি মুখে দিলাম না। ভেন্টভোগেলের শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে অ্যান্ডির বোতল ওর জন্যই রেখে দেওয়া হল। খিদে পেলে প্রথমে পেটে যন্ত্রণা হয়। পরে পেটে একটা অবশ ভাব আসে। আমাদের পায়ের তলায় লাভার তৈরি মসৃণ পাহাড়ি পথ, পিছনে দিগন্ত প্রসারী মরু প্রান্তর এবং আমাদের সামনে মাইলের পর মাইল শক্ত বরফের আচ্ছাদন এবং চার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়া। কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। আমাদের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে বলেই মনে হল।'

খাতায় যা লিখেছি তা পড়তে ভাল লাগবে না বলে এটা বন্ধ করে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিই।

ঐ দিন অর্থাৎ ২৩ মে তারিখে আমরা ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। চোখ ধাঁধানো শুভ্র তুষারের মধ্য দিয়ে আমরা কয়েকটি প্রাণী কোনোরকমে পা টেনে টেনে চলছিলাম কিন্তু ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে আমরা খুঁজছিলাম খাবারের কণা। কিন্তু না সামনে, না ডাইনে, না বামে তার চিহ্নটুকুও ছিল না। সারা দিন পরিশ্রম করে আমরা সাত মাইল এগোতে পারলাম। সূর্য যখন অস্তমিত তখন আমরা 'শেবার বাম স্তনের' ঠিক তলায় এসে পৌছলাম। জমাট বাঁধা বরফে ঢাকা ঐ শৃঙ্গ আকাশ ফুঁড়ে কয়েক হাজার ফুট উঁচুতে উঠে গিয়েছে। সূর্যাস্তের আলো যেখানে পড়েছে সেই জায়গাগুলো রক্তের মতো লাল। পাহাড়ের সাদা চূড়াকে মনে হচ্ছিল একটা হিরার মুকুট কিন্তু খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করলে কি নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়?

ক্যাপ্টেন গুড কোনোরকমে বলল, 'সিলভেস্ট্রার বিবরণ অনুযায়ী আমরা কিন্তু গুহার কাছাকাছি এসে পড়েছি।'

আমি ব্যঙ্গ করে বললাম, 'গুহার অস্তিত্ব থাকলে তবে তো কাছাকাছির প্রশ্ন।'

স্যার হেনরি আমার কথায় মর্মাহত হয়ে বলল, 'ওভাবে তোমার কথা বলা উচিত নয়, কোয়ার্টারমেইন। সিলভেস্ট্রার বিবরণ একেবারে সঠিক। ঐ তো দেখলে না, জলের বেলায়! চেষ্টা করলে গুহাটাও আমরা বের করে ফেলব।'

এরপর আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চুপচাপ আরো দশ মিনিট আমরা হাঁটলাম, উমবোপা আমার পাশে পাশে হাঁটছিল। কম্বল দিয়ে সারা শরীরটা সে ঢেকে নিয়েছিল এবং খিদে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য পেটে একটা বেল্ট বেঁধে নিয়েছিল। যেতে যেতে হঠাৎ সে আমার হাত ধরে টান মেরে বলল, 'ঐ দেখ।'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম চারদিক বরফে ঢাকা থাকলেও একটা জায়গাতে বরফ নেই এবং সেটা একটা বড় গর্তের মতো। গর্তের মুখে পৌছাতে হলে আমাদের আরো দুশো গজ হাঁটতে হবে।

যতদুর সম্ভব আমরা তাড়াতাড়ি সেই গর্তের মুখের কাছে পৌছলাম। হ্যাঁ, এটা তো গুহার মুখ। সিলভেস্ট্রা তাহলে তো ঠিক কথাই লিখে গিয়েছে। তবে গুহার কাছে পৌছাতে না পৌছাতেই সূর্য অস্ত গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার নেমে এল। এইসব অঞ্চলে গোধূলি বলে কোনো সময় হয় না। দেরি না করে আমরা গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এখানে থাকলে ঠান্ডার হাত থেকে খানিকটা তো রেহাই পাওয়া যাবে। যেটুকু মদ বেঁচেছিল আমরা সকলে তা ভাগ করে খেলাম। এখন যদি ঘুম এসে যায় তাহলে শারীরিক কষ্ট আমরা ভুলতে পারব। কিন্তু গুহার ভিতরেও এত ঠান্ডা যে ঘুম এল না। আমার মনে হয়, তাপমাত্রা শূন্যের চেয়ে পনেরো ডিগ্রী নিচে ছিল। যে মানুষগুলি পথশ্রমে দুর্বল, অনাহার ও মরুভূমির উত্তাপে কাতর ও শক্তিহীন তাদের কাছে এই তাপমান যে কতখানি যন্ত্রণাদায়ক তা বোঝাবার ভাষা আমার নেই। মৃত্যু সন্নিকটে এলে মানুষের যে অবস্থা হয় আমাদের তাই হল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা বসেই থাকলাম। বাইরের হিমেল হাওয়া ভিতরে ঢুকে কখনো আমাদের হাতের আঙ্গুলে, কখনো পায়ে আবার কখনো মুখে কামড় দিতে লাগল। ঘেষাঘেষি করে বসেও কোনো লাভ হল না। কিছুতেই আমাদের শরীর গরম হচ্ছিল না। তারই মধ্যে দু'এক মিনিটের জন্য আমাদের চোখে ঘুম এসে যাচ্ছিল। তবে এই নিয়ে ভাগ্যের বিরুদ্ধে আমার কোনো অনুযোগ নেই। যদি আমরা গভীর ঘুমে ঢলে পড়তাম তাহলে সেই ঘুম ভাঙবার সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না।

সারাটা রাত ভেন্টভোগেলের এত শীত করছিল যে তার দুপাটি দাঁত একটা বিশেষ ছন্দে ঠকঠক করে বাজছিল। ভোরের দিকে খুব জোরে সে একটা শ্বাস ফেলল এবং তার দাঁতের আওয়াজ বন্ধ হল। ভাবলাম, এবার হয়ত তার ঘুম এসেছে। সে এবং আমি পিঠে পিঠ লাগিয়ে পাশাপাশি শুয়েছিলাম। এক সময় মনে হল, তার পিঠ ঠান্ডা এবং আরো একটু পরে তার পিঠটা একেবারে বরফের মতো ঠান্ডা মনে হল।

ক্রমে অন্ধকার কেটে যেতে লাগল এবং সূর্যের সোনালি রশ্মি জমাট বাঁধা বরফ ও লাভার ওপর ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আমাদের গুহার ভিতরের সব কিছু পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল। এই আলোয় যা দেখলাম তাতে আমাদের সকলের মন ভেঙে গেল।

দেখলাম, শীত আটকাবার জন্য ভেন্টভোগেল হাত দিয়ে নিজের হাঁটুদুটোকে জড়িয়ে ধরেছে এবং সেই অবস্থায় সে জীবনের পরপারে চলে গিয়েছে। মৃতদেহের সাথে কি জীবিত মানুষ থাকতে পারে, তা সে যতই আপনজন হোক না কেন? হোটেনটট ভেন্টভোগেলের মৃতদেহকে ঐ অবস্থায় রেখে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ঐ স্থান পরিত্যাগ করলাম। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কী অসাধারণ দূরত্ব! মৃত ব্যক্তির সান্নিধ্য জীবিত প্রিয়জনেরাও চায় না।

ধীরে ধীরে আমাদের গুহার মুখে সূর্যের কিরণ এসে পৌছাল। সেই কিরণে কোনো উত্তাপ ছিল না। হঠাৎ আমি এক জনের ভীতিসূচক চিৎকার শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকালাম।

দেখলাম, ফুট কুড়ি দূরে একটা মনুষ্যমূর্তি বসে আছে। তার মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েছে এবং লম্বা হাত দুটো ঝুলে রয়েছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম ওটা একটা মৃত মানুষের দেহ; জীবদ্দশায় মানুষটা শ্বেতকায় ছিল।

ভেন্টভোগেল আমাদের চিরতরে ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে আমরা বেশ ভেঙে পড়েছিলাম। দ্বিতীয় মৃতদেহ দেখার পর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবার মতো মনের জোর আমাদের ছিল না। এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে আমরা ঐ স্থান পরিত্যাগ করলাম।

৭
সলোমনের রাজপথ

গুহা ছাড়িয়ে একটু দূরে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম, পর পর এ রকম দুটো ঘটনায় আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। স্যার হেনরি জানাল সে আবার গুহাতে ফিরে যাবে। তার এই ধরনের সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চাইলে সে উত্তর দিল, 'যে শ্বেতকায় লোকটিকে মৃত অবস্থায় দেখলাম সেই বোধ হয় আমার ভাই।'

গোটা রাত আমরা পুরোপুরি অন্ধকার একটা গুহাতে ছিলাম। বাইরে বের হবার পরেই আমাদের চোখে উজ্জ্বল দিনের আলো পড়েছিল বলে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল এবং পরিষ্কারভাবে কোনো জিনিসকে আমরা চিনতে পারিনি। স্যার হেনরির কথায় রাজি হয়ে আমরা ঐ মৃত লোকটির কাছে ফিরে এলাম।

স্যার হেনরি ঝুঁকে পড়ে মৃতদেহের মুখটি ভালভাবে পরীক্ষা করে মন্তব্য করল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই লোকটি আমার ভাই নয়।'

এবার আমি কাছে গিয়ে দেখতে শুরু করলাম। লোকটি ছিল মাঝবয়সি, লম্বা, মাথায় কোঁচকানো চুল, মুখে লম্বা কালো গোঁফ, গায়ের রঙ হলুদ এবং শরীরে এতটুকু মেদ নেই। তার ঘাড় ও গলা প্রচণ্ড শক্ত ও বাঁকা, সেখানে ঝুলছে লোহার তারে বাঁধা হাতির দাঁতের একটা ক্রুশ।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'এই লোকটি যদি তোমার ভাই না হয়, তাহলে কে হতে পারে?'

ক্যাপ্টেন গুড পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুমি অনুমান করতে পারছ না?'

ঘাড় নেড়ে আমি না বলায় সে বলল, 'এই শ্বেতকায় ব্যক্তিটি হল ডম, হোসে ডা সিলভেস্ট্রা।'

বিস্ময় প্রকাশ করে আমি বললাম, 'সে তো মারা গিয়েছে তিন শতাব্দী পূর্বে।'

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'তিনশো না, তিন হাজার বছর আগে মারা গিয়েছে, সেটা বড় কথা নয়। নিউজিল্যান্ডে মাংস কেটে রেখে দাও না, তা কখনো খারাপ হবে না। কোনো স্থানের তাপমাত্রা যদি উল্লেখযোগ্যভাবে কম থাকে তাহলে কোনো মৃত প্রাণী পচবে না। এখানে যে কত ঠান্ডা তা তুমি নিজেই অনুভব করতে পেরেছ। সূর্যের আলো এই জায়গা পর্যন্ত পৌছাতে পারে না। তাছাড়া, এখানে অন্য কোনো প্রাণী বা জন্তুও নেই যে মৃতদেহকে স্পর্শ করবে। এই লোকটির লেখা চিরকূট থেকে জানা যায় তার সঙ্গে একজন চাকরও ছিল। শ্বেতকায় লোকটি মারা গেলে সে তার জামা কাপড়গুলো নিয়ে পালিয়ে যায়। হয়ত মৃতদেহকে কবর দেওয়ার মতো শক্তি তার

একার ছিল না। মৃতদেহের পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা ছোট হাড় কুড়িয়ে নিয়ে সে বলল, 'দেখ, এই হাড়টার মাথার দিকটা চেরা, কেন? এটা ছিল তার কলমের নিব। এর সাহায্যেই সে চিঠি লিখেছে, এবং যে মানচিত্রটি আমাদের কাছে আছে সেটি এঁকেছে।'

আমাদের নিজেদের দৈহিক কষ্ট যন্ত্রণার কথা ভুলে অবাক হয়ে সেই হাড়টির দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমরা সকলে।

মৃতদেহের বাঁ হাতে একটা ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে স্যার হেনরি বলল, 'এটি হচ্ছে সিলভেস্ট্রার কলমের কালির উৎস। শরীরের রক্তকে কালি হিসাবে ব্যবহার করে সে মানচিত্র এঁকেছে ও বিবরণ লিখেছে।'

এই কথা শোনার পর আমার মন বেদনার্ত হয়ে উঠল। যার নিষ্প্রাণ দেহ এখানে বসানো আছে সেই লোকটি দশ পুরুষ আগে এই অঞ্চলে এসেছিল। এর নির্দেশিকা অনুসরণ করেই আমরা এখানে আসতে পেরেছি। এই হাড়ের টুকরো তো আদিম যুগের নিদর্শন নয়। এটা হল, রহস্য উন্মোচনের চাবিকাঠি। তার গলায় যে ক্রুশচিহ্নটি ঝুলছে মৃত্যুর পূর্বে পরম শ্রদ্ধায় সেটিকে সে চুম্বন করেছিল বলে আমাদের কাছেও তা আদরনীয়। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কল্পনায় আমি নাটকের শেষ দৃশ্যটা দেখতে পেলাম। এক অভিযানপ্রেমী লোক ক্ষুধায় কাতর ও শীতে মৃতপ্রায় হয়েও যে রহস্য সে উন্মোচিত করেছিল তা পৃথিবীকে জানিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর পূর্বে তার কী অসহনীয় একাকীত্ব! সেই সব কিছুর সাক্ষ্য তো তার মৃতদেহ যা নির্জন তুষারাবৃত অঞ্চলে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। কুড়ি বছর আগে যে লোকটি আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল তার চেহারার সাথে এই লোকটির শারীরিক আকৃতির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বিরূপ ভাগ্যের সাথে লড়াই করে যে সব লোক অজানাকে জানতে চায় এ যেন তাদেরই প্রতীক হয়ে আমাদের চোখের সামনে বসে আছে। মৃত্যু তার কৃতিত্বকে ম্লান করতে পারেনি। তার মহিমা দেখে আমরা যেমন বিস্মিত হয়েছি কয়েক শতাব্দী পরেও মানুষ সেই রকম আশ্চর্য ও অনুপ্রাণিত হবে। তার পরিণতি দেখে আমরাও বিচলিত বোধ করলাম। আমরাও ক্ষুধায় কাতর ও শীতে মৃতপ্রায়। আমরাও কি তাহলে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি!

স্যার হেনরি বলল, 'চল, এবার যাওয়া যাক। তবে যাওয়ার আগে একটা কাজ করে যাই। এই শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির জন্য একজন সাথী রেখে দিয়ে যাই।' এই কথা বলে হোটেনটট ভেন্টভোগেলের মৃতদেহটি তুলে এনে অন্য মৃতদেহের পাশে বসিয়ে দিল। তারপর সিলভেস্ট্রার মৃতদেহের গলা থেকে হাতির দাঁতের তৈরি ক্রুশ চিহ্নটি টান মেরে ছিঁড়ে নিল কারণ ঠাণ্ডায় তার হাতের আঙুলগুলো এমন জমে গিয়েছিল যে লোহার তারের গিঁট খোলা সম্ভব ছিল না। আমার ধারণা, ঐ পবিত্র ক্রুশটি এখনও তার কাছেই আছে। হাড়ের নিবটি যা দিয়ে হোসে ডা সিলভেস্ট্রা লিখত সেটা আমি নিলাম। সেই নিব দিয়ে আমি মাঝে মাঝে নিজের নাম সই করে থাকি।

চিরন্তন বরফের দেশে বসে অনন্তকাল ধরে পাহারা দেওয়ার জন্য একজন শ্বেতাঙ্গ ও একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে গুহার মধ্যে রেখে আমরা সেখান থেকে বিদায় নিলাম।

আধ মাইল হাঁটবার পর আমরা মালভূমির কিনারায় এসে পৌঁছলাম। যখন আমরা মরুভূমিতে ছিলাম তখন মনে হয়েছিল শেবার একটা শৃঙ্গ মালভূমির ঠিক কেন্দ্রস্থল

থেকে ওপরে উঠে গিয়েছে কিন্তু এখানে এসে আমাদের ধারণা বদলে গেল আমাদের আশেপাশে মহা তরঙ্গময় কুয়াশা থাকার জন্য কোনো কিছুই আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না। একটু বেলা বাড়তে কুয়াশার ওপর দিকের স্তরটা পাতলা হয়ে গেল এবং পাঁচশো ফুট নিচে সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা অঞ্চল আমরা দেখতে পেলাম। তার পাশেই ছিল একটা সরু রূপালি নদী। এখানেই শেষ নয়, নদীর তীরে রোদ পোহাচ্ছিল দশ থেকে পনেরোটা হরিণের একটা পাল তবে হরিণগুলো যে কী জাতের ছিল তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

দৃশ্যটা চোখে পড়তেই আমাদের মন আনন্দে নেচে উঠল। তবে এই আনন্দ একেবারে যুক্তিহীন। আমাদের পেটে খিদে আছে, কাছেই খাদ্য আছে কিন্তু সেই খাদ্য সহজলভ্য নয়। হরিণগুলো ছয়শো গজের বেশি দূরত্বে রয়েছে। অত দূর থেকে গুলি ছুড়লে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনাই বেশি।

আত্মগোপন করে এগিয়ে গেলে কেমন হয়? আলোচনা করে দেখলাম তা সম্ভব নয় দুটো কারণে। এক, হাওয়া আমাদের প্রতিকূলে বইছে। দুই, ওখানে যেতে হলে সাদা পাহাড়ের গা ঘেঁষে যেতে হবে এবং সাদা পশ্চাৎপটের জন্য হরিণরা খুব সহজেই আমাদের দেখে ফেলবে।

স্যার হেনরির অভিমত, আমরা যেখানে আছি সেখানে দাঁড়িয়েই গুলি ছুড়ব। আমাদের সাথে দুটো উইনচেষ্টার ছিল। একটা আগে ছিল ভেন্টভোগেলের কাছে, অন্যটা উমবোপার কাছে। এখন অবশ্য দুটোই উমবোপার জিম্মায়। উইনচেষ্টার দিয়ে হাজার গজ দূরের বস্তুকে নিশানা করা যায়। বাকি যে বন্দুকগুলো আছে তাদের সীমানা সাড়ে তিনশো গজ অবধি। এই বন্দুকের গুলি যদি শিকারের গায়ে লাগে তাকে ধরাশায়ী হতেই হবে। এর গুলি একেবারে প্রাণঘাতী। সমস্যাটা খুবই জটিল কিন্তু আমি ঠিক করলাম, দ্বিতীয় প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র অর্থাৎ 'এক্সপ্রেস' বন্দুকই' ব্যবহার করব।

আমি বললাম, 'আমাদের নিজের নিজের ঠিক বিপরীতে যে হরিণটি আছে তাকেই লক্ষ্য করে গুলি চালাতে হবে এবং সকলে একসাথে চালাবে।'

যে কাজের ওপর মানুষের নিজের জীবন নির্ভর করে সেই কাজের প্রতি তার নিষ্ঠার অভাব থাকে না। বন্দুক হাতে নিয়ে আমরা সকলে নির্দিষ্ট মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

জুলু ভাষায় উমবোপা 'ফায়ার' কথাটি উচ্চারণ করার সাথে সাথে তিনটা রাইফেল গর্জে উঠল এবং তিনটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল। তিনটা আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে একশোটা আওয়াজে পরিণত হয়ে মৌন তুষারের ওপর দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী অপসারিত হলে দেখলাম একটা হরিণ আকাশের দিকে মুখ তুলে মাটিতে পড়ে আছে এবং মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থিরভাবে পা ছুড়ছে। বিজয়ের আনন্দে, খাদ্য প্রাপ্তির আনন্দে আমরা চিৎকার করে উঠলাম। আমাদের শরীরে শক্তি বলে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তবুও পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আমরা নিচে গেলাম এবং দশ মিনিটের মধ্যে হরিণের মেটে, কলজে ও মাংস আমাদের সামনে এসে গেল। এবার এল এক নতুন সমস্যা। আগুন নেই, নেই কোনো শুকনো লতা পাতা যা দিয়ে আগুন জ্বালানো যায় এবং মাংস ঝলসে নেওয়া যায়। হতাশ হয়ে আমরা একে অন্যের মুখের পানে তাকিয়ে থাকলাম।

সমস্যার সমাধান করল ক্যাপ্টেন গুড। সে বলল, 'উপোসী লোকদের বিলাসী হলে চলে না। আমরা কাঁচা মাংসই খাব।'

এই প্রস্তাব অন্য সময় শুনলে বিস্বাদ লাগত। এখন মনে হল, কাঁচা হলেও টাটকা মাংস খেতে বিস্বাদ লাগবে না। হরিণের মাংসকে ঠাণ্ডা করে নেবার জন্য সেটাকে আমরা বরফের মধ্যে কয়েক মিনিট ঢুকিয়ে রাখলাম। বরফ থেকে বের করে নদীর জলে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে আগ্রহভরে সেই মাংস খেয়ে নিলাম। সত্যি বলতে কী, কাঁচা মাংসের চেয়ে সুস্বাদু বোধ হয় আর কোনো খাদ্য নেই। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমাদের শরীরে অনেক পরিবর্তন এল– নতুন শক্তি, নতুন উদ্যম। আমাদের নাড়ির গতি বেড়ে গেল এবং শিরা উপশিরায় রক্তের প্রবাহ বইতে শুরু করল। খিদের মুখে মাত্রাতিরিক্ত ভোজন করা যে ক্ষতিকর তা মনে রেখে আমরা আহার সাঙ্গ করলাম।

হরিণটা কী জাতের তা জানবার জন্য সেটার ছাল পরীক্ষা করলাম। হরিণ তো নয়, যেন একটা গাধা, তফাৎ কেবল মাথায় খুব সুন্দর ঢেউ খেলানো এক জোড়া শিং। আমি এতবার শিকারে গিয়েছি কিন্তু এরকম সুন্দর হরিণ আমার চোখে পড়েনি। হরিণের সারা শরীরটা বাদামি রঙের এবং তার ওপর হালকা লাল রঙের লম্বা লম্বা দাগ, পরে শুনেছিলাম, স্থানীয় আদিবাসীরা একে 'ইনকো' বলে। এরা হল খুব বিরল জাতির প্রাণী এবং সমুদ্রতল থেকে অনেক বেশি উচ্চতায় এরা বাস করে; এমন উচ্চতা যেখানে অন্য কোনো শিকার পাওয়া যায় না। ঘাড়ে গুলি লেগে হরিণটা মারা গিয়েছিল কিন্তু কার গুলিতে সে মারা গেল সেটা সন্দেহাতীতভাবে জানা সম্ভব হল না। এর আগে গুডের গুলি একটা জিরাফের ঘাড়ে লেগেছিল। তারই ভিত্তিতে হরিণ মারার কৃতিত্ব তারই বলে সে দাবি করল। আমরা অবশ্য তার বক্তব্যের বিরোধিতা করলাম না।

খিদের জ্বালা মেটানোর কাজে আমরা এত ব্যস্ত ছিলাম যে আশেপাশে কী আছে তা দেখা হয়ে ওঠেনি। খাওয়া শেষ হলে উমবোপাকে বললাম মৃত হরিণের শরীর থেকে সব মাংস ছাড়িয়ে নিতে। পথ চলতে হলে খাদ্য তো প্রয়োজন। এবার চারপাশটা দেখে নেবার জন্য আমরা প্রস্তুত হলাম। বেলা আটটা বাজে, কুয়াশার আবরণ এখন আর নেই বললেই চলে। এক লহমায় প্রকৃতির অসাধারণ সৌন্দর্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। প্রকৃতি যে এত মনোরম তা আগে কখনো দেখিনি এবং ভবিষ্যতেও হয়ত দেখব না।

এই মুহূর্তে আমাদের মাথার ওপর ও পিছনে রয়েছে তুষারাবৃত 'শেবার স্তনযুগল।' হাজার পাঁচেক ফুট নিচে রূপালি ফিতের মতো বয়ে চলেছে একটা নদী। নদীর তীরে রয়েছে ঘন জঙ্গল। দেখতে না পেলেও অনুমান করতে কষ্ট হচ্ছিল না যে ঐ জঙ্গলে প্রচুর শিকার আছে। জঙ্গলের শেষে ভাল করে তাকালে কিছু বাড়ি ঘর ও চাষ করা জমির অস্তিত্বও বোঝা যায়। বিস্তীর্ণ এই এলাকাটা গোল করে পাহাড় দিয়ে ঘেরা।

দুটো বিষয় আমাদের চিন্তিত করে তুলল। এক, মরুভূমি থেকে ঐ গ্রামের উচ্চতা কমপক্ষে তিন হাজার ফুট। দুই, নদীগুলো দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে বইছে। আমরা দক্ষিণ দিক থেকে এসেছিলাম বলে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ওদিকে পানি একেবারে নেই। উত্তরদিকে কিন্তু প্রচুর ছোট নদী ও জলধারা আছে যেগুলো বেশ কয়েক মাইল দূরে মিলিত হয়ে একটা বড় নদীর সৃষ্টি করে ঐ অঞ্চলকে শ্যামল করে দিয়েছে।

চুপচাপ ওখানে বসে অপরূপ শোভামণ্ডিত প্রকৃতিকে অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করলাম। এক সময় স্যার হেনরি বলল, 'আচ্ছা, মানচিত্রে কি সলোমনের রাজপথ বলে কোনো কিছুর উল্লেখ আছে?'

কোনো উত্তর না দিয়ে আমরা দূরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। স্যার হেনরি তখন আমাদের ডান দিকে চোখ ফেরাতে বলল। দেখলাম একটা বিরাট চওড়া রাস্তা পাহাড় থেকে নেমে ঐ গ্রামের কাছে হারিয়ে গিয়েছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কিছু বিস্ময়কর দৃশ্য ও ঘটনা দেখে আমাদের অবাক হবার বোধটাই চলে গিয়েছিল। ঐ দুর্গম প্রদেশে আমরা যদি রোমানদের তৈরি একটা রাস্তা দেখতাম তাহলেও সেটাকে অস্বাভাবিক মনে করতাম না।

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'ডান দিক দিয়ে গেলে রাস্তাটা কিন্তু খুব দূরে হবে না। চল, ওখানেই যাই।'

প্রস্তাবটি উত্তম বলেই মনে হল। নদীর জলে হাত মুখ ধুয়ে আমরা ঐ রাস্তা আবিষ্কারের জন্য পা বাড়ালাম। বড় বড় পাথর ও তারই মাঝে বরফের পুরু আস্তরণ পার হয়ে আমরা এমন একটা জায়গায় পৌছলাম যেখান থেকে ঠিক পায়ের তলায় রাস্তাটা দেখা যায়। পাহাড়ের গা কেটে কেটে রাস্তাটা বানানো হয়েছে যা পঞ্চাশ ফুট চওড়া। একটুখানি হেঁটে আমরা রাস্তায় নেমে দাঁড়ালাম। ওখান থেকে পিছনের দিকে একশো পা পিছিয়ে যাওয়ার পর রাস্তাটা শেবার শৃঙ্গের দিকে চলে গিয়েছে। মনে হল, রাস্তাটা ওখান থেকেই শুরু হয়েছে।

স্যার হেনরি প্রশ্ন করল, 'এর থেকে কী বোঝা যাচ্ছে কোয়ার্টারমেইন?'

'কোনো কিছুই আমার বোধগম্য হচ্ছে না,' সেই কথা মাথা নেড়ে জানালাম।

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'আমি কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি। রাস্তাটা মরুভূমির দিক থেকে এসে এই পাহাড়ি অঞ্চল অতিক্রম করে সবুজে ঘেরা ঐ লোকালয়ের অভিমুখে চলে গিয়েছে। মরুভূমির ওপর দিয়ে আসা রাস্তাটা বালিতে ঢেকে গিয়েছে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে রাস্তার অংশ আগ্নেয়গিরির লাভায় চাপা পড়েছে বলে সেটুকু আর দেখা যাচ্ছে না।'

তার ধারণার পিছনে যুক্তি আছে মনে হল। রাস্তাটা ধরে লোকালয়ের দিকে আমরা নামতে শুরু করলাম। মরুভূমির দিক থেকে আমরা যখন উঠেছিলাম তখন এক ধরনের কষ্ট ছিল– আমাদের পেট ছিল খালি, রাস্তা ছিল বরফে ঢাকা এবং শরীর জমে গিয়েছিল ঠান্ডায়। এখন আরেক ধরনের কষ্ট– পেট পুরো ভর্তি, রাস্তা মসৃণ এবং আমরা নিচের দিকে নামছি। এত প্রফুল্লতার মধ্যেও আমাদের মনে বিষণ্নতার একটা রেশ ছিল। আজ সাথে নেই বন্ধু ভেন্টভোগেল। সে পাশে থাকলে অজানা অনেক বিপদকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারতাম। সুন্দর রাস্তা ধরে আমরা যত এগোতে থাকলাম প্রকৃতিকে ততই যেন বিচিত্র ও মনোরম মনে হতে লাগল। পরিবেশও যেন সুখদায়ক ও অনুকূল হয়ে যেতে লাগল। অতি প্রাচীনকালে এত চমৎকার রাস্তা মানুষ তৈরি করল কীভাবে! বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কতখানি সমৃদ্ধ হলে তবে মরুভূমি ও বরফাবৃত পাহাড়ের ওপর রাস্তা বানানো যায়। স্যার হেনরি বলল সুইজারল্যাণ্ডে সেন্ট গোথার্ড নামক প্রদেশে এই ধরনের রাস্তা দেখা যায়। ক্রমে আমরা এমন একটা জায়গায় পৌছলাম যেখানে নদীটা তিনশো ফুট চওড়া এবং একশো ফুট গভীর হবে।

মসৃণ করে কাটা পাথর ফেলে নদীর ওপর একটা সেতু তৈরি করা হয়েছে। সেতুর তলা দিয়ে নদীর পানি যাতে বয়ে যেতে পারে সেরকম ব্যবস্থাও আছে। কোথাও হয়ত পাহাড় এতটাই খাড়া যে সর্পিল ভঙ্গিতে রাস্তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। আবার কোথাও সুড়ঙ্গ কেটে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে রাস্তা টানা হয়েছে।

সুড়ঙ্গের দেওয়ালে বেশ কিছু ছবি খোদাই করা ছিল। কয়েকটা ছবির বিষয়বস্তু ছিল যুদ্ধক্ষেত্র– সশস্ত্র সৈনিকরা রথে চড়ে যাচ্ছে এবং দূরে বন্দীদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এইরকম একটা ছবি খুব ভাল করে পরীক্ষা করে স্যার হেনরি বলল, 'এটা অতি পুরনো ছবি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই রাস্তাকে যে 'সলোমনের রাজপথ' বলা হয় তা যথার্থ। তবে আমার ধারণা, সলোমনের লোকজন এখানে আসার অনেক আগেই ইজিপ্টের লোকেরা এখানে এসেছিল। এই ছবিগুলোর সাথে ইজিপ্টের শিল্পকলার যথেষ্ট মিল আছে।'

নামতে নামতে দুপুরের আগেই আমরা এমন একটা জায়গায় পৌছলাম যেখানে কাঠ পাওয়া যাচ্ছিল। এখানে ওখানে আমরা বেশ কিছু ঝোপঝাড় দেখতে পেলাম তবে বড় গাছ ছিল না। আরো কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে আমরা এমন কিছু গাছ দেখলাম যাদের কাণ্ড একেবারে রূপালি রঙের। আমার ভবঘুরে জীবনে এই গাছ কেপ টাউনের সমতল পাহাড়ি অঞ্চলেই কেবল দেখেছি। দ্বিতীয়বার সেই গাছকে এই দুর্গম অঞ্চলে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

চকচকে পাতার গাছগুলোকে বেশ আগ্রহ সহকারে দেখে ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'হরিণের মাংস তো কতকাল আগে হজম হয়ে গিয়েছে। এখানে কাঠ পাওয়া যাচ্ছে। আগুন জ্বালাতে কোনো অসুবিধা নেই। এবার আর কাঁচা মাংস নয়, রান্না করা মাংস খেতে হবে।'

তার আব্দারে কে আর আপত্তি করবে? রাস্তা থেকে নেমে আমরা নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং পরিষ্কার একটা জায়গা দেখে আগুন জ্বালালাম। যে 'ইনকো' বা হরিণটাকে আমরা মেরেছিলাম তার মাংস তো একটা থলিতে রাখা ছিল। শক্ত লাঠির মাথায় মাংসের টুকরো লাগিয়ে আমরা সেঁকে নিলাম। তারপর আয়েশ করে সেই সুখাদ্য খেতে লাগলাম। কাফেররা এইভাবে মাংস পুড়িয়ে খায়, আগে দেখেছি। খাওয়া শেষ করে আরাম করে ধূমপান করলাম। এ যাবৎ যা কষ্ট করেছি তার তুলনায় এই মুহূর্তের আরামকে রাজকীয় বিলাসিতা বললে অত্যুক্তি হয় না।

নদীর তীরে কোথাও ছিল ঘন ঝোপ আবার কোথাও ছিল বড় বড় গাছ। গাছের ডালে ডালে ঘুঘু ডাকছিল আবার কোনো গাছে মাছরাঙা পাখির দল বসেছিল। পাখির ডাক ও নদীর কুলকুল শব্দ বনানীর নির্জনতাকে স্বর্গীয় আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিল।

পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির দুঃস্বপ্ন, আগামী সুদিনের সম্ভাবনা এবং স্নিগ্ধ নদী তীরের মন ভরানো সৌন্দর্য এমন এক মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি করল যে আমরা কেউ আর কথা বলতে পারলাম না। স্যার হেনরি ও উমবোপা নিজেদের মধ্যে ইংরেজি ও ভাঙা জুলু ভাষায় খুব নিচু স্বরে কথা বলতে লাগল। আমি ওদিকে চোখ বুজে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ ধরে ক্যাপ্টেন গুডকে দেখা যাচ্ছিল না। উদ্বিগ্ন হয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই নদীর পাড়ে তাকে বসে থাকতে দেখলাম। জামা কাপড়, মাথার চুল, পায়ের জুতা নিয়ে তার বাতিক আছে। ইতিমধ্যেই নদীর জলে সে স্নান করে নিয়েছে, জামা কাপড় ধুয়ে নিয়েছে এবং তা শুকনোও হয়ে গিয়েছে। ভাঁজ করতে করতে জামা-কাপড়ে কয়েকটা ফুটো তার চোখে পড়ল। আমরা যেভাবে পথ চলেছি তাতে জামা কাপড়ের বেহাল অবস্থা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এরপর পায়ের জুতার ওপর তার নজর পড়ল। তার মনে হল, বুট জুতা দুটো একবার পালিশ না করলেই নয়। কিন্তু বুট পালিশ পাওয়া যাবে কোথায়? সমাধানটাও তার জানা আছে। মরা হরিণের খানিকটা চর্বি প্রথমে সে জুতাতে মাখিয়ে নিল। তারপর কিছু ঘাস ও গাছের পাতা জোগাড় করে সেগুলো দিয়ে চর্বিটা ভাল করে রগড়াতে লাগল। এতে কিছুটা হলেও জুতা চকচকে হল। চোখে চশমা লাগিয়ে জুতার ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তন দেখে সে খুশি হল। এবার পড়ল মাথার চুল নিয়ে। হাত ব্যাগ থেকে খুব ছোট আয়না লাগানো একটা পকেট চিরুনি বের করে চুলের অবস্থা দেখে নিল। চুলের যা অবস্থা তাতে সে মোটেই খুশি হল না; অনেকক্ষণ ধরে চিরুনি চালিয়ে অবাধ্য চুলকে আয়ত্তে আনল। ছোট আয়নায় আরেকবার মুখ দেখে সে হতাশ হল। প্রায় দশ দিন হল দাড়ি কাটা হয়নি।

'এতদূর পর্যন্ত সব ঠিক আছে। কিন্তু দাড়ি সে কাটবে কী ভাবে?' প্রশ্নটা আমি নিজের কাছেই রাখলাম।

হাল ছাড়বার লোক ক্যাপ্টেন গুড নয়। যে চর্বির টুকরো দিয়ে সে জুতা পালিশ করেছিল সেটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে নদীর জলে ভাল করে ধুয়ে এনে গালে ঘষতে লাগল। হাতব্যাগ থেকে এবার বের করে আনল ছোট একটা খুর। যারা সমুদ্র যাত্রা করে কিংবা বড় খুরকে ভয় করে তারা এই ধরনের ছোট জিনিস ব্যবহার করে। দশ দিনের পুরনো দাড়ি কি এত সহজে বিলোপ করা যায়? সে ক্রমাগত চর্বি ঘষতে লাগল মাঝে মাঝে চিরুনির সাথে লাগানো আয়নায় মুখ দেখতে লাগল এবং আন্দাজে খুর চালাতে থাকল। তার এই ছেলে মানুষি প্রচেষ্টা দেখে আমার খুব হাসি পেলেও আমি মুখ বুজে থাকলাম। অবশ্য চেষ্টার মধ্যে নিষ্ঠা থাকলে সাফল্য তো আসবেই। এক সময় সে তার ডানদিকের দাড়ি কাটতে সফল হল। গভীর মনযোগ দিয়ে আমি যখন তাকে দেখছি তখন একটা আলোর ঝলকানি তার মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

একটা কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করে লাফ দিয়ে এক পায়ে সরে গেল সে। হাতের খুরটা বড় হলে সে হয়ত নিজের গলা নিজেই কেটে ফেলত। ঘটনার আকস্মিকতায় আমিও কম চমকে যাইনি। আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম সেখান থেকে কুড়ি পা এবং ক্যাপ্টেন গুড যেখানে দাঁড়িয়ে প্রসাধনে ব্যস্ত ছিল সেখান থেকে মাত্র দশ পা দূরে বেশ কয়েকটা লোক আবির্ভূত হয়েছে। লোকগুলো বেশ লম্বা, তাদের গায়ের রঙ তামার মতো, মাথায় কালো কালো পালক গোঁজা এবং পরনে বাঘছালের কৌপীন। তাদের সামনে বর্শা ছোড়ার ভঙ্গিতে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে বছর সতেরোর একটা ছেলে। যে আলোর ঝলকানি একটু আগে দেখেছিলাম তা কোনো উড়ন্ত ধাতব অস্ত্র। এই ছেলেটাই সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল সন্দেহ নেই।

সৈনিকের মতো দেখতে একটা বুড়ো লোকের দিকে আমি কটমট করে তাকাতেই সে এগিয়ে এসে কিশোরের একটা হাত টেনে ধরে তাকে যেন কিছু বলল। তারপর পুরো দলটাই আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

স্যার হেনরি, ক্যাপ্টেন গুড এবং উমবোপা নিজের নিজের রাইফেল নিয়ে মোকাবিলার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু ঐ লোকগুলোও ভয় না পেয়ে বীরদর্পে নিজেদের গতি বজায় রাখল। এইরকম তো হবার কথা নয়। হঠাৎ আমার মনে হল, রাইফেল যে কী জিনিস তা এই লোকগুলো জানে না; অন্যথায় তারা একে এত তাচ্ছিল্য করতে পারত না।

চিৎকার করে আমার সঙ্গীদের বললাম, 'বন্দুক নামাও।' কথাগুলো বলে আমি একাই এগিয়ে গেলাম। আমার আচরণ দেখে বুড়ো লোকটাও কিশোরকে থামিয়ে দিল।

লোকগুলো কী ভাষা বুঝবে তা না জেনেই আমি জুলু ভাষায় তাদের বললাম, 'আমরা তোমাদের বন্ধু।'

বুড়ো লোকটা আমার কথার প্রতিধ্বনি করল। তবে ভাষাটা খাঁটি জুলু না হলেও তাতে ঐ ভাষার ছোঁয়া লাগানো আছে। আমার কিংবা উমবোপার ঐ ভাষা বুঝতে অসুবিধা হল না। পরবর্তীকালে আমরা বুঝেছিলাম যে ঐ ভাষাটা ছিল সেকেলে জুলু ভাষা। এই প্রসঙ্গে একটা তুলনা দেওয়া যেতে পারে যেমন ইংরেজ লেখক চসার যে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেছিলেন সেটা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি থেকে আলাদা।

বুড়ো লোকটা এক গুচ্ছ প্রশ্ন আমাদের দিকে ছুড়ে দিল, 'তোমরা কারা? কোথা থেকে আসছ? তোমাদের তিনজনের মুখ সাদা কেন? ঐ যে আরেকজন তোমাদের সাথে আছে ওর চেহারা আমাদের মতো কী করে হল?' শেষ কথাটা বলে সে উমবোপাকে ইঙ্গিত করল। এবার আমার হুঁশ হল, ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। বুড়োটা তো ঠিক কথাই বলেছে। তবে এই সাদৃশ্য নিয়ে ভাবনা চিন্তা করবার সময় ছিল না বলে আমি চটপট উত্তর দিলাম, 'আমরা বিদেশী, এখানে এসেছি তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে, এই লোকটি আমাদের পরিচারক।'

বুড়ো উত্তর দিল, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছ। ঐ পাহাড় তো কোনো বিদেশী লোক অতিক্রম করতে পারে না। পাহাড়ের কাছে গেলেই সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। অবশ্য তুমি মিথ্যা কথা বললেও কোনো লাভ হবে না তোমাদের। বিদেশীরা কুকুয়ানাদের দেশে এলে বিনষ্ট হয়ে যায়। আমাদের রাজার আদেশ তাই আছে। অতএব হে বিদেশীগণ, তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।'

বুড়োর কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। আরো বড় কথা হল, তার সঙ্গের লোকেরা নিজের নিজের কোমরে বাঁধা অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল। আমার মনে হল, ওগুলো বড় বড় ছুরি।

ক্যাপ্টেন গুড বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল, 'এই হতভাগাগুলো কী বলতে এসেছে?'

আমি জানালাম, 'বুড়োটা মৃত্যুর জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে বলছে।'

ক্যাপ্টেন গুডের মুখের দুপাটি দাঁতই নকল এবং বাঁধানো। কোনো উত্তেজক সংবাদ শুনলে অভ্যাসবশত জিভ দিয়ে সে দাঁতের পাটি খুলে নিতে পারত। বুড়োর শাসানি শুনে ঘাবড়ে গিয়ে জিভের সাহায্যে দাঁতের পাটি দুটো বেশ কয়েকবার খুলল

এবং পরাল, দাঁতের পাটি একবার খুলছে আবার স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছে দেখে কুকুয়ানাগুলো এতখানি অবাক হল যে তারা কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

স্যার হেনরি বলল, 'দেখেছ, ওর দাঁতের পাটির নড়বড়ানি দেখে লোকগুলো কেমন ঘাবড়ে গিয়েছে।' ক্যাপ্টেন গুডের উদ্দেশে বলল, 'দাঁতের পাটিগুলো একেবারে বের করে আন।'

স্যার হেনরির কথা মতো কাজ করতেই লোকগুলোর মনে ভয় কেটে গিয়ে কৌতূহলের সৃষ্টি হল। হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে এলেও সে কথা এখন তারা ভুলেই গেল বলা যায়।

বুড়ো বলল, 'এই লোকটি (ক্যাপ্টেন গুডকে আঙুল তুলে দেখিয়ে) তো বড়ই অদ্ভুত। এর গালের এক দিকে দাড়ি আছে কিন্তু অন্যদিকে নেই (ক্যাপ্টেন দাড়ি কাটার কাজে ব্যস্ত ছিল একটু আগেই), এর একটা চোখে চকচকে কিছু একটা লাগানো আছে, এর দাঁতের পাটি দুটো খুশি মতো বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে আবার ঢুকেও যেতে পারে।'

আমি ক্যাপ্টেন গুডকে বললাম, 'হা, করে তোমার মুখের ভিতরটা ওদের একবার দেখিয়ে দাও তো।'

সে তো কথার ফাঁকে দাঁতের পাটি দুটো আগেই খুলে নিয়েছিল। এবার হাঁ করে সে যখন নিজের মুখের ভিতরটা দেখিয়ে দিল তখন কুকুয়ানাদের মুখও হাঁ হয়ে গেল অপার বিস্ময়ে। এই সময় ক্যাপ্টেনের মুখের ভিতরটা একটা বাঁকা হাতির মুখের ভিতরের মতো লাগছিল।

লোকগুলোকে আরো অবাক করে দিয়ে সে একপাক ঘুরে নিল এবং ইত্যবসরে দাঁতের পাটি দুটোকে মুখের ভিতর যথাস্থানে লাগিয়ে নিয়ে মুখের ভিতরের চেহারা লোকগুলোকে আরেকবার দেখাল।

যে কিশোরটি ক্যাপ্টেন গুডকে লক্ষ্য করে ছুরি ছুড়েছিল সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল এবং ভয়ে মাটিতে মুখ ঘষতে লাগল। এই সময় তার হাঁটু দুটো ঠকঠক করে কাঁপছিল। ছেলেটা কেমন যেন উন্মাদের মতো বলতে লাগল, 'যদি কেউ মানুষ হয় তাহলে কি তার গালের এক দিকে দাড়ি থাকে নাকি তার একটা চোখ গোল ও চকচকে হয়? তার কি দাঁতের পাটি কখনো হাওয়া হয়ে যেতে পারে নাকি আবার কখনো জোড়া লাগতে পারে? হে প্রভুরা, দয়া করে আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন।'

এই সুবর্ণ সুযোগ কি ছাড়া যায়? বিজয়ীর হাসি হেসে বললাম, 'ঠিক আছে, তোমাকে এবারের মতো ছেড়ে দিলাম তবে আমাদের পরিচয় জেনে যাও। আমরা তোমাদের মতো মানুষ হলেও আমরা কিন্তু এসেছি অন্য গ্রহ থেকে; রাতের বেলায় যে তারাটা সব থেকে বেশি উজ্জ্বল মনে হয় সেখান থেকে।'

আদিবাসী লোকগুলো আমার কথার উত্তরে কেবল ঘাড় নাড়তে লাগল।

তাদেরকে একেবারে শক্তিহীন করে দেওয়ার জন্য আমি বললাম, 'কয়েকটা দিন আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকতে এসেছি। আমাদের আশীর্বাদ লাভ করলে তোমাদের মহান কল্যাণ হবে। আমরা এখানে আসব বলে তোমাদের ভাষাও শিখে নিয়েছি।'

লোকগুলো সমস্বরে বলল, 'সব আমাদের কল্যাণের জন্যই বলছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।' কেবল বুড়ো লোকটা বিনয়ের সাথে জানাল, 'হুজুর কিন্তু আমাদের ভাষাটা ভাল করে শেখেননি।'

এই ধৃষ্টতার জন্য কটমট করে তার দিকে তাকাতেই সে একেবারে চুপ করে গেল। আমি বলে চললাম, 'তোমরা হয়ত চিন্তা করছ, তোমাদের ব্যবহারে বিশেষ করে হত্যার অভিপ্রায়ে ছুরি ছোড়ার জন্য আমরা প্রতিশোধ নেব এবং তোমাদের সকলের প্রাণ নেব।'

বুড়োটা কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানাল, 'হে আমার প্রভুরা ঐ ছেলেটাকে প্রাণে মেরে ফেলবেন না করণ ওর বাবা এই দেশের রাজা এবং আমি ওর কাকা। ওর কোনো ক্ষতি হলে আমিও ছেড়ে কথা কইব না।'

কিশোরও তার কাকাকে সমর্থন করে বলল, 'আমার ক্ষতি হলে আপনারাও ছাড়া পাবেন না।'

তাকে এক ধমক লাগিয়ে বললাম, 'বটে দেখবি আমাদের শক্তি? যে নলটা কথা বলতে পারে সেটা একবার দাও তো দেখি উমবোপা।'

আমার আদেশ মান্য করে উমবোপা আমাকে একটা রাইফেল দিল। বন্দুকটায় গুলি ভরা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে একটা হরিণকে সত্তর গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। লোকগুলোর উদ্দেশে বললাম, 'ঐ হরিণটাকে দেখতে পাচ্ছিস? বল তো, এত দূরে দাঁড়িয়ে থেকে কেবল একটা শব্দের সাহায্যে ঐ প্রাণীটাকে কি মারা যায়?'

বুড়ো বলল, 'এ কাজ মানুষের অসাধ্য।' আমি জোর দিয়ে বললাম যে এই কাজ আমার পক্ষেই সম্ভব।

আমার কথা শুনে বুড়ো হেসে বলল, 'প্রভু যতই জোর দিয়ে বলুন না কেন, এখান থেকে হরিণটাকে মারা সম্ভব নয়।'

রাইফেল তুলে আমি হরিণটাকে তাক করলাম। সেটা একটা বাচ্চা হরিণ, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক তবে হরিণটা চুপচাপ একই জায়গায় ছবির মতো দাঁড়িয়ে ছিল বলে আমার সুবিধা হল।

আমার বন্দুকটা গর্জে উঠল। হরিণ শাবকটা শূন্যে একটা লাফ দিল এবং পর মুহূর্তে পেরেকের মতো নিশ্চল হয়ে মাটিতে পড়ে থাকল। এই দৃশ্য আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

খুব শান্তভাবে আমি তাদের বললাম, 'তোমরা যদি মাংস খেতে চাও, তাহলে হরিণটাকে তুলে নিয়ে এসো।'

বুড়ো লোকটা ইশারা করতেই তার এক অনুচর দৌড়ে গিয়ে মরা হরিণটাকে কাঁধে করে নিয়ে এল। হরিণের কাছে গিয়ে তারা দেখল সেটার কাঁধে একটা গর্ত হয়ে গিয়েছে এবং সেখান থেকে রক্ত ঝরছে।

তাদের উদ্দেশ করে বললাম, 'দেখলে তো, আমি বাজে কথা বলি না।'

তারা আমার কথা শুনল কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। আমি বললাম, 'আমার কথায় এখনও যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে ঐ পাথরটার ওপর গিয়ে দাঁড়াও, তার অবস্থাও আমি ঐ হরিণটার মতো করে দেব।'

নিজেকে কে আর মৃত্যুর মুখে ঠেলে নিতে চায়? তারা কেউ যেতে রাজি নয় তা বুঝলাম। শেষে রাজার ছেলে বুড়োকে বলল, 'কাকু, তুমি ঐ পাথরের ওপর দাঁড়ালে তো পার; হরিণ বলেই জাদুমন্ত্র কাজ করেছে, মানুষের বেলায় তা করবে না।'

এত বড় প্ররোচনাতেও কাজ হল না। ভাইপোর কথায় কাকা বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, দেখতে বা জানতে বাকি নেই কিছু। যে জানতে চায়, সে যাক না ঐ পাথরের ওপর দাঁড়াতে। আমার বাবা দরকার নেই ওসবে। এই জাদুকরদের আমরা এখন রাজার কাছে নিয়ে যাই চল।'

বুড়োর অনুচরদের মধ্যে নিজের শরীরের ওপর জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করতে দিতে কেউ রাজি নয়। একজন বলল, 'আমাদের ওপর প্রয়োগ করা মানে জাদুবিদ্যার অপচয়। এত সুন্দর জাদু কিন্তু আমাদের লোকেরা দেখাতে পারে না।'

বুড়ো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি ঠিক কথাই বলেছ। হে প্রভুরা যাঁরা তারকাদের সন্তান, সুন্দর চোখ এবং চলমান দন্তপংক্তির সন্তান, যাঁরা অতি দূর থেকে গর্জন করতে ও হত্যা করতে পারেন তাঁরা শুনুন, এবার আমার পরিচয় দিই। আমি কাফা-র পুত্র ইনফাদুস, আমার বাবা এক সময় কুকুয়ানাদের রাজা ছিল। এই কিশোরের নাম স্ক্রাগা।'

ক্যাপ্টেন গুড মন্তব্য করল, 'বদমাস স্ক্রাগা তো আমাকে আর একটু হলে মেরেই ফেলত।'

বুড়ো পরিচয় পর্ব চালিয়ে গেল, 'এই ছেলেটির বাবার নাম টোয়ালা– মহারাজা টোয়ালা যার পত্নীর সংখ্যা এক হাজার; সলোমন রাজপথের রক্ষক, শত্রুদের যম এবং এক লাখ সৈন্যের অধিপতি। জাদু বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী সে। এক চক্ষু কৃষ্ণকায় টোয়ালা বিভীষিকা নামেই সুপরিচিত।'

আমিও দমে যাওয়ার পাত্র নই। জোর গলায় বললাম, 'ভীরু কাপুরুষদের সাথে আমরা কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি চাই টোয়ালার মতো খেলোয়াড়। তার কাছেই আমাদের নিয়ে চল।'

বুড়ো বলল, 'রাজবাড়ি তো এখান থেকে অনেক দূরের পথ। আমরা তিন দিন আগে সেখান থেকে বের হয়েছি শিকারের চেষ্টায়। ধৈর্য ধরুন, আমরা অবশ্যই রাজার কাছে নিয়ে যাব আপনাদের।'

তচ্ছিল্যভরে আমি বললাম, 'আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় আছে আর আমরা যেতেও চাই। তবে ইনফাদুস এবং স্ক্রাগা তোদের সাবধান করে দিচ্ছি, আমাদের সাথে কোনোরকম চালাকি করবার চেষ্টা করিস না। আমাদের ক্ষতি করবার চিন্তা তোদের মাথায় আসার আগেই আমরা টের পেয়ে যাব আর তখন কিন্তু তোদের কেউ বাঁচাতে পারবে না। ঐ যে লোকটার এক গালে দাড়ি আছে আর একটা চোখ খুব উজ্জ্বল এবং গোলাকার, ও যে কী ভয়ংকর তা তোরা বুঝতে পারবি না। তোদের সকলকে বিনাশ করে তোদের গ্রাম ধ্বংস করে দিতে ওর এতটুকুও সময় লাগবে না। ও কেবল নিজের দুপাটি দাঁতকে আদেশ করবে। তারা মুহূর্তের মধ্যে তোদের সবার শরীরে প্রবেশ করে তোদের পরমায়ু শেষ করে ছাড়বে। তোদের বৌ ও ছেলে মেয়েরাও নিস্তার পাবে না। আমাদের মন্ত্রপুত লাঠিগুলো তোদের সাথে কথা বললে তোরা সবাই মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাবি। তাই বলছি, সাবধান।'

তাদের প্রভাবিত করবার জন্য আমি এত কথা বললাম বটে, তবে তার প্রয়োজন ছিল না। তারা ইতিমধ্যেই বুঝে গিয়েছে আমরা কত শক্তিশালী।

বুড়ো এবার কোমর পর্যন্ত মাথা ঝুঁকিয়ে 'কুম কুম' শব্দ দুটি পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করল। পরে জেনেছিলাম, ঐ কথা দুটি রাজকীয় সম্মান জানানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা আমাদের মালপত্র পিঠে তুলে নিল, এমনকী, ক্যাপ্টেন গুডের কাপড় চোপড় যা তার পাশেই ভাঁজ করে রাখা ছিল তাও বাদ গেল না। বাদ গেল কেবল বন্দুকগুলো, কিছুতেই তারা বন্দুক স্পর্শ করতে রাজি হল না।

তার জামা কাপড় বুড়োর অনুচরেরা তুলে নিচ্ছে দেখে ক্যাপ্টেন গুডের তো মেজাজ গেল খারাপ হয়ে। নিজস্ব জিনিস নিয়ে তার খুব খুঁতখুঁতানি আছে। তাকে শান্ত করবার জন্য বুড়ো বলল, 'হে উজ্জ্বল চোখের মালিক, হে তরল দন্ত পংক্তির মালিক! আমরা কি আপনাকে ভার বইবার কষ্ট দিতে পারি? অনুগত ভৃত্যেরা থাকতে আপনি কেন কষ্ট করবেন?'

হতাশ হয়ে ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'তা হলে আমি পরবটা কী?'

তার কথাটা অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিলে ইনফাদুস বলল, 'প্রভু, আপনি কেন এত নির্দয় হচ্ছেন? আপনার এই শ্বেত শুভ্র পা দুখানি দেখলে আপনার ভৃত্যেরা কত আনন্দ পায়! আপনি সেই সুখ থেকে কেন তাদের বঞ্চিত করতে চাইছেন?'

তাদের কথা শুনে আমার মনে হল হাসিতে আমার বুক ফেটে যাবে। ইতিমধ্যে বুড়োর লোকজন অবশ্য ক্যাপ্টেনের জামা কাপড় সব বেঁধে নিয়ে মাথায় তুলে ফেলেছে।

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'ঐ কালো শয়তানটা তো আমার প্যান্টটা পর্যন্ত নিয়ে চলে যাচ্ছে।'

স্যার হেনরিকে এবার মধ্যস্থতা করতেই হল। সে বলল, 'দেখ গুড, তুমি একটা বিশেষ কিছু হিসাবে এদের কাছে চিত্রিত হয়ে গিয়েছ। তোমার একটা চোখে চশমার কাচ বাঁধা থাকবে। শরীরের উর্ধাঙ্গে একটা জামা থাকবে আর পায়ে বুট থাকবে। ব্যস, এই পর্যন্তই। এখনও তোমার পরনে প্যান্ট নেই, পরেও থাকবে না। অতএব এসব নিয়ে তুমি আর মাথা খারাপ করো না।'

ক্যাপ্টেনের পিছনে লাগবার সুযোগ হাতছাড়া না করে আমিও এক দফা যোগ করে দিলাম, 'এই যে তোমার গালের কথাই ধর না। এক দিকে দাড়ি আছে, অন্য দিকে নেই, এর যদি কোনো পরিবর্তন কর তাহলে তোমাকে এরা চিনতে পারবে না। তখন এরা আমাদের প্রতারক ভাববে এবং আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।'

ম্লানমুখে ক্যাপ্টেন বলল, 'তোমার কি সত্যিই তাই মনে হয়?'

আমি উত্তর দিলাম, 'আমি মনের কথা বলেছি। শ্বেত শুভ্র পদযুগল এবং দ্যুতিময় চোখই তো আমাদের দলের পরিচয় বহন করছে। প্যান্ট নেই সে জন্য দুঃখ করো না। তোমার সৌভাগ্য যে, জুতাটা পরেছিলে! গরমকালে প্যান্ট না পরলেও চলে।' ক্যাপ্টেনের বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। নিজের নতুন ও স্বল্প পোশাকে অভ্যস্ত হতে তার অবশ্য এক পক্ষ কাল সময় লেগেছিল।

৮

কুকুয়ানাদের দেশে প্রবেশ

সারা বিকাল আমরা 'সলোমনের রাজপথ' ধরে হাঁটলাম। যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম সেখান থেকেই রাস্তাটা উত্তর পশ্চিমের দিকে একেবারে সোজা চলে গিয়েছে। ইনফাদুস ও স্ক্রাগা আমাদের পাশাপাশি হেঁটে চলেছিল কিন্তু তাদের অনুচররা আমাদের পিছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল।

এক সময় আমি জানতে চাইলাম; 'আচ্ছা ইনফাদুস, বলতে পার এই রাস্তাটা কে তৈরি করিয়েছিল?'

সে উত্তর দিল, 'রাস্তাটা মানুষের তৈরি তবে কতদিন আগে বা কীভাবে তৈরি হয়েছিল তা কেউ জানে না। এমনকী, যে নারী বহু প্রজন্ম ধরে বেঁচে আছে সেই গাগুল পর্যন্ত জানে না। আমাদের বয়স তো অল্প তাই এসব খবর আমাদের জানবার কথাও নয়। বর্তমান কালে এই ধরনের রাস্তা মানুষ বানাতে পারবে না। তবে আমাদের রাজা এর রক্ষণাবেক্ষণে ভাল নজরই দেয়।'

নদীর ধারে সুড়ঙ্গের দেওয়ালে মিশরীয় ধাঁচে যে সব লিপি দেখেছিলাম তার প্রসঙ্গ টেনে জানতে চাইলাম, 'ওগুলো কাদের সৃষ্টি?'

ইনফাদুস অবশ্য নতুন কোনো খবর না দিয়ে বলল, 'যারা রাস্তা তৈরি করেছিল তাদেরই সৃষ্টি হবে ঐ সব দেওয়াল লিখন।'

'কুকুয়ানা জাতির লোকেরা প্রথম কখন এখানে এসেছিল?' আমি জানতে চাইলাম।

উত্তর দিকটা নির্দেশ করে ইনফাদুস বলল, 'ঐ ওপাশ থেকে এসেছিল। ওখানে খুব সুন্দর একটা দেশ আছে! সে কি আজকের কথা! এক কোটি চান্দ্র মাস আগে বিশাল সংখ্যায় তারা এসেছিল। এই প্রদেশটা পাহাড় পরিবৃত বলে তারা আর এগোতে পারেনি। এসব কি আর আমার কথা? যুগ যুগ ধরে বাবারা বলেছে, ছেলেরা শুনেছে; বিচক্ষণ ও বহুদর্শী নারী গাগুল বলেছে, দেশের লোক শুনেছে। এই অঞ্চলটা এত ভাল যে তারা এখানে বসবাস করতে শুরু করল, কালক্রমে তাদের জনসংখ্যা সমুদ্র তীরের বালির পরিমাণে গিয়ে দাঁড়াল। বর্তমানে এমন অবস্থা যে রাজা টোয়ালা একবার হুকুম করলে এত সৈনিক সমবেত হয় যে তাদের মাথার পালকে এই উপত্যকার ঘাসটি পর্যন্ত দেখা যায় না।'

আমি জানতে চাইলাম 'এই এ দশ তো পাহাড় দিয়ে ঘেরা তাহলে রাজার সৈন্যরা কার সাথে যুদ্ধ করবে? শত্রুরা আসবে কী করে?'

ইনফাদুস বলল, 'ঐ যে বললাম না, উত্তর দিকটা তো খোলা আছে। ওদিক থেকে অসংখ্য শত্রু একবার এসেছিল এবং ঘোর যুদ্ধ হয়েছিল। সে বহু বছর আগেকার কথা, আমি তখন বয়সে কিশোর। সব আক্রমণকারীদের আমরা মেরে ফেলেছিলাম। তারপর থেকে আর অবশ্য কেউ এই পথ মাড়ায়নি। সেটাই ছিল শেষ যুদ্ধ।'

– যুদ্ধই যখন নেই তখন তোমাদের সৈনিকরা তো খেয়ে ঘুমিয়ে অলস হয়ে পড়েছে।

– বহিরাগত কোনো শত্রুর সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়নি ঠিকই তবে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল একবার। সেবার কুকুর তো অন্য কুকুরের মাংস খেয়েছিল।

– কী হয়েছিল সেই সময়?

– সে এক লম্বা কাহিনী। বর্তমান যে রাজা মানে টোয়ালা, সে হল আমার সৎভাই। স্বাভাবিকভাবে, আমাদের বাবা এক সময় এখানকার রাজা ছিল। রাজার এক পত্নী যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। আমাদের সমাজের নিয়ম অনুযায়ী কনিষ্ঠ সন্তানকে মেরে ফেলতে হবে। যমজ সন্তান দুটির মধ্যে টোয়ালা ছিল কনিষ্ঠ কিন্তু মা কী করে নিজের সন্তানকে হত্যা করবে? তার ওপর কনিষ্ঠ সন্তানটি শারীরিকভাবে দুর্বল ছিল বলে মায়ের মমতা তার ওপরেই বেশি ছিল। মা ঐ দুর্বল ছেলেটিকে লুকিয়ে রেখেছিল। আমি ছিলাম রাজার অন্য পত্নীর ছেলে এবং আমার দাদার নাম ছিল ইমোতু।

– তারপর?

– আমরা যখন প্রাপ্ত বয়স্ক তখন রাজা কাফা অর্থাৎ আমার বাবা দেহত্যাগ করল এবং আমার বড় ভাই ইমোতু-কে সিংহাসনে বসানো হল। বেশ কয়েক বছর সে রাজত্ব করে ছিল। এই সময়ের মধ্যেই সে একটি সন্তানের পিতা হয়। বাচ্চাটার যখন বছর তিনেক বয়স তখন অনেক হানাহানি ও রক্তপাতের পর গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। সে কী দুঃসময়। অশান্তির জেরে দেশের মানুষ না পেরেছে বীজ বুনতে, না পেরেছে ফসল কাটতে। মাঠের পর মাঠ একেবারে শস্যশূন্য। খাদ্য না পেয়ে মানুষজন তো উন্মাদ, কখন কী করে বসে ঠিক নেই। এই সুযোগে বিচক্ষণ অথচ ভয়ংকর মহিলা গাগুল একটা কাজ করল। গাগুলের বয়সের তো গাছ পাথর নেই। তার মৃত্যুও নেই। দেশে যখন খাদ্যাভাব ও অরাজকতা চলছে সে তখন ঘোষণা করল, 'ইমোতু তোমাদের রাজা হতে পারে না।' রাজা ইমোতু সেই সময় আহত অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিল।

'গাগুল একটা কুটিরে গিয়ে একজনকে হাত ধরে বের করে এনে জনতার সামনে দাঁড় করিয়ে বলল : এই হচ্ছে তোমাদের আসল রাজা, জন্মের অব্যবহিত পরেই একে আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। কথাগুলো বলে যুবকের নাভি মণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে সকলকে দেখাল। সেখানে একটা কুণ্ডলী পাকানো সাপের ছবি উল্কি দিয়ে আঁকা আছে। নাভির নিচে এই ধরনের ছবি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের শরীরেই আঁকা থাকে এইভাবে বুড়ি গাগুল মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যমজ সন্তানের কনিষ্ঠজনকে রাজা সাব্যস্ত করল, এই কনিষ্ঠ জনের নাম টোয়ালা।

'প্রজারা তো তখন ক্ষুধায় এমনই উন্মাদ যে যুক্তি বা সত্যের যাচাই করবার শক্তি তাদের নেই। তারা বুড়ির সমর্থনে আমাদের রাজা, আমাদের রাজা বলে চিৎকার

করতে লাগল। কিন্তু আমি তো জানি, ইমোতু ছিল যমজ সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং আইনের বিচারে সেই সিংহাসনে বসার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। বাইরে যখন তুমুল গন্ডগোল চলছে তখন অসুস্থ ও আহত রাজা ইমোতু তার স্ত্রীর হাত ধরে অল্প বয়সি পুত্র ইগনোসিকে নিয়ে রাজবাড়ি থেকে লুকিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ইগনোসি শব্দের অর্থ বিদ্যুৎ। কিন্তু রাজা ইমোতু বেশি দূর যেতে পারেনি। তার সহোদর ভাই টোয়ালা তার পিছনে ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলেছিল এবং তার বুকে ছোরা ঢুকিয়ে হত্যা করেছিল। জনগণ তো সর্বদাই আবেগপ্রবণ। ঐ দৃশ্য দেখে তারা হাততালি দিয়ে সমস্বরে বলে উঠেছিল, 'আমাদের রাজা টোয়ালা দীর্ঘজীবী হোক।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'নিহত রাজার স্ত্রী ও তার পুত্র ইগনোসি'র কী অবস্থা করল রাজা টোয়ালা? সে কি তাদেরও হত্যা করেছিল?'

'স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে দেখে রানি তার ছেলেকে বুকে চেপে ধরে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ছুটে পালাল। দুদিন পর রানি একটা লোকালয়ে এসে বাচ্চার জন্য দুধ ও খাবার চাইলে কেউ তা দিতে রাজি হল না কারণ ঐ নারী তাদের কাছে দুর্ভাগ্যের প্রতীক ছিল। পরে রাত্রি নেমে এলে একটা বাচ্চা মেয়ে চুপিচুপি তার জন্য কিছু খাবার এনেছিল। সূর্য ওঠার আগেই রানি তার ছেলেকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গিয়েছিল। এরপর কেউ আর তাদের দেখতে পায়নি, তারা হয়ত ওখানেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'ইগনোসি নামের ছেলেটা যদি বেঁচে থাকত তাহলে সে আজ কুকুয়ানাদের প্রকৃত রাজা হতে পারত, তাই নয় কি?'

বুড়ো বলল, 'তা আর বলতে। তার নাভিতে তো কুণ্ডলী পাকানো সাপের ছবি উল্কি করে আঁকা আছে। তবে আমার মনে হয় না সে আজও বেঁচে আছে।'

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম সেখান থেকে খানিকটা নিচে একটা লোকালয় ছিল। লোকালয়টা একটা উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। বেড়ার ওপারে ছিল একটা গোলাকৃতি খাল। বুড়ো ঐ লোকালয় নির্দেশ করে বলল, 'ইমোতুর স্ত্রী ও তার ছেলে ইগনোসিকে শেষবার ওখানেই দেখা গিয়েছিল। আজ রাতটা আমরা ঐ লোকালয়ে থাকব, কিন্তু প্রভুরা কি এই পৃথিবীর মাটিতে শুতে পারবেন?'

আমি বুক ফুলিয়ে বললাম, 'হে বন্ধু ইনফাদুস, আমরা যখন কুকুয়ানাদের সাথে থাকি, তখন তারা যা করে আমরা তাই করে থাকি।' কথাগুলো বলে আমি ক্যাপ্টেন গুডের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম তার মুখে চোখে অস্বস্তির ছাপ। ব্যাপার হল, সান্ধ্য হাওয়ায় তার উর্ধাঙ্গের জামাটুকু এত জোরে উড়ছিল যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে এবং সে প্রাণপণ চেষ্টায় সেটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। আমার ঠিক পিছনেই হাঁটছিল উমবোপা। তার দিকে চোখ পড়তেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ইনফাদুসের সাথে আমার যা কথাবার্তা হচ্ছিল গভীর আগ্রহের সাথে সে তা শুনছিল। মনে হচ্ছিল, বহুকাল আগের কোনো বিস্মৃত ঘটনা সে মনে করবার চেষ্টা করছে।

আমরা এতক্ষণ বেশ জোর গতিতে নিচের ঢেউ খেলানো বসতিপূর্ণ অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। যে পাহাড়টা আমরা অতিক্রম করে এসেছি সেটা এই মুহূর্তে আমাদের মাথার বেশ উঁচুতে ছিল তবে 'শেবার স্তন' দুটোকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না কারণ পুরু কুয়াশায় সেগুলো আবৃত ছিল। যতই আমরা লোকালয়ের নিকটবর্তী

হতে লাগলাম জায়গাটা ততই যেন সুন্দর মনে হতে লাগল। গোটা অঞ্চলটা ঘন সবুজে ঢাকা; সূর্যের উত্তাপ আছে কিন্তু জ্বালা নেই; পাহাড়ের কোলে বয়ে চলেছে সুগন্ধে ভরা মৃদু সমীরণ। ভূ-স্বর্গ বলতে যা বোঝায় এই অঞ্চলটা তাই। আবহাওয়া, পথের শোভা ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যে এর সমতুল্য জায়গা আমি দেখিনি। ট্রান্সভাল দেশটার সৌন্দর্যের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ কিন্তু আমার ধারণা কুকুয়ানা প্রদেশের সৌন্দর্যের ধারে কাছে ঐ দেশ আসে না।

যে মুহূর্তে আমরা লোকালয়ের অভিমুখে যাত্রা করেছিলাম তখনই ইনফাদুস তার এক অনুচরকে ঐ লোকালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল যাতে ওখানকার বাসিন্দারা আমাদের আগমনের আগাম খবর পেয়ে যায়। প্রসঙ্গত ঐ লোকালয়টা ইনফাদুসের সামরিক নিয়ন্ত্রণে ছিল। তার দূতটি ছিল এক দৌড় বীর। অবশ্য ইনফাদুস নিজেই বলেছিল ঐ দূতটি পুরো রাস্তাটাই সমান গতিবেগে যাবে কারণ এখানকার লোকেরা ব্যায়াম বলতে দৌড় বোঝে।

দূতের মাধ্যমে আগাম সংবাদ দেওয়ার পরিণাম কী হতে পারে তা আমরা লোকালয় পৌছানোর দুই মাইল আগে থেকেই টের পেলাম। দলে দলে নারী, পুরুষ, ছেলে মেয়ে লোকালয়ের নানা দিক থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে আসছিল। যখন আমরা লোকালয়ে পৌছলাম তখন দেখলাম রাস্তার পাশে সারি দিয়ে তিন হাজার ছয়শো অর্থাৎ বারো বাহিনী যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে।

কাছাকাছি এসে প্রথম বাহিনীকে নিরীক্ষণ করলাম। সৈনিকরা কী উন্নত মানের! তারা প্রত্যেকেই পরিণত বয়স্ক এবং প্রত্যেকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। যা আমাকে খুব বেশি মুগ্ধ করল তা হল তাদের দৈহিক উচ্চতা। তারা প্রত্যেকেই ছয় ফুটের বেশি লম্বা এবং বেশ কয়েকজন ছিল যারা লম্বায় ছয় ফুট তিন ইঞ্চি। এই যোদ্ধারা বাহিনীর পুরোভাগে থাকে বলে তাদের মাথায় কালো পালকের তোড়া লাগানো ছিল এবং কোমরে ও ডান হাঁটুতে সাদা গরুর লেজ বাঁধা ছিল। এদের বাঁ হাতে ধরা ছিল কুড়ি ইঞ্চি চওড়া ঢাল। এই ঢাল পাতলা লোহার পাত দিয়ে তৈরি এবং সাদা ষাঁড়ের চামড়ায় মোড়া। এদের হাতে ছিল দু'ফলা বর্শা যার হাতল ছিল কাঠের; বর্শার ফলা নিচের দিকে ছয় ইঞ্চি চওড়া ছিল। এই বর্শা দূর থেকে নিক্ষেপ করা হয় না, খুব কাছের থেকে মৃত্যু নিশ্চিত করবার জন্যই ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়াও তাদের কোমর ও পিঠে রাখা ছিল একটা করে ছুরি। কুকুয়ানাদের ভাষায় এই ছুরির নাম 'তোল্লা, কুকুয়ানা যোদ্ধারা এতই পারদর্শী যে, পঞ্চাশ গজ দূরে থাকলেও লক্ষ্যবস্তুকে সঠিকভাবে বিঁধতে পারে। এদের নিয়ম হল, শত্রুর মুখোমুখি হলে একই সাথে পঞ্চাশজন ছুরি ছুড়বে।

প্রতিটি বাহিনীর সামনে কয়েক পা দূরে পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়েছিল একজন করে নায়ক যার নির্দেশ অনুসারে বাহিনীর যোদ্ধাদের চলতে হত। নায়কের পদ মর্যাদা চিহ্নিত করবার জন্য তার পরণে ছিল চিতাবাঘের চামড়ার পোশাক। আমরা কোনো বাহিনীর নিকটবর্তী হলেই বাহিনীর নায়ক উঁচু গলায় একটা হুকুম দিল এবং বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সব যোদ্ধা তাদের বর্শা ওপরের দিকে তুলে 'কুম' বলে চিৎকার করল। কোনো এক বিশেষ বাহিনী ছাড়িয়ে যেতেই বাহিনীর সব যোদ্ধারা সারি দিয়ে আমাদের পিছনে আসতে লাগল। এইভাবে একে একে বারোটি

বাহিনীর সৈনিকরা এক সময় আমাদের পিছন পিছন হাঁটতে লাগল। যখন আমরা এক বড় সেনাবাহিনীর পুরোভাগে থেকে গ্রামে প্রবেশ করছি তখন মনে হল এই সাহসী বীরদের পায়ের চাপে পৃথিবীটা যেন কেঁপে উঠছে।

সলোমন রাজপথ থেকে নেমে আমরা লোকালয়ের দিকে এগোলাম। বড় বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে লোকালয়ের চারদিক ঘেরা ছিল। প্রধান প্রবেশদ্বারের সাথেই ছিল একটা কাঠের সেতু। কাঠের সেতুটা খোলা এবং গোটানো যেত। গোটা লোকালয়ের ঠিক বাইরের দিকে ছিল একটা খাল। আমরা লোকালয়ের কাছাকাছি যাওয়ার আগেই প্রধান প্রবেশ দ্বার খুলে দিয়ে কাঠের সেতুটা খালের ওপর নামিয়ে দেওয়া হল যাতে আমাদের ঢুকতে অসুবিধা না হয়। লোকালয়টি খুব পরিকল্পনা করেই তৈরি করা হয়েছে। এর ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা সুন্দর রাস্তা। রাস্তার সমকোণে এক একটা চতুর্ভুজ আকারের মাঠের ওপর বানানো হয়েছে সুন্দর সুন্দর কুটির। কুটির গুলি গম্বুজাকৃতির এবং খড় দিয়ে ছাওয়া। আকৃতিতে কুটির হলেও ভিতরে বেশ খানিক জায়গা আছে এবং চারিদিকে ছয় ফুট চওড়া বারান্দা আছে। কুটিরের দেওয়ালে শক্ত চুনামাটির প্রলেপ লাগানো আছে। এই কুটির গুলি সৈনিকদের আবাস স্থল।

চওড়া রাস্তার পাশে আমাদের দেখার জন্য আগ্রহভরে কয়েকশো নারী অপেক্ষা করছিল। মেয়েগুলি এক কথায় খুবই সুরূপা। তাদের প্রত্যেকেই ছিল লম্বা এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত, মাথার চুল পেঁজা তুলোর মতো নয়; কেবল কুঁচকানো। তাদের চোখ মুখ কাটাকাটা এবং আফ্রিকানদের মতো মোটা মোটা ঠোঁট নয়। যা দেখে আমার খুব ভাল লাগল তা হল তাদের প্রশান্তভাব ও চেহারার মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ। অবস্থাপন্ন বাড়ির মেয়েদের মধ্যে যেমন মার্জিত ব্যক্তিত্ব থাকে এদের মধ্যে তাই নজরে পড়ছিল। চেহারার এই বৈশিষ্ট্যে তাদের সাথে জুলু মেয়েদের এবং জাঞ্জিবারের মাসাই জাতির মেয়েদের পার্থক্য ছিল। কৌতুহলের বশে তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল কেবল আমাদের দেখবে বলে কিন্তু তাদের চোখের ভাষায় অমার্জিত বিস্ময় ছিল না এবং আমরা যখন তাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম তখন তারা কোনো কর্কশ মন্তব্যও করেনি। আমরা যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন বুড়ো ইনফাদুস হাতের ইশারায় ক্যাপ্টেন গুডের অনাবৃত 'সুন্দর শুভ্র পদ যুগলের' দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। সেই সময় মেয়েরা একটা অভিনব জিনিস দেখলেও উচ্চকণ্ঠে অমার্জিতভাবে প্রশংসা করেনি। ক্যাপ্টেনের অসাধারণ শুভ্র ত্বক দেখে তাদের কালো চোখে সম্ভ্রমের ভাব ফুটে উঠেছিল মাত্র। ক্যাপ্টেন গুডের পক্ষে এই নীরব ভাষাই ছিল একটা বড় প্রাপ্তি কারণ সে ছিল খুবই বিনয়ী।

লোকালয়ের মধ্যস্থলে একটা অনেক বড় কুটিরের দরজার সামনে পৌছে ইনফাদুস দাঁড়িয়ে পড়ল। ঐ কুটিরের সাথে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রেখে আরো কয়েকটি ছোট কুটির সেটাকে পরিবৃত করে রেখেছিল।

ইনফাদুস আমাদের উদ্দেশে বলল, 'হে তারকা তনয়গণ! আপনারা গরিবদের বাড়িতে পদধূলি দিয়ে আমাদের ধন্য করুন। এখানে বিশ্রাম করুন, জানি, আপনাদের খুব খিদে পেয়েছে। আপনাদের জন্য ষাঁড় ও ভেড়ার মাংস, দুধ ও মধু নিয়ে আসছে। এইসব খাদ্য আপনাদের মতো লোকের কাছে খুবই সাধারণ কিন্তু আমরা ভক্তিভরে তা নিবেদন করছি।'

আমি বললাম, 'ইনফাদুস, বায়ু স্তরের মধ্য দিয়ে আসার জন্য আমরা খুবই পরিশ্রান্ত; এখন আমাদের বড় প্রয়োজন হল বিশ্রামের।'

কুটিরের ভিতরে ঢুকে দেখলাম সেখানে শোবার জন্য খাট রাখা আছে। আরাম করে যাতে আমরা শুতে পারি সেজন্য খাটের ওপর শুকনো চামড়ার চাদর পাতা আছে। ওপাশে হাত মুখ ধোওয়ার জন্য পানি পর্যন্ত রাখা আছে।

একটু পরে বাইরে থেকে বেশ কিছু লোকজনের কথা-বার্তা কানে এল। বাইরে বেরিয়ে দেখি, এক দল মেয়ে আমাদের জন্য দুধ ও অন্যান্য খাবার নিয়ে আসছে এবং তাদের পিছনে একটা ষাঁড়কে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে কয়েকজন যুবক। কুটিরের সামনে এসে মেয়েরা খাবারগুলো নামিয়ে রাখল। এই সময় একজন যুবক তার কোমরে ঝোলানো বড় একটা ছুরি বের করে ক্ষিপ্রগতিতে ষাঁড়ের গলাটা কেটে ফেলল। পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে পশুটার ছাল ছাড়ানো হল এবং শরীরের মাংস কেটে কুচি কুচি করা হল। আমাদের প্রয়োজন মতো মাংস রেখে বাকিটুকু ওদের ফিরিয়ে দিলাম এবং তারাও 'শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের উপহার' হিসাবে সানন্দে তা গ্রহণ করল।

উমবোপাও কাজে লেগে গেল। কিছু বলার আগেই একটি অল্প বয়সি মেয়ে তার সাহায্যার্থে এগিয়ে এল। আগুন জ্বালিয়ে তার ওপর একটা মাটির হাঁড়ি বসিয়ে মাংস রান্নার কাজ চলতে লাগল। রান্না সমাপ্ত হলে ইনফাদুস ও স্ক্রাগাকে আমরা নিমন্ত্রণ জানালাম আমাদের সাথে খেতে আসবার জন্য।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তারা এল। ঘরের মধ্যে বেশ কিছু কাঠের টুল রাখা ছিল। তারা টুলের ওপর বসল। জুলু সম্প্রদায়ের লোকরা মাটিতে বসতে অভ্যস্ত; এরা কিন্তু নয়। বুড়ো ইনফাদুস খুব বিনয়ী এবং মিশুক, কিন্তু স্ক্রাগা নামের যুবকটিকে মনে হল সে আমাদের সন্দেহ করছে। আমাদের গাত্রবর্ণ দেখে গ্রামের অন্যদের মতোই এই কুকুয়ানা যুবকটি প্রথম দিকে সম্ভ্রমের চোখে আমাদের দেখতে শুরু করেছিল কিন্তু যখন সে দেখল আমরাও অন্য দশজন মানুষের মতো খাবার খাই, পানি খাই, ক্লান্ত হলে ঘুমাতে যাই তখন আমাদের সম্বন্ধে তার যে উচ্চ ধারণা ছিল তা অবলুপ্ত হয়ে গেল এবং তার বদলে সে আমাদের সন্দেহ করতে লাগল। তার আচরণে আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

খাবার সময় আমরা যখন সকলে মিলে কথাবার্তা বলছিলাম তখন স্যার হেনরি আমাকে বলল, 'এরা আমার ভাইয়ের সম্বন্ধে কিছু জানে কিনা খোঁজ নাও।' আমার মনে হল, এই প্রশ্ন করবার উপযুক্ত সময় এটা নয়। সেই জন্য এই বিষয় নিয়ে কোনো কথা না বলে আমি চুপচাপ থাকলাম।

খাওয়া শেষ হলে ধূমপানের জন্য আমরা পাইপ ধরালাম। ধূমপান জিনিসটা কুকুয়ানাদের কাছে একটা অভিনব অভিজ্ঞতা। আমাদের ধূমপান করতে দেখে ইনফাদুস ও যুবক স্ক্রাগার ধারণা হল আমরা নিশ্চয়ই অন্য গ্রহ থেকে এসেছি। এদেশেও তামাকের পাতা পাওয়া যায় কিন্তু জুলুদের মতো এরাও সেই পাতাকে নস্যি হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। তামাকের পাতাকে যে অন্যভাবে ব্যবহার করা যায় সে কথা এদের একেবারেই অজানা ছিল।

এখান থেকে কবে আবার রওয়ানা দেব তা জানতে চাইলে ইনফাদুস জবাব দিল আগামীকাল সকালে যাত্রার জন্য সব বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং আমাদের আগমনের

কথা রাজা টোয়ালাকে দূত মারফৎ জানানো হয়েছে। শুনলাম, টোয়ালা এখন তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে আছে। সেই অঞ্চলের নাম 'লু।' জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সেখানে একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষে রাজ্যের সব যোদ্ধারা সেখানে রাজাকে অভিবাদন জানাতে সমবেত হয়। সীমান্ত রক্ষার্থে কেবল কিছু সংখ্যক সৈন্যকে দূরবর্তী অঞ্চলে থেকে যেতে হয়। কুচকাওয়াজে যোগ দেওয়ার জন্য তাদের ডাকা হয় না। এই অনুষ্ঠানের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে বিগত এক বছরে যারা ডাইনি বা অশুভ শক্তির প্রভাবে পড়েছে তাদের চিহ্নিত করা।

ঠিক হল, পরের দিন ভোরে আমরা যাত্রা করব এবং নদীর পানি ফুলে ফেঁপে ওঠার মতো বা অন্য কোনো দুর্ঘটনা যদি না ঘটে তাহলে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আমরা 'লু' পৌছে যাব। ইনফাদুস আমাদের সাথে যাবে বলে ঠিক হল।

এই খবর দিয়ে ইনফাদুস ও স্ক্রাগা বিদায় নিল। তারা বিদায় নিতেই মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে আমরা বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। পথ চলার ক্লান্তির জন্য ঘুমও এসে গেল তাড়াতাড়ি। আমরা তিনজন যখন আরামে ঘুমাচ্ছি তখন কিন্তু আমাদের দলের চতুর্থ জনের চোখে ঘুম নেই। সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতকতার সংশয় তার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

৯

নৃপতি টোয়ালা

কুকুয়ানাদের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকালয়ে যাওয়ার জন্য আমরা 'সলোমনের রাজপথ' ধরে পুরো দুই দিন হাঁটলাম। রাস্তা বটে একখানা! কী মসৃণ আমরা যতই লোকালয়ের দিকে এগোতে লাগলাম আমাদের চোখে ততই সমৃদ্ধির ছাপ চোখে পড়তে লাগল। রাস্তার দুই পাশের সব জমিতেই কিছু না কিছু ফসল চাষ করা হয়েছে। রাস্তা থেকে যে সব গ্রাম দেখা যাচ্ছিল সেগুলোও আমাদের দেখা সেই প্রথম গ্রামের আদলেই তৈরি এবং প্রতিটি গ্রামের সুরক্ষার জন্য সৈনিক মোতায়েন করা আছে। জার্মান, জুলু ও মাসাই জাতির শারীরিকভাবে সক্ষম সব পুরুষই সৈনিক। সেই কারণে প্রতিরোধ বা আক্রমণের সময় তাদের সৈনিকের অভাব থাকে না। আমরা যখন কুকুয়ানাদের রাজধানী গ্রাম 'লু' অভিমুখে যাচ্ছিলাম তখন অসংখ্য যোদ্ধার সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল। তারাও বার্ষিক কুচকাওয়াজ ও উৎসবে যোগদান করতে যাচ্ছিল। এত সুন্দর সৈন্যদল আমি আগে দেখিনি।

দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের সময় আমরা এমন একটা জায়গায় পৌঁছলাম যেখান থেকে নিচের 'লু' গ্রামটা এক নজরে দেখা যায়। ঐ রকম গ্রাম সাধারণত চোখে পড়ে না। গ্রামটার আয়তন পাঁচ মাইল, ঐ গ্রাম যেখানে শেষ হয়েছে তার খানিকটা দূর থেকে শুরু হয়েছে ছোট ছোট গ্রাম। প্রয়োজনের সময় এই ছোট গ্রামগুলোতে সেনাবাহিনীর এক একটা অংশ বাস করতে পারে। গ্রামের দুই মাইল উত্তরে রয়েছে অশ্বক্ষুরাকৃতি একটা ছোট পাহাড় যার সাথে পরিচিত হওয়াটা আমাদের ভাগ্যে লেখা ছিল। বড় এক লোকালয়কে দুভাগে ভাগ করেছে একটা নদী। কিছুটা দূরত্বের ব্যবধানে যার ওপর কয়েকটা সেতু আছে। পাহাড়ের ওপর থেকে আমরা একই ধরনের ছবি দেখেছিলাম। গ্রাম থেকে ষাট-সত্তর মাইল দূরে রয়েছে তিনটা বরফ-ঢাকা পাহাড় যেগুলোর অবস্থান এমনই যে কাল্পনিক রেখা দিয়ে যুক্ত করলে একটা ত্রিভুজের আকৃতিতে পরিণত হবে। 'শেবার স্তন' নামের শৃঙ্গদ্বয়ের সাথে এই পাহাড়ের তফাৎ হল, প্রথম দুটো ছিল বর্তুলাকার ও মসৃণ কিন্তু ত্রিমূর্তি ছিল একেবারে খাড়া।

ত্রিমূর্তিকে যখন আমরা গভীর আগ্রহ সহকারে দেখছি তখনই ইনফাদুসকে বলতে শোনা গেল, 'সলোমনের রাজপথ ওখানেই শেষ হয়েছে। কুকুয়ানারা ঐ তিনটে পাহাড়কে তিন ডাইনি নামে ডাকে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'রাস্তাটা ওখানে শেষ হবার কারণ কী?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বুড়ো ইনফাদুস বলল, 'তা বলতে পারব না। ঐসব পাহাড়ে অসংখ্য গুহা আছে এবং একটা

বিরাট খাদ আছে। এই দেশে তারা কেন বাস করতে এসেছে তা জানবার জন্য এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাবার জন্য অতীত দিনে বিজ্ঞ জনেরা ঐ তিন মূর্তির কাছে যেত। ওখানে মৃত্যুপুরীতে আমাদের রাজাদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়।'

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'তুমি যে বললে মানুষ কেন এই দেশে বাস করতে এসেছিল তা জানবার জন্য বিজ্ঞ লোকেরা ওখানে যেত, এই প্রশ্নের উত্তর তারা কি পেয়েছিল?'

মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সে জবাব দিল, 'আমি অত শত জানি না, আপনারা তো তারকাদের দেশ থেকে এসেছেন, আপনারা ভাল জানবেন।' আমার মনে হল, ইনফাদুস যেটুকু বলল তার চেয়েও অধিক তার জানা আছে।

আমিও ছাড়বার লোক নই। আমি বললাম, 'তারকাদের দেশে থাকলে অনেক কিছু জানা যায়। আমি তো শুনেছি, তোমাদের পূর্ব পুরুষরা চকচকে পাথর, হলুদ রঙের লোহা ইত্যাদি পাবার আশায় এখানে এসে বাস করতে শুরু করেছিল।'

ইনফাদুস আসল ব্যাপারটা চেপে যাওয়ার জন্য বলল, 'আপনি অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি; তুলনায় আমি খুবই অজ্ঞ। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমি কি আপনার সাথে আলোচনা করতে পারি? তবে হ্যাঁ, বুড়ি গাগুলের সাথে কথা বললে আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন। ওকে আপনি রাজবাড়িতে পাবেন।' আর কথা না বাড়িয়ে বুড়ো ঐ স্থান পরিত্যাগ করল।

সে চলে যাওয়ার পর আমি সঙ্গীদের বললাম, 'ঐ যে তিন মূর্তি নামের পাহাড়গুলো দেখছ ওখানেই রয়েছে সলোমনের হিরার খনি।'

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উমবোপা নিজের মনে কিছু যেন চিন্তা করছিল। আমার কথাটা কানে যাওয়ায় সে জুলু ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'হুজুর ঠিক কথাই বলেছেন, ঐ পাহাড়ের কোথাও হিরা অবশ্যই আছে এবং আপনারা তা পেয়ে যাবেন। আমি তো জানি, শ্বেতকায় ব্যক্তিরা টাকা ও খেলনা খুব পছন্দ করেন।'

উমবোপার এই রহস্যময় কথাবার্তা আমার খুব পছন্দ হল না। আমি প্রশ্ন করলাম, 'তোমার এই ধারণার কারণ কী, উমবোপা?'

সে হেসে উত্তর দিল, 'স্বপ্নে আমি সব জেনেছি।' আর কথা না বাড়িয়ে সেও অন্যত্র চলে গেল।

স্যার হেনরি মন্তব্য করল, 'আমাদের কৃষ্ণাঙ্গ বন্ধু যা বলল তার চেয়েও ঢের বেশি জানে মনে হল। আচ্ছা, কোয়ার্টারমেইন, ও কি আমার ভাইয়ের সম্বন্ধে কিছু জানে বা তাকে কি দেখে থাকতে পারে?'

আমি উত্তর দিলাম, 'তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে ও কিছুই জানে না। যার সাথে ওর এখানে পরিচয় হয়েছে তাদের সকলের কাছেই ও এই খবর সংগ্রহের চেষ্টা করেছে কিন্তু সবাই একই উত্তর দিয়েছে যে কোনো শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিকে তারা এই এলাকায় দেখেনি।'

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'আমরা তো দৈবক্রমে এখানে এসে পৌঁছেছি। তোমার ভাই কি মানচিত্র ছাড়াই এখানে চলে এসেছিল বলে তোমার মনে হয়?'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে স্যার হেনরি বলল, 'তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এই এলাকায় আমি তাকে ঠিক খুঁজে বের করব।' সূর্য অস্ত গেল এবং অতি দ্রুত অন্ধকার নেমে এল। দিনের আলোর সমাপ্তি মানেই রাত্রির অন্ধকারের সূচনা। গোধূলি বেলা

এখানে নেই। জীবনের শেষে মৃত্যু যেমন অপরিবর্তনীয় এবং ক্ষিপ্র, এই অঞ্চলে দিনের শেষ ও রাত্রির শুরু সেই একই রকম। সূর্য অদৃশ্য হওয়া মাত্রই সারা পৃথিবীটা কালো ছায়ার পোশাক পরিধান করল। তবে সেই অবস্থা বেশিক্ষণ থাকল না। খানিক পরে পশ্চিম দিগন্তে একটা আভা দেখা গেল এবং আরো একটু পরে চাঁদের রূপালি আলোয় চরাচর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমরা এই পট পরিবর্তনের খেলা দেখলাম। এতক্ষণ মাথার ওপরে তারাগুলোকে খুব চকচকে লাগছিল, এখন চাঁদের আলোয় সেগুলো নিষ্প্রভ হয়ে গেল। নৈসর্গিক সৌন্দর্য আমাদের মন আনন্দে ভরিয়ে দিল। আমার জীবনে কমনীয়তার ছোঁয়া খুব কমই লেগেছে কিন্তু জীবনে যে গুটি কয়েক অতি রমণীয় জিনিস পেয়েছি তার একটি হল কুকুয়ানাদের দেশে চন্দ্রোদয়ের দৃশ্য।

বিনয়ী বন্ধু ইনফাদুসের কথায় আমাদের ধ্যান ভাঙল। সে বলল, 'প্রভুরা যদি ক্লান্ত বোধ না করেন তাহলে আমরা লু যাওয়ার জন্য প্রস্তুত-হতে পারি। আপনাদের রাত্রিবাসের জন্য ওখানে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন চাঁদ উঠে গিয়েছে, রাস্তায় চলতে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।'

তার কথায় সম্মতি জানিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই লু লোকালয়ের প্রবেশ দ্বারে পৌছে গেলাম। সেনা ছাউনির বাইরে সৈনিকরা আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল। এত জায়গায় আগুন জ্বলছিল যে গুনে শেষ করা যাবে না। ক্যাপ্টেন গুড মজার কথা বলে লোক হাসাতে ভালোবাসে যদিও তার কথার মধ্যে বুদ্ধির ছাপ কদাচিৎ দেখা যায়। চারিধারে অত আগুন মানে অত শত সেনা ছাউনি দেখে সে মন্তব্য করল : এই লু যে দেখি অসীম ও অন্তহীন। প্রবেশদ্বারের কাছে পরিখার ওপর একটা মানুষে টানা সেতু ছিল। সেতুর এপাশে গিয়ে দাঁড়ালে ওপাশের সৈনিক আমাদের পরিচয় জানতে চাইল। এপাশ থেকে ইনফাদুস সাংকেতিক শব্দটি উচ্চারণ করতে পাহারাদার আমাদের পরিচয়ে সন্তুষ্ট হয়ে স্যালুট করল এবং সেতু নামিয়ে দিল। এরপর আমরা শহরের রাস্তায় পা রাখলাম এবং আধঘণ্টা পরে চুনামাটির প্রলেপ দেওয়া একটা কুটিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ইনফাদুস আবার বিনয়ের সঙ্গে জানাল যে, এই সেই কুটির যেখানে আমাদের রাত্রিবাসের আয়োজন করা হয়েছে। ভিতরে ঢুকে দেখলাম আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা করে কুটির বরাদ্দ করা হয়েছে। ঘরের ভিতর সুগন্ধি ঘাসের বিছানা করা আছে এবং ঘাসের ওপর একটা শুকনো পশু-চামড়া চাদর হিসাবে পাতা আছে। এক পাশে মাটির কলসিতে পানি রাখা ছিল। হাত মুখ ধোওয়া হয়ে গেলে সুন্দর চেহারার কয়েকজন যুবতী কাঠের থালায় খাবার সাজিয়ে নিয়ে এল। কুর্নিশ করে তারা আমাদের সামনে খাবারের থালাগুলো রাখল।

খাওয়া শেষ হলে আমরা বললাম আমরা সকলে একটা কুটিরেই থাকব এবং সেই মতো অন্য কুটির থেকে বিছানাগুলো তুলে আনতে অনুরোধ করলাম। আমাদের চাল চলন দেখে যুবতীদের সে কী প্রছন্ন হাসি! বিছানায় বসতেই আমরা গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম।

পরের দিন সকালে একটু দেরিতে ঘুম ভাঙলে দেখি আমাদের বিছানার পাশে কয়েকজন অল্প বয়সি মেয়ে কুণ্ঠাহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। জানতে পারলাম, আমাদের 'তৈরি করিয়ে' বাইরে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

তাদের কথা শুনে ক্যাপ্টেন গুড তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল, 'আরে আমার শরীরে তো আছে একটি জামা আর পায়ে আছে জুতা। আমাকে এরা কীভাবে তৈরি করাবে? ভাই কোয়ার্টারমেইন, তুমি ওদের বলো না, আমার প্যান্ট এনে দিতে।'

মেয়েদের একজন উত্তর দিল, 'কোথায় পাব ওনার প্যান্ট! সেটা তো রাজার কাছে স্মারক হিসাবে পাঠানো হয়েছে। রাজা তো বিকালে আপনাদের সাথে দেখা করবেন, তখন প্যান্টের কথা তাকে বলবেন।'

আমরা নিজেরাই তৈরি হয়ে নিতে পারব জানিয়ে মেয়েদের বাইরে যেতে বললে তারা খুব বিস্মিত এবং হতাশ হল। তারা চলে গেলে ক্যাপ্টেন গুড তার ডানদিকের গোঁফ কাটতে শুরু করতেই আমরা বাধা দিলাম। আগে তো সে কেবল বাঁ দিকের দাড়ি ও গোঁফ কেটেছিল, দু-একদিনের ব্যবধানে সেই দিকটাতে বেশ কিছু চুল গাজিয়েছিল। তৈরি হবার জন্য আমরা হাত মুখ ধুয়ে মাথার চুল আঁচড়ে নিলাম। স্যার হেনরির সোনালি চুল তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল এবং তাকে অতীত দিনের ডেনমার্কের লোকের মতো লাগছিল। আমার মাথার চুল সাধারণত ছোট থাকে তবে এই কয়েক দিনে তা বেশ বেড়ে গিয়েছিল।

প্রাতরাশ শেষ করে ধূমপানের জন্য সবে মাত্র পাইপ ধরিয়েছি এমন সময় ইনফাদুস এসে হাজির হল। সে একটি খবর নিয়ে এসেছে– আমরা ইচ্ছা করলে এখুনি রাজা টোয়ালার সাথে দেখা করতে পারি। রাজা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমরা জানিয়ে দিলাম আর একটু বেলা না বাড়লে আমরা রাজার সাথে দেখা করতে পারব না কারণ পথ শ্রমে আমরা ক্লান্ত। আমি মনে করি, অসভ্য জাতির লোকের কাছে সময়ের নিয়মানুবর্তিতা রাখতে নেই কারণ তাদের সাথে ভদ্র আচরণ করলে তারা মনে করে আমরা তাদের হয় ভয় করি, না হয় ভক্তি করি। আমাদের সাথে দেখা করতে রাজা টোয়ালা যতখানি আগ্রহী ছিল আমরাও ঠিক ততটাই ছিলাম। অন্তত এক ঘণ্টা দেরি করে তার কাছে যাব বলে আমরা স্থির করলাম। এই সময়টার মধ্যে রাজা ও তার সভাসদদের জন্য আমরা কিছু উপহার গুছিয়ে নিতে শুরু করলাম। ভেন্টভোগেল যে রাইফেলটা ব্যবহার করত সেটাই আমরা রাজাকে দেব ঠিক করলাম, রাইফেলের সাথে কিছু কার্তুজও দেব ঠিক হল। পুঁতিগুলো দেব রাজার পত্নীদের ও সভাসদদের। এই ধরনের কয়েকটা পুঁতি ইনফাদুস ও স্ক্রাগাকে দিয়েছিলাম এবং এই ধরনের সুন্দর জিনিস তারা আগে কখনো দেখেনি বলে মন্তব্য করেছিল। ঘণ্টা খানেক পর আমরা রাজার সাথে মিলিত হবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। ইনফাদুস চলল আগে আগে এবং সবার পিছনে কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে চলল উমবোপা।

কয়েকশো গজ হেঁটে আসার পর আমরা একটা বেশ বড় কুটিরের সামনে এসে থামলাম। এটাই হল রাজার বসতবাটি। গত রাতে থাকবার জন্য যে কুটির আমাদের দেওয়া হয়েছিল তার পঞ্চাশ গুণ বড় এই রাজবাটি। রাজবাটিকে ঘিরে রয়েছে কয়েক সারি কুটির, এগুলি রাজার পত্নীদের বাসস্থান। কেবল রাজবাড়িটাই ছয় কিংবা সাত একর জমির ওপর। রাজবাড়ির চারপাশে বিশাল একটা খোলা মাঠ, তবে আজ সেখানে প্রায় আট হাজার সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। মৃদু হাওয়ায় তাদের মাথায় গোঁজা পাখির পালক নড়ে উঠছিল। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল চকচকে বর্শা। আমরা যখন যোদ্ধাদের অতিক্রম করে রাজার কাছে যাচ্ছিলাম তখন তারা মূর্তির মতো

নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে ছিল; কেবল তাদের চোখ দুটি আমাদের চলার ছন্দের সাথে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিল।

রাজবাড়ির ঠিক সামনেই কয়েকটা কাঠের টুল রাখা ছিল। ইনফাদুসের ইঙ্গিতে আমরা টুলের ওপর বসলাম। উমবোপা অবশ্য আমাদের পিছনে দাঁড়িয়েই থাকল। এতগুলি লোক উপস্থিত থাকলেও সেখানে সম্পূর্ণ নীরবতা বজায় ছিল তবে আমরা যে আট হাজার জোড়া চোখের কৌতূহলের বস্তু তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। দ৷ মিনিট অপেক্ষা করবার পর রাজবাড়ির সদর দরজা খুলে যে বেরিয়ে এল তাকে ম৷নুষ না বলে দৈত্য বলাই ভাল। তার কাঁধের ওপর একটা বাঘের চামড়া ভাঁজ করে রা৷ ছিল। রাজার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এল তার ছেলে স্ক্রাগা এবং পশুলোমের জামা পরা একটা বাঁদর। রাজা টোয়ালা আমাদের পাশে একটা টুলে বসল, তার ছেলে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল, বাঁদরটা চার হাতে পায়ের ওপর ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অদূরে একটা ঘরের ছায়ায় গিয়ে বসল।

অত লোক থাকলেও কোথাও কোনো শব্দ নেই। এবার দৈত্যাকার লোকটা কাঁধ থেকে বাঘছালটা নামিয়ে ফেলে বুক চিতিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়াল। ওহ্ কী বিশাল চেহারা! কী বীভৎস চেহারা! লোকটার ঠোঁট দুটো নিগ্রোদের মতো পুরু, চ্যাপ্টা নাক, একটাই চোখ, অন্য চোখের জায়গায় একটা বড় গর্ত। এক নজরেই বোঝা যায় লোকটা হিংস্র ও দেহসর্বস্ব। তার মাথায় উটপাখির সাদা পালকের টুপি, ডান হাঁটুতে সাদা ষাঁড়ের লেজ এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের অস্ত্র বাঁধা ছিল। তার ডান হাতে ধরা ছিল একটা বিশাল বর্শা এবং কপালে ঝুলছিল একটা অনুজ্জ্বল হিরা।

এত কিছু ঘটলেও নীরবতা ভঙ্গ হল না। তবে এবার হল। আমরা যাকে যথার্থভাবেই রাজা মনে করেছিলাম সে যখন হাতের বর্শাটা ওপরের দিকে তুলে ধরল সঙ্গে সঙ্গে তখন আট হাজার বর্শা অনুরূপভাবে ওপরের দিকে উঠল এবং আট হাজার কণ্ঠ 'কুম' বলে পর পর তিনবার গর্জে উঠল, সেই গর্জনের সাথে কেবল মেঘের গর্জনেরই তুলনা চলে। ছায়ায় বসে থাকা বাঁদরটা এই সময় বলে উঠল, 'তোমরা বল, রাজার জয় হোক।'

সাথে সাথে আবার আট হাজার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল, 'তোমরা বল, রাজার জয় হোক।'

আবার নীরবতা; অখণ্ড নীরবতা। একটা ঘটনায় আকস্মিকভাবে এই নীরবতা টুটে গেল। আমাদের বাঁ দিকের একটা সৈনিকের হাত থেকে তার ঢালটা মাটিতে পড়ে যেতেই ময়দানের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। শব্দটা যেদিক থেকে এল সেদিকে তাকিয়ে টোয়ালা খুব শান্ত কণ্ঠে বলল, 'এই যে তুই, তোকে বলছি, এদিকে আয়।'

সারি দিয়ে দাঁড়ানো সৈনিকদের মধ্য থেকে একজন সুদর্শন যোদ্ধা বেরিয়ে এসে রাজা টোয়ালার সামনে দাঁড়াল। রাজা বলল, 'তোর হাত থেকে ঢালটা পড়ে গেল, তাই না রে কুত্তা? তোর অসতর্কতার জন্য তারকাদের দেশ থেকে আগত এই বিদেশীদের সামনে আমার নাক কাটা গেল! বল, কেন এমন হল?'

রাজার ধমকানি শুনে ঐ যুবকের মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেল। কোনোরকমে সে উত্তর দিল, 'আমি ইচ্ছা করে ওটা ফেলে দিইনি, ঘটনাচক্রে পড়ে গিয়েছে।'

টোয়ালা বলল, 'ঘটনাচক্রে শাস্তিটাও তোকে পেতে হবে। তুই আমাকে অপদস্থ করেছিস, তোকে এর মূল্য দিতে হবে, মূল্য মানে মৃত্যু।'

সৈনিক খুব নিচু গলায় বলল, 'আমি আপনার অনুগত দাস।' টোয়ালা যেন তার কথা শুনতেই পেল না, ষাঁড়ের মত চিৎকার করে সে ছেলেকে বলল, 'স্ক্রাগা, দেখি, তুই কেমন বর্শা ছুড়তে শিখেছিস, এই কুকুরটাকে এই মুহূর্তে শেষ করে দে।'

স্ক্রাগার ঠোঁটে একটা অশুভ হাসির তরঙ্গ বয়ে গেল এবং হাতের বর্শাটা উঁচু করে সে সামনের দিকে এল। এখন তার লক্ষ্য হল অসাবধানী ঐ সৈনিকের ছাতি। অসহায় সৈনিক হাত দিয়ে নিজের চোখ ঢেকে নিল। কী ঘটতে চলেছে ভেবে আমরাও হতবাক হয়ে গেলাম।

হাতে বর্শাটা নাচাতে নাচাতে স্ক্রাগা চিৎকার করতে লাগল, 'এক, দুই।' চোখের পলক ফেলতে ফেলতে সৈনিকের বুক ফুঁড়ে বর্শার ফলাটা ওপারে চলে গেল। লোকটা দুবার হাত ঘোরাল, তারপর তার প্রাণহীন দেহটা মাটিতে ধপাস করে পড়ে গেল। উপস্থিত আট হাজার সৈনিকদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল তবে সে কয়েক মুহূর্তের জন্য। আবার সব চুপচাপ হয়ে গেল। ঘটনার অমানবিকতায় স্যার হেনরি এত বিচলিত হয়ে উঠল যে উঠে দাঁড়িয়ে সে মনের জ্বালা প্রকাশ করল। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে একটু পরেই সে চুপ করে বসে পড়ল।

রাজা টোয়ালা মন্তব্য করল, 'হাতের টিপ বটে আমার খোকার! এই মড়াটাকে এখান থেকে টেনে নিয়ে যা তোরা।'

ওপাশ থেকে নাকী সুরে বাঁদরটা বলে উঠল, 'যে জায়গা থেকে রক্ত বের হচ্চে ওখানে কিছু একটা লাগিয়ে দে না। রাজা তো তার কাজ করেচে, বাকিটুকু তোরা কর।'

কুটিরের পিছন থেকে এক যুবতী গুঁড়ো চুন ভর্তি একটা কৌটো হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে মৃত সৈনিকের শারীরিক ক্ষতের ওপর চুনের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিল। এর ফলে দৃশ্যের ভয়াবহতা খানিকটা কমে গেল।

চোখের সামনে এত নৃশংস ঘটনা ঘটতে দেখে স্যার হেনরির মাথা গরম হয়ে যেতে লাগল। তাকে ঠান্ডা রাখতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হল। আমি নিম্নস্বরে বললাম, 'আমাদের কথা চিন্তা করে চুপ করে বসে থাকো।'

আমাদের অনুরোধে কাজ হল। স্যার হেনরি শান্ত হয়ে বসল। রাজা টোয়ালাও নীরবে বসে ছিল। ইতিমধ্যে মৃতদেহটা ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল কয়েকজন লোক।

টোয়ালা আমাদের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'হে শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিগণ, তোমরা কোথা থেকে এসেছ বা কেন এসেছ তা আমি জানি না। তবে তোমাদের আমি স্বাগত জানাই।'

প্রত্যুত্তরে আমিও রাজাকে আমাদের শুভেচ্ছা জানালাম। টোয়ালা জানতে চাইল, 'তোমরা কোন দেশ থেকে এবং কীসের খোঁজে এখানে এসেছ?'

আমি জানালাম, 'তারকাদের দেশ থেকে আমরা এসেছি এবং এই দেশটা ঘুরে বেড়িয়ে দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য।'

টোয়ালা আমার কথা শুনে খুব অবাক হয়েছে মনে হল। তারকাদের দেশ থেকে কোনো লোক এইরকম ছোট একটা জায়গা দেখতে আসবে তা সে ভাবতেই পারছিল না। উমবোপার দিকে ইঙ্গিত করে সে জানতে চাইল, 'এই লোকটাও কি তারকাদের দেশ থেকে এসেছে?'

আমি তাকে বললাম, 'শোন টোয়ালা, যে সব জিনিস তুমি বোঝ না সে সব নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করো না। তবে শুনে রাখো, মহাকাশের দেশে তোমার মতো কৃষ্ণকায় ব্যক্তিও অনেক আছে।'

ঠোঁট উল্টে টোয়ালা উত্তর দিল, 'হতে পারে তুমি তারকাদের দেশ থেকে এসেছ কিন্তু মনে রেখো, সেই দেশ এখান থেকে অনেক দূরে, বর্তমানে তোমরা আমার দেশে আছ। তাই সাবধান করে দিচ্ছি, বেশি উঁচু গলায় কথা বলো না।'

তার উত্তর শুনে আমার বুকের ভিতর শুকিয়ে গেলেও আমি কিন্তু সাহস দেখাবার জন্য জোরে হেসে বললাম, 'হে টোয়ালা, গরম পাথরের ওপর দেখে শুনে পা ফেল নতুবা পা পুড়ে যাবে। বর্শা ধরবার সময় হাতলেই হাত রাখো নতুবা হাত কেটে যাবে। আমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করলে তোমার ধ্বংস কেউ আটকাতে পারবে না।' স্ক্রগা ঐ সময় তার হাতে নিহত হওয়া সৈনিকের রক্তের দাগ পরিষ্কার করছিল। ছেলেটা একটা সাক্ষাৎ শয়তান। আমি স্ক্রগা ও ইনফাদুসকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'ওরা দু'জন কি তোমাকে আমাদের শক্তি ও সামর্থ্যের কথা বলেনি? তোমরা কি ইতিপূর্বে আমাদের মতো লোক দেখছ নাকি? ক্যাপ্টেন গুডের মতো আর কাউকে কি দেখেছ যার স্বচ্ছ ও গোল চোখ আছে?'

আমার কথা শুনে ক্যাপ্টেন গুডকে খুব ভালভাবে নিরীক্ষণ করে টোয়ালা জানাল এই ধরনের লোক সে আগে দেখেনি।

তখন আমি আবার প্রশ্ন করলাম, 'ওরা কি তোমাকে বলেনি যে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমরা অন্যকে মেরে ফেলতে পারি?'

টোয়ালা বলল, 'ওরা সে কথা আমাকে জানিয়েছে তবে নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করি না। প্রমাণ দিলে নিশ্চয়ই মেনে নেব তোমাদের ক্ষমতা। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোককে নির্দেশ করে রাজা বলল, 'কই দেখি, মেরে ফেল তো ওকে।'

আমি বেশ জোর দিয়ে বললাম, 'নরহত্যা আমরা অকারণে করি না, সুবিচারের জন্য যখন মৃত্যুদণ্ডের প্রয়োজন হয় তখনই আমরা অন্যের প্রাণ সংহার করি। প্রমাণ যদি নিতে চাও তাহলে তোমার যে কোনো লোককে বল একটা ষাঁড় নিয়ে পরিখার ওপারে দাঁড়াতে। পশুটাকে ওখানে দাঁড় করিয়ে তোমার লোক কুড়ি পা যাওয়ার আগেই আমি এখান থেকে ষাঁড়টাকে মেরে ফেলব।'

টোয়ালা বোধ হয় জীবনে প্রথমবার হাসল। সে বলল, 'মানুষ মারো, তবে না বিশ্বাস করব।'

আমি বললাম, 'তাহলে একটা কাজ কর, তুমি স্বয়ং ফাঁকা জায়গাটার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াও। আমি এখান থেকে কীভাবে তোমাকে মাটিতে শুইয়ে দেব তা সকলে দেখুক। যদি নিজে না যেতে চাও তাহলে তোমার খোকাবাবু অর্থাৎ স্ক্রগাকে পাঠিয়ে দাও আর তুমি এখান থেকে তার শেষ পরিণতি দেখ।' সত্যি কথা বলতে কী, টোয়ালা যদি আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে ছেলেকে ওপাশে পাঠাত তাহলে আমি বড়ই আনন্দ পেতাম।

আমার প্রস্তাব শুনে শয়তানরূপী খোকাবাবু এক ছুটে কুটিরের ভিতরে প্রবেশ করে দরজায় খিল আটকে দিল।

ছেলের এই ধরনের কাপুরুষের মতো আচরণ দেখে টোয়ালার কপালে ভাঁজ পড়ল। সে তখন একটা ষাঁড় আনবার হুকুম দিল। রাজার আদেশ পেয়ে দুটো লোক ছুটে বেরিয়ে গেল।

আমি বললাম, 'স্যার হেনরি, ষাঁড়টাকে গুলি করে তুমি মারবে কারণ আমি ওদের বুঝিয়ে দিতে চাই যে আমাদের দলের প্রত্যেকেই এক একজন মহা শক্তিধর।'

স্যার হেনরি রাইফেল হাতে নিয়ে গুলি ছোড়ার জন্য প্রস্তুত হল। সে বলল, 'মনে হয় আমি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হব না।'

আমি বললাম, 'লক্ষ্য ভেদ করতে তুমি ওস্তাদ, তবে দেড়শো গজ দূরে নিশানা করবে এবং ষাঁড়টাকে যখন আড়াআড়িভাবে দেখতে পাবে তখনই বন্দুকের গুলি চালাবে।'

একটু পরেই দেখলাম, একটা ষাঁড় আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে। হঠাৎ এত লোক দেখে পশুটা থমকে গেল। তারপর পরিখার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটা ডাক ছাড়ল। স্যার হেনরিকে বললাম, 'এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়, চালাও গুলি।'

প্রাণীটার পাঁজরে গুলি লাগতেই সে মাটিতে পড়ে গিয়ে কয়েকবার পা ছুড়ল। তারপর সব শেষ। আমাদের ক্ষমতা দেখে কয়েক হাজার লোক একেবারে চুপসে গেল।

এবার আমাকে আর পায় কে? আমি জোর গলায়, বললাম, 'দেখলে তো, আমি কি মিথ্যা কথা বলেছিলাম?'

টোয়ালা ভীত কণ্ঠে বলল, 'আমি তো নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

আমি খুব শান্তভাবে বললাম, 'দেখ, তোমাদের সাথে লড়াই করবার জন্য আমরা আসিনি। আমরা এসেছি সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়তে।'

একটা বন্দুক হাতে নিয়ে আমি টোয়ালাকে বললাম, 'এই জিনিসটা আমি তোমাকে দেব। আমরা যেমন একটু আগে একটা ষাঁড় মারলাম তুমিও পারবে এটা দিয়ে শিকার করতে। আমি এর মধ্যে জাদু মন্ত্র ঢুকিয়ে দেব জাদুর রহস্যটাও তোমাকে বলে দিই– এটা দিয়ে তুমি কখনো মানুষ হত্যা করার চেষ্টা করবে না। করলে এই জিনিস তোমাকেই হত্যা করবে। তোমার একজন লোককে বল চল্লিশ পা দূরে একটা বর্শা গেঁথে রেখে আসুক। এই নল ব্যবহার করে বর্শাটা আমি ভেঙে দেব।'

বর্শা রাখা হলে গুলি চালিয়ে বর্শাটাকে আমি ভেঙে ফেলতেই রাজা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। বন্দুকটা তার হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'টোয়ালা, এই জাদু নলটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম। এটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা আমি তোমাকে ধীরে ধীরে শিখিয়ে দেব। কিন্তু সাবধান, এই নল দিয়ে নরহত্যার চেষ্টা করলে তোমার সমুহ বিপদ হবে।'

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমার দেওয়া উপহারটি গ্রহণ করে রাজা সেটিকে নিজের পায়ের কাছে রাখল। ওপাশে কুটিরের ছায়ায় বসে থাকা বাঁদরটা এবার হামাগুড়ি দিয়ে রাজার কাছে এসে পাশের টুলে বসল। বাঁদরটা নিজের শরীরে জড়ানো চাদরটা সরাতেই আমরা তার মুখ দেখতে পেলাম। মানুষের মুখ যে এইরকম হতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। মুখটা এক নারীর কিন্তু তার বয়স কয়েক শতাব্দী হয়ে যাওয়ার জন্য মুখটা শুকিয়ে একেবারে এক বছরের শিশুর মতো ছোট হয়ে গিয়েছে। তার ওপর অসংখ্য বলিরেখা মুখের চামড়াকে নানা দিক থেকে কাটাকুটি করেছে। এই কোঁচকানো চামড়ার ভাঁজেই কোথাও বসানো রয়েছে এক জোড়া চোখ, কোথাও ছোট্ট চিবুক ও ঠোঁট। নাক বলতে ছোট একটা গর্ত এবং তার ওপর রয়েছে একেবারে সাদা দুটো ভুরু। তার উপরিভাগে রয়েছে তুলোট কাগজের

মতো কেশহীন একটা মাথা। মাথার খুলির হলুদ চামড়া গোখরো সাপের ফণার মতো আপনা আপনিই সংকুচিত ও প্রসারিত হচ্ছিল।

এইরকম এক মানবীকে দেখে একটা হিমেল স্রোত আমাদের শির দাঁড়া বেয়ে নিচে নামল। এবার তার হাতখানা দেখলাম। কলমের মতো সরু হাতটা কিন্তু আঙ্গুলে প্রায় ইঞ্চি খানেক লম্বা এক একটা নখ যাকে নখর বলাই ভাল। রাজার কাঁধে হাত রেখে এই নারী বলতে শুরু করল–

'সবাই শোন, রাজা শোন, যোদ্ধা শোন, পর্বত, নদী, সমভূমি, কুকুয়ানাদের স্বদেশবাসী সকলে শোন, আকাশ শোন, আদিত্য শোন, কুহেলি শোন, ঝড় শোন, বৃষ্টি শোন। যুবক, যুবতী, নারী, পুরুষ সবাই শোন! দেশের অজাত সন্তানরা শোন। যারা জীবিত কিংবা মরণশীল তারা শোন! যারা অতীতে জীবিত ছিলে এবং পুনর্বার জন্মাবে এবং পুনরায় মারা যাবে তারা সকলে শোন! তোমরা মন দিয়ে শোন, প্রাণের তেজ আমার মধ্যে বিদ্যমান এবং আমি ভবিষ্যদ্বানী করছি... করছি... করছি!'

বুড়ির কথাগুলো ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে গেল। তার কথার শেষে আমি যেন বিষাদের সুর শুনতে পেলাম। আমরা তো বটেই, তার দেশের লোকেরা পর্যন্ত যারা তার কথা শুনল ভয়ে কেঁপে উঠল।

বুড়ি নাকী গলায় বলতে লাগল :

'রক্ত, রক্ত, রক্ত! চতুর্দিকে শোণিত ধারা, রুধিরের প্রবাহ! আমি যে রক্ত দেখতে পাচ্ছি, রক্তের স্বাদ পাচ্ছি, রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। নোনতা স্বাদ! মাটির ওপর দিয়ে লাল স্রোত গড়িয়ে চলেছে। আকাশ থেকে রক্তের ধারা ঝরে পড়ছে।'

'পদধ্বনি! পদধ্বনি। পদধ্বনি। দূর দেশ থেকে যাদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে তারা আমাদের মতো দেখতে নয়, তাদের গায়ের রঙ সাদা, পায়ের চাপে তারা পৃথিবীকে দলিত করছে, বসুন্ধরা তাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করছে।'

'রক্ত তো সুন্দর। লাল রক্তের বর্ণ কত উজ্জ্বল, তবে টাটকা রক্তের গন্ধের সাথে অন্য কোনো গন্ধের তুলনা! এই রক্ত পেলে সিংহ চেটে খাবে, সে শরীরে বল পাবে, এই রক্ত পেলে শকুন স্নান করবে এবং আনন্দে নাচ করবে।'

'আমার তো বয়স হয়েছে, আমি বুড়ি হয়েছি। কত রক্তই না আমি দেখলাম। হা, হা! তবে মৃত্যুর পূর্বে আমি আরো রক্ত দেখব, বড় আনন্দ হবে আমার! আমার কত বয়স হল বলতে পারো? তোমাদের বাবারা আমাকে দেখেছে, তাদের বাবারা, আবার তাদের বাবারাও আমাকে দেখেছে। একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিকে আমি দেখেছি, তার লালসাও দেখেছি। আমি তোমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড় কিন্তু পাহাড়গুলো আমার চেয়েও বয়সে অনেক অনেক বড়। তোমরা বলতে পারবে ঐ রাজপথ কে বানিয়েছিল? সুড়ঙ্গের দেওয়ালের ছবিগুলো কে এঁকেছিল বলতে পারবে? ঐ ধ্যান গম্ভীর 'ত্রিমূর্তি' পাহাড়কে কে গড়েছিল?' কথাগুলো বলে বুড়ি ঐ তিনটা পাহাড়ের দিকে আঙ্গুল তুলল যে পাহাড়গুলো গত রাতে আমরা দেখেছিলাম।

'তোমরা এইসব প্রশ্নের উত্তর জানো না, তবে আমি জানি। এই মুহূর্তে তোমরা যেখানে বাস করছ আগে সেখানে শ্বেতাঙ্গ লোকরা বাস করত। এখান থেকে যখন তোমাদের বাস উঠে যাবে শ্বেতাঙ্গ লোকেরা তখন এখানেই বাস করবে। তারা তোমাদের খাবে, তারা তোমাদের বিনষ্ট করবে।'

'তারা কেন এসেছিল এখানে, সেই শ্বেতকায় লোকেরা? সেই বিধ্বংসী লোকেরা যারা বিদ্যায় ও জাদুতে পারদর্শী, সাহসী এবং নিজ লক্ষ্যে স্থির? হে রাজা, তোমার শরীরে যে লোহার অস্ত্রশস্ত্র ঝুলছে তা কে তৈরি করেছিল? এর উত্তর তোমার জানা নেই কিন্তু আমার জানা আছে। আমি হলাম বিজ্ঞ, জাদু-পারদর্শী।'

কথা শেষ করে সে তার শকুনের মতো মাথাটি ঘুরিয়ে আমাদের দেখল।

আমাদের উদ্দেশে বলল, 'তারকাদের দেশ থেকে আগত হে শ্বেতকায় ব্যক্তিরা! তোমরা কীসের খোঁজে এখানে এসেছ? হারিয়ে যাওয়া মানুষের খোঁজে? তবে এখানে তাকে পাবে না কারণ বিগত বহু বছরে এই দেশে কোনো শ্বেতাকায় ব্যক্তি পা রাখেনি। হ্যাঁ, বহু কাল আগে একজন এসেছিল কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার পরেই সে মারা যায়। তোমরা চকচকে পাথরের অন্বেষণ করতে এসেছ, রক্তের নদী শুকিয়ে গেলে তা অবশ্যই পাবে, তোমরা যেখান থেকে এসেছ সেখানেই ফিরে যাবে, না আমার কাছেই থাকবে? হা, হা!'

উমবোপার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর তুই! কালা আদমি হয়েও তোর চোখে মুখে এত অহংকারের ছাপ কেন রে? কে তুই? মনে হচ্ছে, তোকে আমি চিনি। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয় বাছা! তোর নাভির ওপর থেকে কাপড়টা একটু সরা তো।'

কথা বলা তখনও বাকি ছিল কিন্তু হঠাৎ বুড়ির শরীরে কাঁপুনি এল এবং সে মাটিতে পড়ে গেল। অন্যেরা তাকে তুলে নিয়ে কুটিরের ভিতর চলে গেল। মনে হল, বুড়ি একটা মৃগী রোগী।

রাজাও যেন কাঁপতে শুরু করল। উঠে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় যোদ্ধাদের সে চলে যেতে বলল। মিনিট দশেক পরে ঐ খোলা মাঠের এক প্রান্তে বসে থাকলাম আমরা চারজন, রাজা টোয়ালা ও তার কয়েকজন পরিচারক।

রাজা হঠাৎ বলল, 'মনের কথা বলে দেওয়াটা আমি উপযুক্ত বলে মনে করছি। আমি তোমাদের হত্যা করতে চাই। এ বিষয়ে তোমাদের মতামত কী? বুড়ি গাগুল বড় বিচিত্র সব কথা বলে গেল!'

আমি খুব এক চোট হেসে বললাম, 'রাজা, খুব সাবধান! আমাদের হত্যা করা খুব সহজ নয়। একটু আগে তো ষাঁড়ের দুর্গতি নিজের চোখেই দেখলে!'

ভুরু কুঁচকে টোয়ালা বলল, 'বটে, রাজাকে ভয় দেখানো!'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছি না। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটতে পারে তাই বললাম, এবার তুমি যা ভাল মনে কর, তাই করতে পারো।'

বিশালদেহী টোয়ালা কপালে হাত রেখে বেশ খানিক চিন্তা করে বলল, 'আমি চাই তোমরা শান্তিতে চলে যাও। তবে আজ রাতে নাচের আসর বসবে, তোমাদের নিমন্ত্রণ জানালাম। একটা কথা বলে রাখি, এই নিমন্ত্রণের পিছনে আমার কোনো কু-অভিসন্ধি নেই। তোমাদের সাথে কী আচরণ করা হবে তা নিয়ে আগামীকাল চিন্তা ভাবনা করব।'

মনে মনে ভয় পেলেও রাজাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা ঐ স্থান পরিত্যাগ করলাম। আমাদের সঙ্গে নিয়ে ইনফাদুস কুটির পর্যন্ত এল।

১০
ডাইনির খোঁজে

আমাদের জন্য সংরক্ষিত কুটিরে প্রবেশ করার মুখে আমি বললাম, 'ইনফাদুস, এসো, আমরা একটু কথাবার্তা বলি।'

বুড়ো ইনফাদুস আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ভিতরে এসে বসলে আমি বললাম, 'আমার ধারণা, তোমাদের রাজাটি খুব নির্দয়।'

সে উত্তর দিল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, তার অত্যাচারে সমস্ত প্রজা সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। আজ রাতেই আপনি স্বচক্ষে সব কিছু দেখতে পাবেন। আজ ডাইনিদের চিহ্নিত করা হবে এবং ফলস্বরূপ বেশ কয়েক জনের প্রাণ নাশ হবে। ধরুন, রাজা কারো গরু চায় অথবা অন্যের স্ত্রীকে চায় কিংবা রাজার মনে হল এই লোকটা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য অন্যদের প্ররোচনা দিচ্ছে তাহলে হনুমানের মতো দেখতে গাগুল নামের বুড়ি কিংবা তার কোনো শিষ্যাকে ডাকা হবে যারা গন্ধ শুকে বলে দেবে কোন কোন মানুষ ডাইনি। আজ রাতে চাঁদ ডুববার আগেই বেশ কয়েকজন মানুষ প্রাণ হারাবে। এই প্রথা বহুকাল ধরে চলে আসছে। এমনও হতে পারে, আমাকেই ডাইনি বলে চিহ্নিত করা হল। সে ক্ষেত্রে আমাকেও মেরে ফেলা হবে। তবে যেহেতু যুদ্ধ বিদ্যায় আমি খুব পারদর্শী এবং সৈন্যদের প্রিয়পাত্র তাই এতকাল আমাকে মরতে হয়নি। কতদিন যে বাঁচতে পারব তা বলা মুশকিল। তবে রাজা টোয়ালার নির্মমতার জন্য প্রজাদের মধ্যে একটা গোপন আক্রোশ আছে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'প্রজাদের যদি রাগ থাকেই তাহলে তারা সংগঠিত হয়ে রাজাকে ছুড়ে ফেলছে না কেন?'

বুড়ো বলল, 'টোয়ালা যাই করুক না কেন, সে তো রাজা। সে মারা গেলে তার ছেলে স্ক্রাগা সিংহাসনে বসবে। তবে বাবার চেয়েও ঢের বেশি নির্দয় তার ছেলে। যেদিন স্ক্রাগা রাজা হবে সেদিন থেকে আমাদের দুর্গতির সীমা থাকবে না। আগের রাজা ইমোতুকে যদি হত্যা না করা হত কিংবা তার ছেলে ইগনোসি যদি আজও বেঁচে থাকত তাহলে দেশের অবস্থা অনেক ভাল হয়ে যেত।'

পিছন থেকে একজন প্রশ্ন করল, 'তুমি কী করে জানলে যে ইগনোসি মারা গিয়েছে?' কে কথাটা বলল তা জানবার জন্য মুখ ফেরাতেই আমরা অবাক হয়ে গেলাম। প্রশ্নকর্তা হল উমবোপা।

ইনফাদুস প্রশ্ন করল, 'তোমার উদ্দেশ্যটা কী, বল তো ছোকরা? তুমি আমাদের আলোচনার মধ্যে ঢুকতে চাইছ কেন?'

কোনো দ্বিধা না করে উমবোপা বলল, 'ইনফাদুস, শোন একটা কাহিনী বলি। বেশ কিছুকাল আগে এই দেশেই রাজা ইমোতুকে মেরে ফেলা হয়েছিল এবং তার স্ত্রী রাজপুত্র ইগনোসিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এটা কি সত্যি?'

– হ্যাঁ, সত্যি।

– প্রচার হয়ে গিয়েছিল রানি ও রাজপুত্র দু'জনেই ঐ পাহাড়ের কাছাকাছি কোনো এক জায়গায় মারা গিয়েছে। তাই না?

– এটাও ঠিক।

– আসল ঘটনা হল, রানি ও রাজপুত্র মোটেই মারা যায়নি। ঐ পাহাড় অতিক্রম করবার পর তাদের সাথে এক দল ভবঘুরের দেখা হয়। তারা মা ও ছেলেকে মরুভূমির ওপাশে যেখানে ঘাস ও পানি আছে সেই দেশে পৌছে দিয়েছিল।

– তুমি এত কথা জানলে কী করে?

– বহু মাস পর তারা এমন একটা অঞ্চলে পৌছাল যেখানে আমাজুলু জাতির লোক বাস করে। তারা কুকুয়ানা জাতির একটা শাখা। যুদ্ধ করাই তাদের পেশা। কিছু বছর কাটবার পর রানি ওখানেই দেহত্যাগ করে। মা মারা যাওয়ার পর ছেলে ইগনোসি দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ালো। বিস্ময়ে ভরা শ্বেতাঙ্গদের দেশেও সে গিয়েছিল এবং সেই দেশে বাস করে অনেক কিছু শিখে এসেছে।

– তোমার কথা বাপু, আমার মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না।

– যা বলছি শোন, বহু বছর ধরে সেখানে থাকল সে। তাকে কখনো কাফিরের কাজ করতে হয়েছে, কখনো যুদ্ধ করতে যেতে হয়েছে, কিন্তু সর্বদা তার মন পড়ে থাকত তার নিজের দেশে। মায়ের মুখে কত গল্পই না সে শুনেছিল ঐ দেশ এবং ঐ দেশের লোকজন সম্পর্কে! সে চাইত তার মৃত্যুর আগে সে যেন একবার নিজের মাতৃভূমিকে দেখতে পায়। এই আশা নিয়ে সে বছরের পর বছর প্রতীক্ষা করেই গেল। অবশেষে তার স্বপ্ন পূরণের দিন এল। তার সাথে দেখা হয়ে গেল কয়েকজন শ্বেতাঙ্গের ঐ অজানা দেশ যাদের গন্তব্যস্থল। হারিয়ে যাওয়া এক আপন জনকে খুঁজবার জন্যই তারা চলেছে ঐ দেশে। ঐ শ্বেতাঙ্গরা তাকে নিজেদের দলে নিয়ে নিল। তারপর উত্তপ্ত মরুভূমি, হিম-পাহাড় পার হয়ে কুকুয়ানাদের দেশে এসে পৌছাল। সেখানেই তোমার সাথে তাদের সাক্ষাৎ হল, হে ইনফাদুস।'

বুড়ো সৈনিক বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'কী সব কথা বলছ! এ যে পাগলের প্রলাপ!'

উমবোপা বলল, 'তুমি কি সত্যিই আমাকে পাগল বলে মনে করছ, কাকা? আমি তোমাকে প্রমাণ দেখাতে পারি। দেখ, আমিই ইগনোসি, আমিই এই দেশের প্রকৃত রাজা।'

কথাটা বলেই এক লহমায় সে উলঙ্গ হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়াল। সে বলল, 'দেখ, আমার নাভির পাশে উল্কি দিয়ে কী আঁকা আছে।' দেখলাম, একটা বিরাট সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে এবং লেজটা নিজের মুখে ভরে ফেলেছে।

উল্কিটাকে দেখিয়ে সে বলল, 'বল, এটা কী?' নাভির পাশে উল্কিটা দেখে ইনফাদুস এত আশ্চর্য হয়ে গেল যে তার চোখ দুটো গোল হয়ে গেল এবং হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সে মাটিতে বসে পড়ল।

উক্তির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'কুম! কুম! হ্যাঁ, এ আমার দাদার ছেলেই বটে, এই হল আমাদের সত্যিকারের রাজা।'

উমবোপা বলল, 'কাকা, তুমি উঠে দাঁড়াও, আমি তো এখন পর্যন্ত রাজা নই তবে তোমার এবং এই সাহসী শ্বেতাঙ্গদের সহায়তায় এক দিন রাজা হতে পারি। বুড়ি ডাইনি গাগুল একটা খাঁটি কথা বলেছে যে এই মাটিতে রক্তের নদী বইবে। সেই নদীতে বুড়ির রক্তও মিশবে অবশ্য তার শারীরে যদি ঐ লাল পদার্থটি এতটুকুও থাকে। ঐ বুড়ির কথাতেই আমার বাবাকে অকালে মরতে হয়েছে এবং মাকে এই দেশ থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছে। ইনফাদুস, এখন দুটোর মধ্যে একটা তোমাকে বেছে নিতে হবে। আমার সামনে অনেক বিপদ আছে। তুমি কি আমার হাতে হাত মিলিয়ে সেই বিপদের মোকাবিলা করবে, না খুনি ও অত্যাচারী টোয়ালার বশ্যতা স্বীকার করে আমৃত্যু মাথা ঝুঁকিয়ে থাকবে?'

বুড়ো নিজের মাথায় হাত রেখে চিন্তা করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে উমবোপা ওরফে ইগনোসির সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল।

ইগনোসির হাতে হাত রেখে সে বলল, 'তুমিই কুকুয়ানাদের প্রকৃত রাজা। তোমার হাতে আমি হাত রেখেছি এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তোমার অনুগত হয়ে থাকব। তুমি যখন একেবারে শিশু ছিলে তখন আমি হাঁটুর ওপর বসিয়ে তোমাকে নাচাতাম, আজ থেকে আমার দুই অশক্ত বাহু দেশের স্বাধীনতা ও তোমার সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হবে।'

উমবোপা দু'হাত দিয়ে ইনফাদুসকে তুলে ধরে বলল, 'সম্ভাব্য যুদ্ধে আমি বিজয়ী হলে তোমার স্থান হবে রাজার ঠিক পরেই আর যদি পরাজিত হই তাহলে তোমার জীবনের শেষ দিন খুব দূরে নয়।'

শ্বেতাঙ্গদের উদ্দেশ করে সে বলল, 'হে বন্ধুরা! আমি তোমাদের কী দিতে পারব? সাদা চকচকে পাথর চাও তোমরা? যদি আমি ক্ষমতায় আসি এবং ঐ রত্নাগার খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে তোমাদের খুশি মতো ঐ বস্তু এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে। তোমাদের কাছে এটা আমার শপথ।'

তার কথা অনুবাদ করে শোনালে স্যার হেনরির সম্মানে আঘাত লাগল। সে বলল, 'ওকে বলে দাও, ইংরেজদের চিনতে ওর ভুল হয়েছে। ধন দৌলত আমাদের কাছে কাম্য; পেলে তা নিই কিন্তু তার জন্য কোনো ভদ্রলোক নিজেকে বিক্রি করে দেয় না। উমবোপাকে আমার ভাল লেগেছে এবং তাকে সাহায্য করবার জন্য আমি সর্বদাই প্রস্তুত থাকব। অত্যাচারী টোয়ালাকে ধ্বংস করতে পারলে আমি আনন্দিত হব।'

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'লড়াই ঝগড়া হলে বুকের রক্ত চলাচল ভাল হয়। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, চাইলেই সে আমার সাহায্য পাবে তবে আমি হিরা চাইনা, আমার পরনের প্যান্টটি ফেরত পেলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে।'

অতীতের উমবোপা এবং বর্তমানের ইগনোসি আমাকে বলল, 'ওদের কথা তো শুনলাম, এখন তুমি কী বলছ? তুমি তো একজন পাকা শিকারি, আমি কি তোমাকে পাব আমার সাথে? তোমার বুদ্ধির প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।'

আমি মাথা চুলকে বললাম, 'দেখ, লড়াই, বিদ্রোহ আমার মোটেই পছন্দ নয়। আমি শান্তি ভালবাসি। বলতে পারো, আমি কাপুরুষ তবে আমি যাকে বন্ধু বলে

মনে করি, আমি তাকে পরিত্যাগ করি না। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, আমি একজন ব্যবসায়ী এবং আমাকে পরিশ্রম করে অর্থোপার্জন করতে হয়। তুমি রাজা হলে আমাদের হিরা নিয়ে যেতে দেবে বলে প্রস্তাব দিয়েছ, তোমার এই প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলাম। তবে আমাদের আর একটা লক্ষ্য আছে। তা হল, স্যার হেনরির হারিয়ে যাওয়া ভাইকে খুঁজে বের করা। এই ব্যাপারেও আমরা তোমার সাহায্য চাই।'

ইগনোসি উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করব। আচ্ছা ইনফাদুস, আমার নাভির পাশে যে সাপের ছবি আছে, তার নামে শপথ করে সত্যি কথাটা বল তো, এই অঞ্চলে কখনো কোনো শ্বেতকায় ব্যক্তিকে তুমি কি দেখেছ?'

– না, ইগনোসি, না, আমার জীবনে কাউকে এখানে দেখিনি।

– যদি কেউ এসে থাকত তাহলে কি সেই খবর তুমি পেতে?

– নিশ্চয়ই আমার অনুচররা আমাকে তা বলে দিত।

স্যার হেনরিকে উদ্দেশ করে ইগনোসি বলল, 'তোমার ভাই এদেশে আসেনি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্যার হেনরি বলল, 'বুঝতে পারছি, আমার ভাই এখানে আসেনি। আমাদের এত কষ্ট স্বীকার করাটা ব্যর্থ হল। যাই হোক, ঈশ্বরের ইচ্ছাই শেষ কথা।'

আলোচ্য বিষয়টা বেদনার বলেই আমি তা ঘুরিয়ে দিতে চাইলাম। আমি বললাম, 'ইগনোসি, রাজা হবার স্বর্গীয় অধিকার তোমরা আছে মানলাম, কিন্তু সেই অধিকারকে বাস্তবায়িত করবে কীভাবে?'

ইগনোসি এ ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করে ইনফাদুসের মত জানতে চাইলে সে বলল, 'হে অশনিপুত্র ইগনোসি, আজ সেই মহানৃত্য ও ডাইনি শনাক্তকরণের রাত। গন্ধ শুঁকেই কে ডাইনি তা বলে দেওয়া হবে এবং ডাইনির ওপর নেমে আসবে জল্লাদের খাঁড়া। রাজার বিরুদ্ধে কত লোকের মনে ফুঁসে উঠবে ক্ষোভ, কত লোকের মনে জ্বলে উঠবে শোক ও ব্যথার আগুন। নাচ শেষ হলে আমি কয়েকজন প্রধানের সাথে কথা বলব যদি তাদের নিজের দিকে টানতে পারি তাহলে তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন সেনাবাহিনীর সাথে কথা বলবে। তুমিই যে আমাদের আসল রাজা প্রধানদের সে কথা বোঝাব। আমার বিশ্বাস, কাল সূর্যোদয়ের আগে আমি অন্তত : বিশ হাজার যোদ্ধার সমর্থন লাভ করব। এখন আমি যাই রাত্রে নাচের শেষে যদি বেঁচে থাকি তাহলে আমি নিজে এখানে এসে তোমাদের সাথে আলোচনা করব। হয়ত আমাদের যুদ্ধ করতেই হবে।'

এই সময় রাজার দূত এসেছে শোনা গেল। সে আমাদের সাথে দেখা করতে চায়। তাকে ভিতরে নিয়ে আসার আদেশ দিলে দেখা গেল রাজার দূত হিসাবে তিনজন লোক এসেছ। তাদের শরীরে লাগানো আছে লোহার ঢাল এবং হাতে আছে বড় একটা কুড়াল।

রাজ প্রতিনিধিদের একজন বলল, 'তারকাদের দেশ থেকে আগত শ্বেতকায় মানুষদের জন্য রাজা এই উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছে।'

আমি বললাম, 'রাজাকে আমাদের ধন্যবাদ জানাবে। এখন তোমরা আসতে পারো।'

উপহারগুলো ছিল লোহার জালের তৈরি কয়েকটা বর্ম। কী সুন্দর হাতের কাজ! একটা পুরো বর্মকে দু'হাতের মুঠোয় ধরা যায়।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'ইনফাদুস, তোমাদের দেশে কি এই ধরনের বর্ম তৈরি হয়? এগুলো সত্যিই সুন্দর।'

সে উত্তর দিল, 'না, এসব জিনিস আমরা পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছি, কারা এসব জিনিস তৈরির কারিগর ছিল তা আমাদের জানা নেই। তবে কী জানেন, নতুন তৈরি হচ্ছে না বলে আমাদের ভান্ডার ক্রমশ কমে আসছে। রাজ পরিবারের লোক ছাড়া অন্য কারোর এই বর্ম পরিধান করবার অনুমতি নেই। এই বর্মের একটা জাদু শক্তি আছে। কেউ যদি এই বর্ম পরে থাকে তাহলে বর্শা তার শরীর ভেদ করতে পারবে না এবং রণক্ষেত্রে সে সুরক্ষিত থাকবে। এই উপহারগুলো রাজা পাঠিয়েছে দুটো কারণে– হয় সে ভীষণ ভয় পেয়েছে নতুবা সে তোমাদের ওপর খুব খুশি হয়েছে। আজ রাতে নাচের অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় ইস্পাতের তৈরি এই বর্মগুলো পরে নেবেন।'

আসন্ন ঘটনা নিয়ে আমরা প্রায় সারাটা দিন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম। সূর্যাস্তের পর অন্ধকার নেমে এলে কয়েক হাজার জায়গায় আগুন জ্বালানো হল এবং অন্ধকারের মধ্যেও অবিশ্রান্তভাবে সৈনিকদের পায়ের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। তারা চলেছে তাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াতে। একটু পরেই পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় বিশ্ব চরাচর যেন ঝলমল করে উঠল। সামরিক পোশাক পরে ইনফাদুস এল, সঙ্গে তার কুড়িজন যোদ্ধা, এরা এসেছে আমাদের সুরক্ষার জন্য। ইনফাদুসের অনুরোধে ইস্পাতের বর্মগুলো আমরা প্রথমে পরে তার ওপর আমাদের প্রাত্যহিক পোশাকটা গলিয়ে নিলাম। পরবার পর দেখলাম ইস্পাতের বর্ম মোটেই ভারি বা অস্বস্তিকর নয়। এই বর্মগুলো আমাদের চেয়েও বড় শারীরিক আকৃতির পুরুষদের জন্যই তৈরি হয়েছিল। সেদিক থেকে দেখলে আমার ও ক্যাপ্টেন গুডের শরীরে সেগুলো একটু ঢিলে হল। তবে স্যার হেনরির দসাসই চেহারার জন্য বর্মটা একেবারে মাপে মাপে হয়ে গেল। বর্মের ওপর জামা পরা হলে আমরা প্রত্যেকে একটা করে রিভলবার কোমরে গুঁজে নিলাম। রাজার পাঠানো বড় সড় কুড়ালটা হাতে নিয়ে আমরা এবার অনুষ্ঠান কেন্দ্রের অভিমুখে পা চালালাম।

সকালে যে ময়দানে আমরা রাজার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম সেইখানেই এবেলা অনুষ্ঠান হবে। প্রায় হাজার কুড়ি সৈনিক নানা দলে বিভক্ত হয়ে সারা মাঠটার চারপাশে সামরিক ভঙ্গিতে অবস্থান করছিল। এই দলগুলি আবার নানা উপদলে ভাগ করা ছিল। প্রতিটি উপদলের সামনে যাতায়াতের জন্য খানিকটা রাস্তা ছেড়ে রাখা হয়েছিল। ডাইনি শনাক্তকারীদের হাঁটবার জন্যই এই রাস্তা রাখা হয়েছিল। ডাইনি চিহ্নিত করবার জন্য ঐ পথ দিয়ে বেশ কয়েকবার যাতায়াতের প্রয়োজন হত শনাক্তকারীর। এত হাজার লোক নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল এবং চাঁদের আলোয় তাদের হাতে ধরা বর্শাগুলো চকচক করছিল।

ইনফাদুসের কাছে আমি জানতে চাইলাম, 'রাজার পুরো সেনাবাহিনী কি আজ এখানে সমবেত হয়েছে?'

উত্তরে সে বলল, 'না, এ হল পুরো সেনাদলের এক তৃতীয়াংশ মাত্র। নাচের অনুষ্ঠানে তিন ভাগের একভাগ সৈন্য মোতায়েন থাকে, আরেক ভাগ থাকে

লোকালয়ের সীমান্তে। এদের কাজ হল, ডাইনিদের হত্যা করবার সময় যাতে আইন শৃঙ্খলা বজায় থাকে তা সুনিশ্চিত করা। 'লু'-র নিরীক্ষণ স্তম্ভগুলিতে রাখা থাকে দশ হাজার সৈন্য এবং বাকী সৈন্যরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে লোকালয় পাহারা দেয়। এই সৈন্যদের নিয়মানুবর্তিতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।'

ক্যাপ্টেন গুড মন্তব্য করল, 'এত হাজার লোক এখানে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কেউ একটি কথা বলছে না। কী আশ্চর্য!'

ক্যাপ্টেন গুড কী বলছে ইনফাদুস তা জানতে চাইলে আমি তর্জমা করে দিলাম। সে বলল, 'যাদের ওপর মৃত্যুর ছায়া পড়ছে তারা কি আর কথা বলতে পারে?'

– আচ্ছা, আজ রাতে অনেক লোককেই কি মেরে ফেলা হবে?

– হ্যাঁ, বেশ কিছু লোককে।

আমি দলের সকলকে শুনিয়ে বললাম, 'তাহলে কি আমরাও এই ঘৃণ্য কাজের সমর্থনে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি?'

আমার কথা শুনে সকলের খারাপ লাগল। ক্যাপ্টেন গুড ওখানে আর এক মিনিটও থাকতে চাইছিল না। আমাদের কোনো বিপদের মধ্যে পড়তে হবে কিনা তা জানতে চাইলে ইনফাদুস উত্তর দিল, 'আমি নিজেই জানি না কী হতে পারে। তবে তোমরা যে ভয় পেয়েছ তা একেবারে যেন প্রকাশ না পায়। আজকের রাতটা কেটে যাওয়া মনে তোমাদের বিপদ কেটে যাওয়া। সৈনিকদের মধ্যে রাজার বিরুদ্ধে ক্ষোভ আছে।'

নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে আমরা ময়দানের কেন্দ্র স্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ঐ জায়গাটা ফাঁকা রাখা ছিল এবং বেশ কয়েকজনের বসবার জন্য কাঠের টুল রাখা ছিল। কেন্দ্রস্থলে পৌঁছাবার আগেই রাজবাড়ি থেকে একটা ছোট সেনাদলকে আসতে দেখা গেল।

ইনফাদুস বলল, 'ঐ যে ওরা আসছে– রাজা টোয়ালা, রাজপুত্র স্ক্রাগা এবং বুড়ি গাগুল। আর ঐ যে এক হাতে বর্শা ও অন্য হাতে মুগুর নিয়ে জনা বারো বিকটদর্শন, দৈত্যাকার চেহারার লোক ওদের সঙ্গে আসছে এরাই হল জল্লাদ।'

একেবারে মাঝখানে রাখা টুলের ওপর বসল টোয়ালা, তার পায়ের কাছে বসল গাগুল এবং অন্যেরা রাজার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল।

কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি পৌঁছালে টোয়ালা চিৎকার করে বলল, 'হে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা, আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই, আসুন। সময় নষ্ট না করে আমরা এবার দরকারি কাজ শুরু করে দিই। এক রাতে কি এত সব কাজ করা যায়! আপনারা একেবারে সঠিক সময়ে এদেশে এসেছেন বলেই একটা ভাল জিনিস দেখে যাওয়ার সুযোগ পেলেন। চোখ ফিরিয়ে চারদিকটা একবার দেখে নিন আগে।' কথাটা বলে এক চক্ষু টোয়ালা নিজের চোখটা এদিক থেকে ওদিকে ঘোরাল। তারপর বলল, 'তারকাদের দেশে বাস করলেই হল না। বলি, এইরকম মজার ঘটনা দেখেছেন সেখানে? দেখুন, যাদের মধ্যে পাপ আছে তারা মাথার ওপর স্বর্গের বিচারের কথা ভেবে কেমন কাঁপতে শুরু করেছে।'

ফাটা বাঁশের ভিতর দিয়ে হাওয়া বইলে যে রকম আওয়াজ বের হয় সেই রকম বেসুরো কণ্ঠে গাগুল চিৎকার করে বলল, 'আর দেরি করছ কেন? শুরু কর, শুরু কর, হায়েনাগুলো যে খিদেয় কাঁদছে। শুরু কর, শুরু কর।'

গাগুলের কথা বলা শেষ হলে ময়দানটা যেন আরো নিস্তব্ধ হয়ে গেল এবং তার কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হয়ে কানে ফিরে আসতে লাগল। বুঝতে কষ্ট হল না যে একটা বিরাট অমঙ্গলের ঘটনা আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে।

রাজা হাতের বর্শা উঁচু করতেই কুড়ি হাজার পা মাটি ছাড়িয়ে ওপরে উঠল। মনে হল, একটা লোকেরই বুঝি অতগুলো পা। আবার সশব্দে একই সাথে পা-গুলো নিচে নেমে এল। এই প্রক্রিয়াটা তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হল। এতগুলো মানুষের পদ ভারে ধরিত্রী যেন কেঁপে উঠল। দূরে কোনো একপ্রান্ত থেকে করুণ সুরে কে যেন একটা গান করল যার মূল বক্তব্য ছিল : নারী থেকে যে পুরুষের জন্ম হয় তার কপালে কী থাকতে পারে?

হাজার কণ্ঠে একই উত্তর ঘোষিত হল : মৃত্যু।

গান থেমে গেলে সৈনিকদের একটা দল ঐ গানটা গাইতে শুরু করল। সেখানে শেষ হলে অন্য দল গানটা ধরল। এইভাবে সেনাদের প্রতিটি দল ও উপদল গানটা গাইল। গানের ভাষা পরিষ্কার বুঝতে না পারলেও ভাবাবেগটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না আমার। ভীতি, প্রীতি ও কামনাই ছিল তার বিষয়বস্তু। এখুনি মনে হল, গানটা বুঝি ভালবাসার। পর মুহূর্তে মনে হল, এতো গান নয়; এ যে রণ হুঙ্কার। তারপর মনে হল, এ যে বিষাদের হৃদয় বিদারক আর্তি। পরিসমাপ্তিতে সঙ্গীতের করুণ সুর যেন শরীরের রক্তকে একেবারে হিম করে দিল।

আবার নীরবতা। আবার এক বার রাজা হাত তুলতেই সেই দম বন্ধ করা নীরবতা ভঙ্গ হল। বোঝা গেল, কয়েকজন মানুষ ছোটা ছুটি করছে। একটু পরেই কৌতূহলের অবসান হল। সুঠাম দেহী সৈনিকদের সারি ভেদ করে কারা যেন আমাদের দিকে দৌড়ে আসতে লাগল। কাছে এলে দেখলাম সংখ্যায় তারা দশজন। তারা প্রত্যেকেই নারী, তাদের মাথার চুল শন নুড়ির মতো সাদা, গাত্র চর্ম একেবারে ঝুলে পড়েছে, মাথার চুলে বাঁধা রয়েছে মাছের পটকা, সাপের চামড়া দিয়ে পিঠের দিকটা ঢাকা, কোমরে মানুষের হাড়ের মালা এবং সাদা ও হলুদ রং দিয়ে মুখগুলো চিত্র-বিচিত্র করা হয়েছে। তাদের পাঁকাটের মতো সরু হাতে ধরা রয়েছে একটা ছোট্ট দুমুখো লাঠি। রাজার কাছাকাছি এসে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে একজন হাতের লাঠিটা গাগুলের দিকে তুলে ধরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, 'মা, মা আমার! তোমার আদেশ পালনের জন্য আমরা প্রস্তুত।'

বুড়ি গাগুল উত্তর দিল, 'ভাল, খুব ভাল। হে, ইমানুসির দল (ডাইনি বিদ্যায় বিশারদকে ইমানুসি বলে)! অন্ধকার জগতের সব কিছুই তোমরা দেখতে পাও, জানি। এখন বল, 'তোমাদের চোখের দৃষ্টি সজাগ আছে তো?'

– হ্যাঁ মা, তোমার আর্শীবাদে দৃষ্টি আমাদের যথেষ্ট সজাগ।

– শুনে বড্ড খুশি হলাম। এখন বল, তোমাদের শ্রবণ শক্তি প্রখর আছে তো? অনুচ্চারিত কথাও শুনতে পাও তো তোমরা?

– হ্যাঁ মা, কান আমাদের খোলা।

– বড্ড ভাল লাগল তোমাদের স্বাস্থ্যের কথা শুনে। এবার বল তোমাদের সব ইন্দ্রিয়গুলো সক্রিয় আছে তো? মানে, তোমরা রক্তের গন্ধ পাও তো? যে সব লোক দেশের রাজা এবং তার বন্ধুদের অকল্যাণ চায় তাদের বিনাশ করতে পারবে তোমরা?

মাথার ওপর 'স্বর্গের বিচার'কে মানুষের কল্যাণে নামিয়ে আনতে পারবে তো? তোমরা আমার বুদ্ধি পেয়েছ, তোমরা আমার জাদুশক্তির ছোঁয়া পেয়েছ, অতএব এই কাজ তোমাদের পক্ষে কঠিন হবে না।

– হ্যাঁ মা, আমরা করে দেখাব।

বুড়ি গাগুল বলল, 'তাহলে আর দেরি না করে জল্লাদদের কাছে যা। তারা যেন বর্শা শানিয়ে রাখে। দেখছিস না, শ্বেতকায় লোকরা আমাদের বিচার দেখবে বলে কত আগ্রহ নিয়ে বসে আছে।'

গাগুলের কথা শেষ হওয়া মাত্র ইমানুসিরা খুব জোরে একটা চিৎকার করে এদিক ওদিকে ছুটে গেল। একটা বোমা ফাটলে তার ভিতরের টুকরোগুলো যেমন নিমেষের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে বৃদ্ধা রমণীরাও সেইভাবে জনতার মধ্যে ছিটিয়ে গেল; চেষ্টা করেও তাদের দেখতে পেলাম না। তাই কাছাকাছি যে ইমানুসি বুড়িটা ছিল আমরা তার চলাফেরার ওপর নজর দিলাম। সৈনিকদের সারি থেকে কয়েক পা দূরে এসে ঐ বুড়িটা থেমে গেল, তারপর দ্রুত লয়ে গোল হয়ে নাচতে লাগল। একটুখানি নাচ করবার পর সে চিৎকার করে বলতে শুরু করল, 'যে লোকটা বিষ খাইয়ে নিজের মাকে হত্যা করেছিল সে তো এখানেই আছে। তার মনের খবর আমি জানি। রাজাকে পছন্দ নয় তার। তার মনে কু আছে।'

আরো দ্রুত লয়ে সে নাচতে লাগল। শারীরিক পরিশ্রমের ফলে ও উত্তেজনায় তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসতে লাগল এবং তার চোখ ওপর-নিচ করতে লাগল। এক সময় তার পুরো শরীরটা কাঁপতে লাগল। কুকুর যেমন শিকার দেখলে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যায় বুড়িও তেমনি হঠাৎ একেবারে নিশ্চুপ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত ঐভাবে থাকবার পর হাতের লাঠিটা উঁচু করে হামাগুড়ি দিয়ে সৈনিকদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল। তার ভাবসাব দেখে সবচেয়ে সাহসী সৈনিকেরও ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। কুকুর এগিয়ে আসছে। শিকারের সামনে নিশ্চিত মৃত্যু, আমরাও মোহাবিষ্টের মতো তার গতিবিধি দেখতে লাগলাম। কী ভয়াবহ লোমহর্ষক মুহূর্ত! কয়েক পা এগিয়ে এসে বুড়ি থামল, আবার শামুকের গতিতে অন্য দিকে চলল।

হঠাৎ একটা চিৎকার করে বুড়ি তার ছোট লাঠি দিয়ে একজন লম্বা সৈনিককে স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে তারই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই সহকর্মী তার হাত দুটো শক্ত করে ধরে টানতে টানতে তাকে রাজার কাছে নিয়ে এল।

চোখের পলকে দুটো বিকটদর্শন জল্লাদ ঐ সৈনিকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রাজার দিকে তাকিয়ে থাকল। বুঝতে অসুবিধা হল না, তারা রাজার আদেশের জন্য অপেক্ষা করছে।

রাজা বলল, 'হত্যা কর।'

গাগুল বলল, 'হত্যা কর।'

রাজপুত্র স্ক্রাগা তাদের কথার প্রতিধ্বনি করে বলল, 'হত্যা কর।' কথাটা বলে রাজপুত্রের সে কী অট্টহাসি!

রাজার আদেশ উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে তা কাজে রূপান্তরিত হল। একটা জল্লাদ হাতের বর্শাটা সজোরে অভিযুক্ত সৈনিকের পাঁজরে ঢুকিয়ে দিল এবং তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে দ্বিতীয় জল্লাদটা প্রচন্ড জোরে তার মাথায় মুগুরের ঘা বসিয়ে দিল।

রাজা টোয়ালা ঘোষণা করল 'এক।' ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'এ যে দেখি চার্লস ডিকেন্সের সেই' 'মাদাম ডেফার্জের চরিত্র।' অন্য কয়েকজন ছুটে এসে মৃতদেহটা সরিয়ে নিয়ে গেল।

এক মিনিটের মধ্যে আরো একজন অভিযুক্তকে রাজার সামনে হাজির করানো হল। সে তখন বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে। লোকটার গায়ে চিতা বাঘের চামড়া বাঁধা আছে। এর অর্থ হল, সামাজিক অবস্থান তার খুব উঁচু। কিন্তু রাজা কোনো কিছুতে গুরুত্ব না দিয়ে 'দুই' উচ্চারণ করতেই তার প্রাণহীন দেহটা মাটিতে পড়ে গেল।

এভাবে মরণ খেলা চলতে লাগল। এক সময় রাজাকে বলতে শুনলাম 'একশো।' স্পেন দেশের ষাঁড়ের লড়াই কিংবা রোমানদের মল্লযুদ্ধের মধ্যেও এত রক্তের হোলি খেলা দেখা যায় না। ঐ দুটো খেলায় দর্শকদের মজা উপভোগ করবার খানিকটা সুযোগ থাকে কিন্তু কুকুয়ানাদের নাচের অনুষ্ঠানে তা নেই। অনুষ্ঠানে মজা দেখাবে কে? দর্শকদের মনোরঞ্জন করবে কে? যে দর্শকদের আনন্দ দিতে আসবে পর মুহূর্তে তারই প্রাণহীন দেহটা যে মাটিতে পড়ে থাকবে কিনা সে কথা কে বলতে পারে?

এত মৃত্যুর মিছিল দেখা যায় না। এক সময় আমরা উঠে দাঁড়িয়ে এর প্রতিবাদ করতে গেলে টোয়ালা আমাদের বিরত থাকার জন্য বলল, 'আইনকে নিজের পথে চলতে দিন। এই কুত্তাগুলো দেশের অমঙ্গল ডেকে আনে। এদের কি বাঁচতে দেওয়া যায়?'

রাত সাড়ে দশটার সময় সব ইমানুসিরা ফিরে এসে এক জায়গায় জড়ো হল। এত পরিশ্রমের জেরে তাদের বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মনে হল, রক্তের খেলার অবসান হয়েছে। কিন্তু আমাদের অনুমান যে ভুল তা প্রমাণিত হল যখন বৃদ্ধা গাগুল লাঠিতে ভর করে উঠে দাঁড়াল এবং বহু কষ্টে হাঁটতে হাঁটতে খোলা জায়গায় পৌঁছাল। ওখানে পৌঁছেই সে যেন যৌবনের শক্তি ফিরে পেল। কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে নাচতে নাচতে সারির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা একজন লোককে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিল। এই দৃশ্য দেখে ঐ সেনাদলের সকলে যেন আর্তনাদ করে উঠল। কারণ এই লম্বা লোকটাই ছিল ঐ সেনাদলের অধিকর্তা। অন্য দুজন সেনা পদাধিকারী তার হাত দুটো শক্ত করে ধরে তাকে টানতে টানতে রাজার কাছে নিয়ে এল। পরবর্তীকালে শুনেছিলাম, ঐ অধিকর্তা প্রচুর সম্পদের মালিক ছিল এবং খুব দক্ষ যোদ্ধা ছিল।

দণ্ডাদেশ কার্যকর হলে রাজা ঘোষণা করল 'একশো তিন।' বুড়ি গাগুল এবার এক অভাবনীয় কাজ করল। নাচতে নাচতে সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

তার মতিগতি দেখে ক্যাপ্টেন গুড তো বলেই বসল, 'বুড়ি এবার আমাদের নিয়ে যদি খেলা না করে তাহলে আমি নিজের নাম পালটে ফেলব।' স্যার হেনরি অবশ্য তার কথায় গুরুত্ব দিল না।

এবার আমার এত ভয় হল যে হাত পা অবশ হয়ে গেল। পিছন ফিরে তাকাতেই মৃতদেহের একটা লম্বা সারি চোখে পড়ল। তাহলে কি একটু পরেই আমরাও ঐ দলে স্থান পাবো!

ওদিকে বুড়ি গাগুল এগিয়েই আসছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা বাঁকা লাঠি যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তার কুটিল চোখে ফুটে উঠেছে অশুভ বহ্নি।

এগিয়ে আসছে, বুড়ি গাগুল আরো এগিয়ে আসছে। উপস্থিত সমস্ত লোকের দৃষ্টি তার চলার ছন্দের ওপর নিবদ্ধ। এবার সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের লাঠিটা তুলে নির্দেশ করল।

স্যার হেনরি বলল, 'শয়তানীটা কাকে ইঙ্গিত করছে?'

মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সব সংশয়ের অবসান হল। বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এসে বুড়ি যাকে ছুঁয়ে ফেলল তার নাম উমবোপা ওরফে ইগনোসি।

বুড়ি গর্জে উঠল, 'গন্ধ পেয়েই ওকে আমি চিনেছি। এই লোকটা অশুভের প্রতীক। রক্তের বন্যা বইবার আগেই একে খতম কর। হে রাজা! এতটুকু দেরি না করে একে শেষ করে দাও।'

বিষয়টা নিয়ে ভাবতে রাজার একটু সময় লাগল। সেই অবসরে আমি উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে উদ্দেশ করে বললাম, 'এই লোকটা যাই হোক না কেন, তোমার অতিথিদের চাকর। আমরা তোমার অতিথি, এই লোকটার গায়ে হাত দেওয়া মানে আমাদের গায়ে হাত দেওয়া। আতিথ্যের নিয়ম অনুযায়ী আমি তার সুরক্ষার দাবি করছি।'

রাজা গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, 'শ্রেষ্ঠ ডাইনি বিশারদ গাগুল কী রায় দিয়েছে তা তোমরা শুনেছ। আমি এর অন্যথা করতে পারব না। ওকে মরতেই হবে।'

আমিও এবার ততোধিক গম্ভীর হয়ে বললাম, 'না, ওকে মরতে হবে না। যে ওর গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করবে বরং তাকেই মরতে হবে।'

আমার কথায় রাজা টোয়ালা না দমে গিয়ে জল্লাদদের হুকুম দিল, 'ধর ওকে।'

জল্লাদগুলো কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওদিকে ইগনোসি হাতের বর্শাটা আক্রমণের ভঙ্গিতে তুলে ধরল। এতটুকু সময় নষ্ট না করে রিভলবার বের করে আমি টোয়ালার মাথায় ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। যে জল্লাদটা একেবারে পুরোভাগে ছিল তার দিকে স্যার হেনরি এবং বুড়ি গাগুলের মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়ার জন্য বন্দুক তাক করল ক্যাপ্টেন গুড।

অভাবনীয় ব্যাপারটা ভাল করে বুঝবার জন্য টোয়ালা আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলে আমি বললাম, 'টোয়ালা, এবার কে মরবে?'

সে এবার কথা বলল, 'এবার এই নলটা সরিয়ে নাও। তুমি আতিথ্যের নিয়মের কথা উল্লেখ করেছ বলে আমি তাকে মার্জনা করলাম, এটা ধরে নিও না যে প্রাণের ভয়ে আমি তোমার চাকরকে ক্ষমা করছি।'

আমি বললাম, 'তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে আমি খুশি হলাম, এত রক্ত দেখে আমরা খুব ক্লান্ত এখন বিশ্রাম করতে চাই। নাচের অনুষ্ঠান কি শেষ হল?'

বিষণ্ন মুখে টোয়ালা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, শেষ হল। এবার এই মরা কুকুরগুলোকে ফেলে দিয়ে আসা প্রয়োজন। হায়েনারা ওদের হাড় মজ্জা খেয়ে নেবে।' এই বলে সে হাতের বর্শাটা তুলে ধরল।

রাজার সংকেত পেয়ে হাজার হাজার সেনারা সম্পূর্ণ নীরবতা বজায় রেখে ওখান থেকে চলে গেল। কেবল একটা দল ওখানেই থেকে গেল মৃতদেহের স্তূপ সরাবে বলে।

রাজাকে সেলাম জানালাম বিদায় জানানোর জন্য। রাজার তরফ থেকে আমরা একটা যান্ত্রিক প্রত্যুত্তর পেলাম।

কুটিরে ফিরে কুকুয়ানারা যে ধরণের প্রদীপ জ্বালায় সেই রকম একটা প্রদীপ ধরালাম। এর সলতে পাম গাছের একটা অংশ থেকে নেওয়া এবং তেল হিসাবে ব্যবহৃত হয় জলহস্তীর চর্বি। বিছানায় বসেই স্যার হেনরি বলল, 'আর সহ্য করতে পারছি না। খুব অসুস্থ বোধ করছি।'

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'যখন ঐ শয়তানগুলো নরহত্যা করছিল তখন আমি চোখ বন্ধ রাখছিলাম। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য যে ঠিক অনভিপ্রেত মুহূর্তে আমার চোখ খুলে যাচ্ছিল। কেবল উমবোপার বেলায় আমি চোখ বন্ধ রাখতে পারিনি, কিন্তু ইনফাদুস তো এখনও এল না! উমবোপা, তোমাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও তোমাকে আজ সাহায্য করেছি। না করলে এতক্ষণে তোমার শরীর ফুটো হয়ে যেত। আশা করি, আমাদের সাহায্যের কথা মনে রাখবে।'

উমবোপা বলল, 'আমি হৃদয় দিয়ে আপনাদের উপকারের কথা অনুভব করেছি। ইনফাদুসের কথা বলছেন তো? কাকা হয়ত এখুনি এসে পড়বে।'

পাইপ ধরিয়ে আমরা ইনফাদুসের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

১১
সংকেত প্রদান

যে বিভীষিকা আমরা দেখেছিলাম তাই নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আলোচনা করলাম, তারপর খুব রাতে আমরা যখন চোখ বুজবার চেষ্টা করছি তখন কিছু লোকের পায়ের শব্দ পেলাম। এপাশের প্রহরী পরিখার সাংকেতিক শব্দ জানতে চাইলে কেউ একজন নিচু গলায় উত্তর দিতেই প্রহরী সিঁড়ি নামিয়ে দিল পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে আসতে আমাদের কুটিরের দ্বারে এসে থামল। ইনফাদুস কুটিরে প্রবেশ করল। তার সঙ্গী জনা কায়েক সবলদেহী লোক দরজার ওপাশে থাকল।

ইনফাদুস বলল, 'প্রভুরা, আমার কথা রাখবার জন্যই আমি এসেছি।' সঙ্গের লোকদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, 'এরা সকলেই গোষ্ঠী প্রধান এবং প্রত্যেকের অধীনে তিন হাজার করে সেনা আছে। এই সেনারা রাজার আজ্ঞাই পালন করে। আমি আপনাদের কাছে যা শুনেছি বা নিজের চোখে দেখেছি তা এদের জানিয়েছি। ইগনোসি, তুমিই যে আইনগতভাবে আমাদের রাজা তা এরা দেখতে চায়। তোমার কোমরে যে উল্কি করা সাপ আছে তা এদের দেখাও এবং তোমার কাহিনী এদের শোনাও। তোমার কথায় এদের বিশ্বাস জন্মালে এরা সকলে রাজা টোয়ালার বিরুদ্ধে তোমাকে সাহায্য করবে।'

ইগনোসি ওরফে উমবোপা কোমরের কাপড় খুলে উল্কি করা সাপের ছবি তাদের দেখাল। তারা এক একজন করে সামনে এসে প্রদীপটা তুলে এই চিহ্ন ভালভাবে পরীক্ষা করল। তারপর একপাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কোমরের কাপড় ঠিক করে নিয়ে যে বৃত্তান্ত আজ সকালে সে বলেছিল তার পুনরাবৃত্তি করল।

ইনফাদুস অন্যদের সম্বোধন করে বলল, 'তোমরা তো সব কিছু শুনলে। এখন বল, ওর ন্যায্য অধিকার ফিরে পেতে কি তোমরাও একে সাহায্য করবে? সারা দেশ টোয়ালার অত্যাচারে জর্জরিত এবং ঝরনার জলের মতো এখানে রক্ত ঝরে। এসব তোমরা নিজেদের চোখে আজ রাতেই দেখেছ। তোমরা ছাড়া আরো দুজন প্রধানের সাথে আমি কথা বলব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তারা তো একটু আগেই হায়েনার পেটে চলে গেল। আজ না হয় কাল, তোমাদের অবস্থা একই রকম হবে। হে আমার ভায়েরা! এই বেলা স্থির কর, অত্যাচার সহ্য করবে, না রুখে দাঁড়াবে।'

প্রধানদের মধ্যে যে সবচেয়ে বয়স্ক তাকে মাথার সাদা চুল দেখেই চেনা যায়। লোকটির চেহারা মজবুত কিন্তু বেঁটে। ইনফাদুসের কথা শেষ হলে সে বলতে শুরু

করল, 'তোমার কথা সঠিক, টোয়ালার অত্যাচারে দেশ কাঁদছে, যাদের আজ রাতে হত্যা করা হল তাদের মধ্যে আমার ভাইও আছে। কিন্তু যে পরিবর্তনের কথা আমরা ভাবছি তার ফল সুদূর প্রসারী। রাজাকে হটিয়ে যাকে আমরা সিংহাসনে বসাব সেই লোকটি কেমন তা আগে যাচাই করে নিতে হবে। সে যদি মিথ্যাচারী কিংবা প্রতারক হয় তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। পরিবর্তন আনতে গেলে রক্তের নদী বইবে। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে– দেশের সকলকে আমরা পাশে পাব না। যারা সুবিধাভোগী তারা সব সময় রাজাকেই আঁকড়ে থাকবে কারণ তাতেই লাভবান হবে তারা। মানুষের স্বভাবই তাই। মাথার ওপরে যে সূর্যকে তারা দেখতে পায় কেবল তারই পূজা করে; আগামী দিনের সূর্যের বন্দনা করে না তারা। এই শ্বেতকায় ব্যক্তিদের জাদু শক্তি খুব জোরালো তা মানছি। ইগনোসি এদের অনুগ্রহ লাভ করেছে তাও সত্যি, কিন্তু ইগনোসি যে প্রকৃত রাজা তার প্রমাণ কী? উপযুক্ত প্রমাণ দেখাতে পারলে দেশের লোক আমাদের পাশে দাঁড়াবে। তাছাড়া, শ্বেতকায় ব্যক্তিদের জাদু শক্তিতে আস্থা রেখে মানুষ আমাদের সমর্থন করবে।'

আমি বললাম, 'ওর কোমরে উল্কি দিয়ে আঁকা সাপ কি প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট নয়।?'

'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এটা অকাট্য প্রমাণ নয়। বাল্যাবস্থায় ওর কোমরে ঐ ছবি এঁকে দেওয়া হয়েছিল। এর থেকে নির্ভুলভাবে বলা যায় না সে রাজার ছেলে। অভ্রান্ত সংকেত না পেলে এত বড় কাজে আমরা হাত দেব না,' বয়স্ক প্রধান বলল।

অন্য প্রধানরা হাবেভাবে যে তাকেই সমর্থন করল তা বুঝলাম। হতবুদ্ধি হয়ে আমি ক্যাপ্টেন গুড ও স্যার হেনরির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। ভবিষ্যৎ ঘটনার আগাম সংকেত একটা দিতে পারব মনে হচ্ছে। ওদের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বল।'

আমার অনুরোধে সব প্রধানরা বাইরে চলে গেল। ওদিকে যে হাত বাক্সটায় ক্যাপ্টেন গুড ওষুধপত্র রাখে সেটা সে খুলল এবং সেখান থেকে একটা ছোট ডায়েরি বের করে এনে সে জানতে চাইল, 'কাল তো জুন মাসের চার তারিখ, তাই না?'

তারিখের হিসাব আমরা সঠিকভাবে রাখতাম বলেই আমরা জানালাম আগামীকাল চার তারিখ। নিশ্চিত হয়ে ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'কী অসাধারণ যোগাযোগ! আগামীকালই হচ্ছে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। গ্রীনিচ সময় অনুসারে সন্ধ্যা আটটা পনেরো মিনেটে গ্রহণ শুরু হবে, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও তা দৃশ্যমান। এই গ্রহণকে তো আমরা সংকেত হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। যাও এদের বলে এসো, কাল রাতে পূর্ণিমার চাঁদকে আমরা খেয়ে ফেলব। তখন মজা বুঝবে এরা। আমাদের কথায় অবিশ্বাস করলে তার ফল যে খুবই খারাপ হবে তা বুঝিয়ে দাও এদের।'

ক্যাপ্টেন গুডের চিন্তাশক্তির প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু একটাই বিপদ, ডায়েরিতে গ্রহণের তারিখটা ঠিকঠাক লেখা আছে তো! আমাদের ভবিষ্যদবাণী ভুল হয়ে গেলে এই দেশের সব লোক অত্যন্ত হীন চোখে আমাদের দেখবে। শুধু তাই নয়, ইগনোসির রাজা হবার সম্ভাবনা চিরতরে ঘুচে যাবে।

কথাটা বলে ডায়েরির একটা সাদা পাতায় কিছু যেন লিখতে লাগল ক্যাপ্টেন গুড। 'যদি ডায়েরিতে ভুল ভবিষ্যদবাণী করা থাকে তাহলে?' প্রশ্নটা করল স্যার হেনরি।

কোনোরকম দ্বিধা না করে ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'এই ধরনের অনুমানের কোনো অবকাশ নেই। ডায়েরিতে যে দিন গ্রহণের পূর্বাভাস থাকে সেদিনই তা হয়ে থাকে। আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে এই কথা বলছি। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও এই গ্রহণ দেখা যাবে। হিসাব করে দেখলাম, এই জায়গায় গ্রহণ শুরু হবে রাত্রি দশটায় এবং শেষ হবে রাত্রি সাড়ে বারোটায়। ধরে নেওয়া যেতে পারে প্রায় দেড় ঘণ্টা পূর্ণিমার চাঁদ অদৃশ্য থাকবে।'

স্যার হেনরি বলল, 'ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে।'

দোনো-মনা করে সম্মতি জানিয়ে বললাম, 'ঝুঁকি না নিয়েই বা উপায় কী আমাদের! তবে গ্রহণের ব্যাপারটা একটু গোলমেলে, আকাশে মেঘ থাকলে আমাদের ক্ষমতা দেখানো যাবে না। যাই হোক, উমবোপা, বাইরে গিয়ে প্রধানদের ডেকে আন।'

তারা সকলে ভিতরে এলে আমি বলতে শুরু করলাম, 'ইনফাদুস এবং কুকুয়ানাদের অন্যান্য প্রধানগণ! মন দিয়ে আমার কথা শোন। আমরা যখন তখন আমাদের ক্ষমতা জাহির করতে চাই না কারণ তা করতে যাওয়া মানে প্রকৃতির কাজে বাধা প্রদান করা। তাতে মানুষের মনে ভয় ও ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তবে আজকের বিষয়টা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এতগুলি মানুষকে হত্যা করে রাজা আমাদের খুব রাগিয়ে দিয়েছে। শয়তান বুড়ি গাগুল তো আমাদের বন্ধু ইগনোসিকে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা পাকা করেছিল। এসব আমরা আর সহ্য করব না। তাতে প্রকৃতির নিয়মে বাধা দিতে হলেও আমরা রাজি আছি। আমাদের যে কী বিপুল পরিমাণ শক্তি আছে তারই একটা ইঙ্গিত দেব। আমার সাথে বাইরে চল তো একবার।'

আমরা সকলে কুটিরের বাইরে খোলা জায়গায় দাঁড়ালে পশ্চিম আকাশের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, 'ঐ যে লাল গোলাকার বস্তুটা দেখা যাচ্ছে, ওটা কী?'

সঙ্গে সঙ্গে একজন বলে উঠল, 'ওটা তো অস্তগামী চাঁদ।' আমি বললাম, 'ঠিক বলেছ। একটা কথার জবাব দাও তো, চাঁদটা যখন মাঝ আকাশে ছিল তখন কি কোনো মানুষ ওটা নিভিয়ে দিয়ে গোটা দেশটাকে অন্ধকারে ঢেকে দিতে পারত?'

আমার কথা শুনে প্রধান তো হেসেই খুন। সে বলল, 'কী যে মজা করেন! কোথায় মানুষ, আর কোথায় চাঁদ! চাঁদের চলা, চাঁদের আলো নিয়ন্ত্রণ করা কি মানুষের হাতে আছে!'

– তুমি যথার্থ কথাই বলেছ। তবে আমিও তোমাকে বলে রাখি, মধ্য রাত্রির ঠিক দুই ঘণ্টা আগে থেকে চাঁদকে খেয়ে ফেলবার প্রক্রিয়া আমরা শুরু করব। পরবর্তী দেড় ঘণ্টায় ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসবে পৃথিবীতে, এই অদ্ভুত ঘটনার মাধ্যমে তোমাদের দেশের সব লোককে আমরা সংকেত দেব যে এই দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা হল ইগনোসি। এই সংকেত দিতে পারলে তোমরা মেনে নেবে তো আমাদের কথা?

আমার কথা শুনে প্রধানের মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার সাথে অন্য যারা এসেছিল তাদের দৃষ্টিতেও খুশির ছোঁয়া দেখা গেল। প্রধান বলল, 'এই অসাধারণ ও অচিন্ত্যনীয় কাজ করে দেখালে কে আর আপনাদের কথা অবিশ্বাস করবে?'

আমি বললাম, 'আমরা তিনজন মানে আমি, স্যার হেনরি এবং ক্যাপ্টেন গুড এই কাজ করে দেখাব। ইনফাদুস, তুমি সব শুনলে তো!'

– কিন্তু হুজুর, পূর্ণিমার চাঁদকে একেবারে নিভিয়ে দেওয়া যে অসম্ভব ব্যাপার। এই ধরিত্রীর জননী হল চাঁদ।

– তোমার কথা মানছি। কিন্তু যে কাজ আমরা করব বলে ঠিক করেছি তা করেই দেখাব।

– আপনাদের যেমন ইচ্ছা, তাই করবেন। তবে সূর্যাস্তের দুঘণ্টা পর থেকেই শুরু হয়ে যাবে নাচের উৎসব। টোয়ালা নিশ্চয়ই আপনাদের নিমন্ত্রণ জানাবে, আর মেয়েরাই কেবল নাচবে। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি। নর্তকীদের মধ্যে সুন্দরীতম মেয়েটিকে রাজার ছেলে স্ক্রাগা নিজের হাতে বলি দেবে। তার রক্তে তৃপ্ত হবে 'সলোমনের রাজপথ' যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা ধ্যান গম্ভীর ঐ ত্রিমূর্তি। ওখানকার পাহাড় তিনটাকে এখানকার বাসিন্দারা তিনজন দেবতা বলেই মান্য করে। চাঁদের আলো ঐ সময় নিভিয়ে দিতে পারলে কেউ আর আপনাদের কথায় অবিশ্বাস করতে পারবে না। যদি পূর্ণিমার চাঁদকে নিভিয়ে দিয়ে মেয়েটার জীবন রক্ষা করতে পারেন তাহলে আপনাদের কথায় সকলেই বিশ্বাস করবে।

ইনফাদুস বলল, 'লু মানে, এই রাজার লোকালয় থেকে, মাইল দুয়েক দূরে শুক্ল পক্ষের চাঁদের মতো বাঁকা একটা পাহাড় আছে। আমার নিজের একটা সেনাদল এবং যে প্রধানরা এখানে এসেছে তাদের আরো তিনটা সেনাদল ঐ পাহাড়ের কাছে রয়েছে। রাত পোহালেই আরো তিনটা দলকে ওখানে পাঠিয়ে দেব। তারপর হুজুররা যদি নিজেদের কথা মতো চাঁদটা নিভিয়ে দেন তাহলে আমি আপনাদের ওখানে নিয়ে চলে যাব আর এখানে লড়াই শুরু হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'খুব ভাল কথা, কিন্তু চাঁদকে খেতে হলে আমাদের তো কিছুটা প্রস্তুতি নিতে হবে। এবার তোমরা বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর। কাল সকাল থেকেই তো অনেক কাজ করতে হবে।'

আমাদের সেলাম করে অন্যান্য প্রধানদের নিয়ে ইনফাদুস চলে গেলে ইগনোসি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, তোমরা সত্যি সত্যি পারবে তো পূর্ণিমার রাতকে অন্ধকার করে দিতে, নাকি ওদের ভয় দেখালে?'

আমি উত্তর দিলাম, 'আমার বিশ্বাস আছে এই কাজ করে দেখাবার, বুঝলে উমবোপা, মানে ইগনোসি।'

ইগনোসি বলল, 'খুবই অদ্ভুত কথা বলেছ তোমরা। এই ধরনের কথা অন্য কেউ বললে আমি কানেই তুলতাম না। তবে ইংরেজরা তো মিথ্যা কথা বলে না, তারা প্রকৃত অর্থে 'ভদ্রলোক।' তবে হ্যাঁ, এই সংকট যদি আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি তাহলে আমিও তোমাদের ঋণ পরিশোধ করব একদিন।'

স্যার হেনরি বলল, 'ইগনোসি, একটা ব্যাপারে তুমি আমাকে কথা দিতে পারো?'

বিশাল দেহী ইগনোসি হেসে বলল, 'তোমার কথার বিষয়বস্তু জানবার আগেই তা করে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করলাম।'

স্যার হেনরি বলল, 'যদি তুমি এই দেশের রাজা হতে পারো তাহলে এই ডাইনি শনাক্তকরণ এবং হত্যার অবসান করতে হবে তোমাকে। কাল রাতে যে পদ্ধতিতে

মানুষের প্রাণ নেওয়া হল তা ভুলতে পারছি না। বিনা বিচারে কোনো মানুষকে বধ করা যাবে না, সেই আইন চালু করতে হবে তোমাকে।'

স্যার হেনরির কথা অনুবাদ করে দিলে ইগনোসি বলল, 'শ্বেতকায় ব্যক্তিদের সাথে কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের বেশ কিছু তফাৎ আছে। তোমাদের কাছে মানুষের জীবনের মূল্য অসীম কিন্তু আমাদের কাছে তা মূল্যহীন। যদি আমি কিছু করবার ক্ষমতা পাই তাহলে ডাইনি বলে চিহ্নিত করে মানুষ মারবার প্রথা বিলোপ করব এবং অভিযুক্তের কথা না শুনে কোনো দণ্ড দেব না।'

স্যার হেনরি বলল, 'কথাটা মনে থাকে যেন এখন চল, একটু বিশ্রাম করা যাক।'

সারাদিনের মানসিক চাপের ফলে বিছানায় শুয়ে পড়া মাত্রই আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন ইগনোসির ডাকে ঘুম ভাঙলে দেখলাম বেলা এগারোটা বাজে। হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা খেয়ে আমরা হাঁটতে বের হলাম। রাস্তায় নানা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। কুকুয়ানাদের গৃহ নির্মাণের কৌশল ও এখানকার মেয়েদের সামাজিক রীতি নীতি আমাদের আলোচনার একটা বড় অংশ দখল করে থাকল।

স্যার হেনরি চিন্তিতভাবে বলল, 'তোমার ডায়েরিতে গ্রহণের দিন ক্ষণ সঠিক লেখা আছে বলেই মনে হয়।'

আমি ততোধিক বিষণ্নভাবে বললাম, 'গ্রহণ যদি আজ রাতে না হয় তাহলে তো আমাদের খেলা শেষ। চন্দ্রগ্রহণ না হলে এই প্রধানরাই রাজার কাছে গিয়ে আমাদের শক্তিহীনতার কথা শোনাবে। তারপর যেদিন সত্যি সত্যিই গ্রহণ হবে তখন ওরা আমাদের করুণার চোখে দেখবে।'

কুটিরে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা কখনো গল্প করলাম, কখনো বিশ্রাম নিলাম। এক সময় সূর্য অস্ত গেল। রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় টোয়ালার দূত আমাদের কাছে এল। আজ রাতে 'মেয়েদের নাচ' দেখবার জন্য আমাদের সে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

রাজার পাঠানো লোহার জালের জামাগুলো ভিতরে পরে নিয়ে তার ওপর সাধারণ জামা চড়িয়ে নিলাম। লড়াই বাধলে ইনফাদুস আমাদের বাঁকা পাহাড়ের পাশে নিয়ে পালিয়ে যাবে আগেই জানিয়েছিল। আবার লড়াই, আবার রক্তক্ষয়, আবার প্রাণহানির কথা চিন্তা করে আমরা সকলেই ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। মুখের ভাবভঙ্গিতে মনের ভয় অবশ্য প্রকাশ পেল না। সম্ভাব্য প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে আমরা রাইফেল ও বেশ কিছু কার্তুজ সঙ্গে নিলাম। রাজ বাড়ির সামনে যে বিশাল ময়দান আছে গত রাতে সেটার চেহারা ছিল অন্যরকম। গত রাতে যেখানে সারি সারি সৈনিক ছিল আজ সেখানে রয়েছে সারি সারি যুবতী ও কিশোরী। পোশাক পরিচ্ছদে তারা বেশ সুসজ্জিত। তাদের প্রত্যেকের গলায় ফুলের মালা, একহাতে বড় একটা গাছের পাতা এবং অন্য হাতে সাদা শালুক ফুল। ময়দানের একেবারে কেন্দ্র স্থলে বসে আছে রাজা টোয়ালা আর তার পায়ের কাছে উপবিষ্ট রয়েছে বুড়ি গাগুল। এই দুজনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ইনফাদুস, রাজকুমার স্ক্রাগা এবং অন্য বারোজন প্রহরী। আশেপাশে জনা বিশেক প্রধানও দাঁড়িয়ে আছে যাদের মধ্যে গত রাতের পরিচিত কয়েকজনও ছিল।

কাছে যেতেই টোয়ালা আমাদের যান্ত্রিকভাবে অভিনন্দন জানাল; তবে সে তার একটি মাত্র চোখ দিয়ে উমবোপাকে বিষদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

টোয়ালা বলল, 'তারকাদের দেশ থেকে আগত শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদের কাছে পেয়ে আমি আনন্দিত। কাল চাঁদনি রাতে যে দৃশ্য আপনারা দেখেছিলেন আজ রাতে কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক একটি দৃশ্য দেখবার সুযোগ আপনারা পাবেন। অবশ্য আমি মনে করি, আজকের দৃশ্য অত ভাল হবে না। চুম্বন ও মেয়েদের মুখের কথা খুবই মিষ্টি সন্দেহ নেই তবে বর্শার ঝলকানি ও পুরুষের রক্তের গন্ধ মানুষকে আনন্দ দেয় ঢের বেশি। আমাদের দেশের সব মেয়েরাই এখানে আছে। তোমাদের যাকে পছন্দ হবে তাকেই বিয়ে করতে পার। একটু ভুল বললাম, যতগুলি মেয়েকে পছন্দ হবে ততগুলিকেই বিয়ে করে নিতে পার।' প্রস্তাবটা রেখে আমাদের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য চুপ করে থাকল টোয়ালা।

ক্যাপ্টেন গুড তো মানসিকভাবে একজন নাবিক; রাজার প্রস্তাব তার মনে ধরল। কিন্তু আমি তো ওদের চেয়ে বয়সে বড় এবং বহুদর্শী। আমি জানি, দিনের পিছনে যেমন রাত আসে, তেমনই নারীর আবির্ভাব ঘটলে বহু ঝুট ঝামেলাও তাকে অনুসরণ করে। তাই ক্যাপ্টেন গুড মুখ খোলার আগেই আমিই উত্তর দিলাম, 'রাজা, তোমাকে ধন্যবাদ। একটা কথা কী জানো, শ্বেতাঙ্গ লোকরা শ্বেতাঙ্গ নারীদেরই বিয়ে করতে চায়। তোমাদের মেয়েরা খুবই সুন্দর কিন্তু তারা আমাদের জন্য নয়।'

আমার কথা শুনে রাজা হেসে বলল, 'আমাদের এখানে একটা প্রবাদ আছে : গায়ের রঙ যেমনই হোক না কেন, মেয়েদের চোখ সব সময়ই খুব আকর্ষক। আর একটা প্রবাদের কথা শুনে রাখা ভাল : হাতের কাছে যে মেয়েকে পাও তাকেই ভালোবাস, চোখের বাইরে থাকা মেয়েকে বিশ্বাস করো না। হয়ত তারকাদের দেশে এই নিয়ম খাটে না। যে দেশের অধিবাসীরা শ্বেতকায় সেই দেশে সব কিছুই সম্ভব। তোমাদের যেমন অভিরুচি তেমনই আচরণ কর। আমাদের এখানে মেয়েদের সঙ্গী হবার জন্য পুরুষের অভাব নেই।' উমবোপার দিকে তাকিয়ে রাজা বলল, 'হে কৃষ্ণকায় ব্যক্তি! তোমাকেও স্বাগত জানাই। গত রাতে গাগুলের রায় মেনে নিলে এতক্ষণে তোমার শরীরটা শক্ত হয়ে ভাগাড়ে পড়ে থাকত। তোমার কপাল ভাল যে তুমিও তারকাদের দেশ থেকে এসেছ। হা, হা।'

তার কথা শুনে ইগনোসির রক্ত গরম হয়ে গেল। ঠান্ডা গলায় সে বলল, 'তুমি আমাকে হত্যা করবার আগেই আমি তোমাকে বধ করতে পারি তা জেনে রাখো, রাজা। আমার শরীর ঠান্ডা হবার আগে তোমার শরীর জমে যাবে।'

ইগনোসির মুখে এই ধরনের কথা শুনে রাজা চমকে উঠল। সে ধমক দিয়ে বলল, 'তোর খুব সাহস আছে দেখছি। ভাল চাস তো মুখ সামলে কথা বলবি।'

ইগনোসি ছাড়বার পাত্র নয়। সে জবাব দিল, 'সত্যি কথা যে বলে, সাহস তো তারই থাকে। বর্শা ছুড়লে তা লক্ষভ্রষ্ট হতে পারে কিন্তু সত্যি কথা একেবারে বুকে গিয়েই বিঁধতে পারে। যা বলেছি, তা হল তারকাদের বার্তা।'

রাগে টোয়ালার একমাত্র চোখটা যেন জ্বলতে লাগল তবে সে আর কথা বাড়াল না।

রাজা নাচ শুরু করবার আদেশ দিতেই মাথার খোঁপায় ফুলের মালা লাগানো যুবতীরা দলে দলে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তারা সকলে সুন্দর সুর তুলে একটা গান গাইছিল। তাদের হাতে ধরা গাছের পাতা ও সাদা শালুকের

ফুলগুলো যেন চারিদিকে রঙ ছড়াচ্ছিল। তারা ক্রমাগত নেচেই চলেছিল যদিও তাদের চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ ছিল। নাচের ছন্দে তারা কখনো গোল হয়ে ঘুরছিল, কখনো যুদ্ধের ভঙ্গিতে সামনের সারির মেয়েদের দিকে এগিয়ে আসছিল আবার কখনো পিছিয়ে যাচ্ছিল কিংবা হাত ওপরে তুলে ঘোরাচ্ছিল। মেয়েদের নাচ খুবই সুন্দর ছিল। খানিক পর তারা থামলে এক অতীব সুন্দরী কিশোরী ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল এবং আমাদের কাছে এসে নাচতে শুরু করল। তার নাচের ভঙ্গি এতটাই সুন্দর ছিল যে পেশাদার ব্যালে নর্তকী পর্যন্ত লজ্জা পেয়ে যাবে। ক্লান্ত হয়ে সে সরে দাঁড়ালে একের পর এক সুন্দরী নর্তকীরা এল এবং নাচ দেখাল।

চেহারায়, লাবণ্যে, রূপে, নৃত্য কৌশলে তারা প্রত্যেকেই দর্শকদের নজর কাড়ল ঠিকই কিন্তু তাদের কেউ প্রথম জনের ধারে কাছে যেতে পারল না।

নাচ শেষ হলে রাজা আবার হাত তুলল। আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমাদের চোখে কোন মেয়েটি সব চেয়ে সুন্দরী মনে হল?'

কোনোরকম চিন্তা ভাবনা না করেই আমি বলে ফেললাম, 'প্রথম নর্তকী যে সব চেয়ে সুন্দরী এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না।' কথাটা বলেই খুব অনুতাপ হল; ইনফাদুসের কথা মনে পড়ে গেল। সে বলেছিল সব চেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে ধ্যান গম্ভীর 'ত্রিমূর্তি' পাহাড়ের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়।

রাজা টোয়ালা ঘোষণা করল, 'আমার মন যা বলছে, তোমার মনও তাই বলেছে। আমার চোখ যেভাবে দেখেছে তোমার চোখও সেইভাবে দেখেছে। প্রথম জনই হল নর্তকীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। তার জন্য অবশ্য একটি খারাপ খবর আছে– তাকে অবশ্যই মরতে হবে।'

রাজার পায়ের কাছে বসে থাকা বুড়ি গাগুল ঐ অভাগী মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ফাটা বাঁশের মতো আওয়াজ করে বলল, 'হ্যাঁ, ওকে তো মরতেই হবে।' বিরূপ ভাগ্যের কথা কিশোরী তখনও জানে না, অন্য মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়ে আনমনে একটা ফুল থেকে সে পাপড়ি ছিঁড়ছিল।

আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। আমি বলেই বসলাম, 'এই কিশোরী এত সুন্দর দেখতে! কত সুন্দর নেচে সে আমাদের আনন্দ দিল! আর পুরস্কার হিসাবে সে পেল মৃত্যুদণ্ড! এ কী বিচার তোমার, রাজা?'

টোয়ালা হাসতে হাসতে উত্তর দিল, 'এ তো আমাদের রীতি। দূরে ঐ যে পাথরের ত্রিমূর্তি রয়েছে এ হল তাদের ইচ্ছা। তাদের পাওনা তো চুকিয়ে দিতে হবে। যে মেয়েটিকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর শিরোপা দেওয়া হল তাকে যদি হত্যা না করা হয়, তাহলে আমার ও আমার পরিবারের ঘোর অমঙ্গল হবে। একবার দৈববাণী হয়েছিল, নাচের রাতে যে মেয়েটিকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলা হবে তাকে বলি দিতে হবে ঐ ত্রিমূর্তির কাছে যারা নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে এবং এই দেশের ওপর নজর রাখছে। রাজা যদি তার এই কর্তব্যটুকু পালন না করে তাহলে তার ধ্বংস ঠেকানোর কেউ থাকবে না। আগের রাজা, মানে আমার দাদা শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর চোখের জলে বিগলিত হয়ে এই রীতি অমান্য করেছিল বলেই তার পতন হয়েছে এবং আমি সিংহাসনে বসেছি। এ নিয়ে আমি আর আলোচনা করতে চাই না। ওকে মরতেই হবে। কে আছো! ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো। বাবা স্ক্রগা, এবার তোমার বর্শাটা একটু শানিয়ে নাও তো।'

সঙ্গে সঙ্গে যমদূতের মতো দুটো প্রহরী সারি থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েটির দিকে এগোতে লাগল। এবার তার সাথে কী ঘটতে চলেছে তা বুঝতে পেরে মেয়েটি চিৎকার করে উঠল এবং ছুটে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু যমদূতদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া কি অতই সহজ! কিশোরী নিজের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল, কাঁদতে কাঁদতে নিজের রূপকে অভিশাপ দিতে লাগল। কিন্তু কোনো লাভ হল না। তাকে আমাদের সামনে দাঁড় করানো হল।

বুড়ি তার নাম জানতে চাইল। জীবনের শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে কিশোরী উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। তার আচরণে বুড়ি আরো খেপে গিয়ে বলল, 'আমার সাথে বেয়াদবি করছিস! রাজার খোকাকে বলব নাকি এখুনি তার কাজ সেরে ফেলতে?'

এই সামান্য ইঙ্গিতটুকুতেই কাজ হল। রাজার খোকা স্ক্রাগার চেহারাটা আরো ভয়ানক হয়ে উঠল। কিশোরীকে তাক করে হাতের বর্শাটা সে উঁচু করে ধরল। স্ক্রাগার আচরণ দেখে ক্যাপ্টেন গুডের একটা হাত অন্যমনস্কভাবে রিভলবারের ওপর গিয়ে পড়ল। ওদিকে চোখের জলের ফাঁকে মেয়েটা বর্শার ফলা দেখতে পেয়ে ধস্তাধস্তি থামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। দেখলাম, আতঙ্কে কিশোরীর দেহটা থর থর করে কাঁপছে।

কিশোরীর এই অবস্থা দেখে স্ক্রাগা আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'আমার এই খেলনার স্বাদ পাবার আগেই ও কেমন কাঁদছে দেখো! হা, হা! কথাটা বলে রাজকুমার বর্শার ফলায় আদর করে হাত ছোঁয়াল।

ক্যাপ্টেন গুড নিম্নস্বরে বলল, 'সুযোগ যদি পাই, তোকেও খেলনা দেখাব রে কুত্তা!'

কৌতুক মিশ্রিত কণ্ঠে গাগুল বলল, 'কী হল, মেয়ে একেবারে চুপ করে গেল যে! যাক, এবার নামটা বল তো। না, না, ভয় পেয়ো না।'

কম্পিত কণ্ঠে মেয়েটা উত্তর দিল, 'মা, আমার নাম ফৌলাটা। সুকো বাড়ির মেয়ে আমি। কিন্তু মা, আমি তো কোনো দোষ করিনি, কেন আমায় মরতে হবে?'

কিশোরীর কথায় বুড়ি বেশ মজা পেয়ে বলল, 'এ নিয়ে মন খারাপ করো না। একে মরা বলে না। আদিম কাল থেকে দূরে ঐ যে ত্রিমূর্তি বসে আছে তাদের উদ্দেশে তোমাকে উৎসর্গ করা হবে।' দূরের তিনটা পাহাড় শৃঙ্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বুড়ি বলতে লাগল, 'দিনের বেলায় পরিশ্রম করবার চেয়ে রাতে বিশ্রাম করা ভাল। বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। তোমার কপাল কত ভাল যে রাজপুত্রের হাতে তুমি মারা যাবে!'

কাঁদতে কাঁদতে কিশোরী ফৌলাটা বলল, 'কত নিষ্ঠুর তুমি! আমি কী এমন করেছি যে আগামীকালের সূর্য দেখবার অধিকার আমার থাকবে না? সূর্যাস্তের পর আকাশে যে এক এক করে তারা ফোটে কাল তা দেখবার সৌভাগ্য আমার হবে না? আর কখনো শিশির ভেজা ফুল আমি কুড়াতে পারব না? কুলকুল করে বয়ে চলা নদীর জলের শব্দ আমি শুনতে পাব না! কী পোড়া কপাল আমার যে জন্মভূমিকে আর আমি দেখতে পাব না? মায়ের হাতের ছোঁয়া থেকে চিরতরে আমি বঞ্চিত হব, আমাদের অসুস্থ মেষ শাবকটিকে আমি আদর করতে পারব না। কী দুর্ভাগ্য আমার যে, কোনো

পুরুষ ভালবেসে আমাকে আর জড়িয়ে ধরবে না, আমার চোখের ভিতরে নিজেকে খুঁজবে না কিংবা কোনো সন্তান আমার কোলে আসবে না!'

কিশোরী এবার তার ফুল গোঁজা মাথা ও অশ্রু ভেজা চোখ তুলে অপার হতাশায় মাথার ওপর অসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অসীম হতাশাতেও কিশোরীকে অপরূপ সুন্দরী মনে হচ্ছিল। তার দৃষ্টি দেখলে যে কোনো লোকের মায়া হবার কথা। কিন্তু নির্দয় তিনটি মানুষের মধ্যে কোনো করুণাবোধ জাগরিত হল না। দুর্বত্তরা যখন রাজা আর্থারকে অন্ধ করতে এসেছিল তখন সে যেভাবে তাদের করুণা প্রার্থনা করেছিল কিশোরীর প্রাণ ভিক্ষার আবেদন তার চেয়েও মর্মস্পর্শী ছিল।

রাজার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীদের এবং প্রধানদের মন নরম হয়ে গেলেও বুড়ি গাগুল কিংবা রাজার মনে কিশোরীর চোখের পানি কোনোভাবে রেখাপাত করতে পারল না। ওদিকে ক্যাপ্টেন গুড রাগে ফুঁসছিল। এক সময় মনে হল, প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও কিশোরীকে রক্ষা করতে সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ক্যাপ্টেনের মনে কী ঘটে চলেছে কিশোরী বোধ হয় তা বুঝতে পেরে হঠাৎ ছুটে এসে তার সুন্দর শুভ্র পা দু'টি ধরে ফেলল।

চোখের জলে ক্যাপ্টেনের পা ভিজিয়ে দিয়ে সে বলল, 'হে পিতা, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে বাঁচতে দাও। তোমার দয়া হলে আমার প্রাণ রক্ষা হবে। গাগুল এবং ঐ নিষ্ঠুর লোকগুলোর কবল থেকে আমাকে বাঁচাও।'

ক্যাপ্টেন বলল, 'তোমাকে রক্ষা করবার দায়িত্ব আমার।' হাত ধরে কিশোরীকে দাঁড় করিয়ে সে বলল, 'এখন একটু চুপ করে দাঁড়াও তো সোনা।'

টোয়ালা মুখ ফিরিয়ে এই দৃশ্য দেখে ছেলেকে ইঙ্গিত করতেই সে উদ্যত বর্শা নিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

স্যার হেনরি নিচু গলায় আমাকে বলল, 'তৈরি হও, যা করবার এখুনি কর।'

আমি বললাম, 'আমি তো চন্দ্র গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করছি। আধ ঘণ্টা ধরে আমি তো চাঁদটাকেই দেখে যাচ্ছি। গ্রহণের তো কোনো লক্ষণ দেখছি না।'

স্যার হেনরি বলল, 'ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে, না হলে মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলবে। টোয়ালা খেপে উঠেছে।'

স্যার হেনরির কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমি আরেকবার চাঁদের দিকে তাকিয়ে হতাশ হলাম। এতখানি আগ্রহ নিয়ে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম বোধ হয় কোনো জ্যোতির্বিদ গবেষণার খাতিরেও ততখানি কৌতূহল দেখায় না। ভিন গ্রহের বাসিন্দার গর্ব নিয়ে আমি কিশোরী ও স্ক্রাগার উদ্যত বর্শার মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

কঠিন স্বরে বললাম, 'শোন রাজা, এটা আমি ঘটতে দিতে পারি না, এ জিনিস আমরা সহ্য করব না। মেয়েটিকে অন্যত্র চলে যেতে দাও।'

রাগে, বিস্ময়ে টোয়ালা উঠে দাঁড়াতেই উপস্থিত প্রধানদের ও নারীদের মধ্য থেকে শোকের গুঞ্জন শোনা গেল।

দাঁতে দাঁত ঘষে টোয়ালা গর্জন করল, 'কী বললি সাদা কুত্তা? এটা ঘটতে দিতে পারি না? সিংহের গুহায় ঢুকে তাকে ভয় দেখাচ্ছিস? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

তুই এবং তোর সাথে যারা আছে তাদের সকলকে মুরগীর মতো জবাই করতে পারি, তা জানিস? মেয়েটাকে কিংবা নিজেকে তুই বাঁচাবি কী করে, তা ভেবেছিস? আমার ইচ্ছাতে বাধা দিবি তুই! এখনও বলছি, সরে যা। হেই বেটা, মেয়েটাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছিস কেন? এই প্রহরীরা! এই বিদেশী লোকগুলোকে বেঁধে ফেল।'

রাজার গরম গরম কথা শোনামাত্রই কয়েকটা সশস্ত্র লোক কুটিরের পিছন থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে ধেয়ে এল। ঐ লোকগুলোকে আগের থেকেই ওখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

স্যার হেনরি, ক্যাপ্টেন গুড এবং উমবোপা তিনজনেই তাদের রাইফেল উঁচু করল।

হঠাৎ আমার সাহস যেন বহুগুণ বেড়ে গেল। খুব জোর গলায় আমি বললাম, 'এ কী করছ তোমরা! আমরা হলাম তারকাদের দেশের লোক। আমরা যখন বলেছি এটা ঘটতে দেওয়া হবে না, তার মানে হল এটা ঘটবে না। রাজা, তোমার লোকদের পিছু হঠতে বল। ওরা যদি আর একটি পা এগোয় তাহলে কিন্তু তোমাদের আর রক্ষা থাকবে না। মাথার ওপর ঐ যে চাঁদটাকে দেখছ ওটাকে একেবারে নিভিয়ে দেব আমরা। তখন বারো মাস ঘোর অন্ধকারে থাকতে হবে তোমাদের। দেখতে চাও আমাদের খেলা? এখুনি দেখিয়ে দিচ্ছি, যাতে আর কখনো আমাদের কথার অবাধ্য না হও।'

আমার কথার প্রত্যাশিত ফল পেলাম। সৈনিকরা যে যেখানে ছিল ছবির মতো সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। স্ক্রাগার হাতে যেমনভাবে বর্শাটা ধরা ছিল সেভাবেই থাকল।

গাগুল নাকী সুরে চেঁচিয়ে বলল, 'শোন, ওর কথা শোন, ও বলছে চাঁদটাকে নাকি একেবারে প্রদীপের মতো নিভিয়ে ফেলবে। সেই কাজ করতে পারলে মেয়েটাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর যদি না পারে, তবে মেয়েটার সাথে ঐ চারটা লোককে একেবারে চিরদিনের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হবে।'

হতাশাভরা চোখে আরেক বার চাঁদের দিকে তাকাতেই এক স্বর্গীয় আনন্দে মন নেচে উঠল। তাহলে তো চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে ডায়েরিতে যা লেখা আছে তা সঠিক। চাঁদের কিনারায় একটা হালকা ছায়া পড়তে শুরু করেছে এবং তার চকচকে কেন্দ্রস্থলেও যেন একটা কুয়াশার আস্তরণ বোঝা যাচ্ছে।

দৃশ্যটা দেখেই আমি খুব শান্তভাবে আকাশের দিকে হাত তুললাম। কী বলতে চাইছি তা বুঝতে পেরে স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুড একই রকম আচরণ করল। অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশে আমি প্রাচীন রূপকথার দুর্বোধ্য কয়েকটা লাইন উচ্চারণ করলাম। স্যার হেনরি বাইবেলের আদি সংস্করণ থেকে একটা স্তোত্র আবৃত্তি করল। ক্যাপ্টেন গুডও পিছিয়ে থাকবার পাত্র নয়। অত্যন্ত অশ্রাব্য ভাষায় 'রাতের রানি'-কে সম্বোধন করে ভরাট গলায় বেশ খানিকক্ষণ ধরে কী সব যেন বলল। আমাদের ভাগ্য ভাল যে, আমাদের বলা শব্দ ও বাক্যের অর্থ অন্যদের বোধগম্য হল না।

কাগজের ওপর কালির বিন্দু যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে দেখতে দেখতে চাঁদের ওপর পড়া ছায়াটা সেভাবে বাড়তে লাগল। আমাদের ক্ষমতা দেখে সমবেত কয়েক হাজার লোক বিস্ময়ে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল।

এবার আমাকে আর পায় কে! আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলাম, 'দেখ রাজা, দেখ। দেখ গাগুল, দেখ। উপস্থিত প্রধান, সৈনিক ও নারী তোমরা সকলে ভাল করে দেখে নাও যে শ্বেতকায় ব্যক্তিরা যা বলে তাই করে দেখায়, তারা মিথ্যা আস্ফালন করে না।'

আমি বলেই চললাম; 'তোমাদের সকলের চোখের সামনে চাঁদটা নিভে আসছে, আকাশে যখন রূপার থালার মতো চাঁদ ভেসে থাকবার কথা তখন সেখানে নেমে আসবে গাঢ় অন্ধকার। চাঁদটাকে এভাবে নিভিয়ে দিলাম কেন? এটা করা হল তোমাদের একটা সংকেত দেওয়ার জন্য। হেই চাঁদ, যা, অন্ধকার হয়ে যা! সব আলো এই দেশে থেকে টেনে নে। এই দেশ ও তার বাসিন্দারা গাঢ় তিমিরে ডুবে যাক।'

আমার কথা শুনে বিকট দর্শন সৈনিকরা পর্যন্ত আর্তনাদ করে উঠল। বেশ কয়েক হাজার লোক পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল। বেশ কয়েক শো লোক মাটিতে বসে পড়ে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। সব কিছু দেখে শুনে রাজা তো চুপচাপ হয়ে গেল এবং ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। একমাত্র বুড়ি গাগুল সাহস করে বলতে পারল, 'চাঁদের এই অবস্থা কেটে যাবে, আগেও আমি এই ধরনের ঘটনা দেখেছি। কোনো মানুষই চাঁদকে নিভিয়ে দিতে পারে না। তোমরা ভয় পেয়ো না, চুপ করে বসে থাক, চাঁদের ছায়া সরে যাবে।'

আমিও গর্জন করে উঠলাম, 'দাঁড়াও। এবার মজা দেখাচ্ছি তোমাদের।' উত্তেজনায় একটা তুড়ি লাফ দিয়ে বলতে শুরু করলাম, 'হে চাঁদ! চন্দ্র!, চন্দ্রিমা! কেন তুমি এত শীতল ও চঞ্চল?' ঠিক এই উক্তিটা সম্প্রতি আমি একটা উপন্যাসে পড়েছিলাম।' এতদিন পরে আমার অনুতাপ হয় রাতের প্রদীপ, স্বর্গের রানিকে আমি কেন যে ওভাবে সম্বোধন করে ছিলাম। চাঁদ তো আমাদের সকলের খুবই বিশ্বস্ত বন্ধু। উপন্যাসের আর কোনো উক্তি মনে না পড়ায় আমি এক নাগাড়ে বলে গেলাম 'হে ভাই ক্যাপ্টেন গুড, আমার তো আর কিছু মনে পড়ছে না। যা তোমার মনে ও মুখে আসে তাই ক্রমাগত বলতে থাকো।'

যে মহান দায়িত্ব ক্যাপ্টেন গুডের ওপর দেওয়া হল সে তা যথাযথভাবে পালন করল। একজন নৌবাহিনীর অফিসারের কল্পনা শক্তি যে এত উর্বর তা আমার জানা ছিল না। তার মুখস্থ বলবার ক্ষমতাও বিস্ময়কর। পুরো দশ মিনিট ধরে বিরামহীনভাবে সে কত কী বলে গেল তবে কোনো কথারই পুনরাবৃত্তি করল না।

ইতিমধ্যে চাঁদের গায়ে কালো দাগটা বাড়তে শুরু করেছে এবং সমবেত জনতা আকাশের দিকে চোখ তুলে মন্ত্র মুগ্ধের মতো বসে আছে। চাঁদের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া ছায়াগুলোকে কী রকম অদ্ভুত ও অশুভ মনে হচ্ছিল। নিচে ময়দানে তখন অস্বস্তিকর মৃত্যুর নীরবতা। অখণ্ড নীরবতার মধ্যেই ধীরে ধীরে সময় অতিক্রান্ত হতে লাগল এবং সেই সাথে চাঁদের ওপরকার অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে লাগল। তার অনুজ্জ্বল বলয়টা এখন বেশ বড় এবং নিকটে মনে হল। চাঁদের রঙ তামাটে হল তারপর ধূসর এবং তারও পরে ছাই রঙের হয়ে গেল। এই সময় চাঁদের কালো পাহাড়গুলো বেশ বোঝা যেতে লাগল।

ধীরে ধীরে কালো ছায়াটা এগিয়ে আসতে লাগল। এক সময় তো চাঁদের অর্ধেকটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। পৃথিবীর বাতাসও যেন ভারি হয়ে গেল। অন্ধকার

আরো একটু বাড়লে এত হাজার লোককে আর চেনা যাচ্ছিল না। নিশ্চুপ, নিশ্চল পাথরের মতো তারা দাঁড়িয়ে ছিল। এই বার ক্যাপ্টেন গুড তার বক্তৃতা থামাল।

চাঁদের হারিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা রাজ কুমার স্ক্রাগা আর সহ্য করতে পারল না। সে বলে উঠল, 'শ্বেতাঙ্গ জাদুকররা চাঁদটাকে মেরেই ফেলল, হায়, হায়! এই অন্ধকারে তো এবার আমাদের মরবার পালা।' খানিকটা ভয়ে, খানিকটা ক্রোধে তাড়িত হয়ে স্যার হেনরির বুক লক্ষ্য করে হাতের বর্শাটা সে ছুড়ে মারল। সকলে ধরেই নিল স্ক্রাগার হাতে তার মৃত্যু হল। কিন্তু নাচের অনুষ্ঠানে আসবার আগে আমরা সকলেই তো রাজার উপহার দেওয়া লৌহ জালিকার জামা ভিতরে পরে এসেছিলাম। ফলে বর্শাটা তার বুকে লেগেও ছিটকে অন্য দিকে পড়ল। রাজকুমার স্ক্রাগা দ্বিতীয়বার আঘাত হানবার চেষ্টা করল কিন্তু ততক্ষণে স্যার হেনরি মাটি থেকে ঐ বর্শাটা তুলে রাজ কুমারকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল। পলকের মধ্যে মূর্তিমান বিভীষিকার প্রাণহীন দেহটা মাটিতে পড়ে গেল।

আসন্ন অন্ধকার এবং সেই সাথে এইরকম অকল্পনীয় অশুভ এক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে প্রধান থেকে শুরু করে সৈনিক ও নারীরা সকলেই বেশ ঘাবড়ে গেল। চাঁদটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে বলেই তো এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল তাদের চোখের সামনে। রাজার উপস্থিতিতেও তারা আর নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সকলে ছুটতে শুরু করল। অত্যাধিক ভয় পেয়ে রাজা ছুটতে ছুটতে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গন থেকে বেরিয়ে পড়ল। রাজার পিছনে পিছনে ছুটতে শুরু করল তার দেহরক্ষীর দল। বুড়ি হলেও গাগুল যেন কোথা থেকে শরীরে ও মনে জোর পেল। এবার সেও রাজাকে অনুসরণ করল, সেও দৌড়াতে লাগল। কয়েক মিনিট পর দেখলাম, ময়দানে আমরা চারজন ছাড়া গত রাতে পরিচয় হওয়া জনা কয়েক প্রধান ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সৈনিকের দল দাঁড়িয়ে আছে। ফৌলাটা নামের যে কিশোরীকে কেন্দ্র করে এত বড় ঘটনা ঘটল সে তখনও বলির পাঁঠার মতো ভয়ে কাঁপছে আর ওপাশে পড়ে রয়েছে রাজপুত্র স্ক্রাগার নিথর মৃতদেহ।

আমি প্রধানদের উদ্দেশে বললাম, 'যে সংকেতের কথা তোমাদের বলে ছিলাম তা দিয়েছি। এখন তোমরা যদি এতে বিশ্বাস করে থাকো তাহলে যে নিরাপদ জায়গার কথা তোমরা বলেছিলে সেখানে অবিলম্বে চলে যাওয়া দরকার। চাঁদের আলো আমরা নিভিয়ে দিয়েছি এবং এই অবস্থা এখুনি থামানো যাবে না। চাঁদের আলো ফিরিয়ে দিতে পারি আরো দেড় ঘণ্টা পর। ইতিমধ্যে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চল, আমরা সকলে এখান থেকে চলে যাই।'

আমার প্রস্তাবে ইনফাদুস তৎক্ষনাৎ রাজি হয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। অন্য বিস্ময়ান্বিত প্রধানরাও তাদের সৈনিকদের নিয়ে তার পিছন পিছন চলল। কিশোরী ফৌলাটার হাত শক্ত করে ধরে ক্যাপ্টেন গুড এবং আমরা সকলে একসাথে পথ চলা শুরু করলাম।

পরিখার প্রবেশ দ্বারে যখন পৌছলাম তখন চাঁদটাকে আর চেনাই যাচ্ছিল না। আকাশের বুকে এক একটা করে তারা ফুটে উঠতে লাগল।

একে অন্যের হাত ধরে মাঝে মাঝেই হোঁচট খেতে খেতে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম।

১২
যুদ্ধের প্রাক্কালে

ইনফাদুস ও অন্যান্য প্রধানরা এলাকাটা খুব ভাল ভাবে চিনত বলে অন্ধকারের মধ্যেও পথ চলতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছিল না।

এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আমরা হাঁটলাম। তখন গ্রহণ সমাপ্ত হতে শুরু করেছে। চাঁদের বলয়ের যে অংশটা প্রথমে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল এবার সেটা প্রকাশ পেতে লাগল। দেখতে দেখতে লাল আভা মেশানো রূপালি আলোর রেখা কালো আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। মনে হল, একটা মহাজাগতিক প্রদীপ কেউ যেন শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছে। সেই দৃশ্য কত সুন্দর ও বিস্ময়কর! মিনিট পাঁচেক পর আকাশের তারাগুলো কেমন যেন বিবর্ণ হতে হতে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, তবে চাঁদের আলোয় আমরা কিন্তু চারপাশ ভালই দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখলাম, আমরা লু নামের লোকালয়ের বাইরে চলে এসেছি এবং একটা পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছি। পাহাড়ের ওপরটা একেবারে সমতল এবং প্রায় দুই মাইল পরিধি সেই পাহাড়ের। দক্ষিণ আফ্রিকাতে এই ধরনের পাহাড় মোটেই বিরল নয় এবং এই পাহাড়ের উচ্চতা খুব বেশি নয়। এই পাহাড়গুলো উচ্চতায় দুশো ফুটের বেশি নয় এবং আকৃতিতে ঘোড়ার খুরের মতো। পাহাড়ের বাইরের দিকটা খুব খাড়া এবং বড় বড় পাথরে ঢাকা। ওপরে সমতলে সেনাদলের তাঁবু ফেলা যায় বিনা কষ্টে। এইসব তাঁবুতে তিন হাজার সেনা থাকতে পারে। সেনা ছাউনির জন্য এই জায়গাটা বেশ উপযুক্ত। কষ্ট করে খাড়াই চড়ে ওপরে গিয়ে দেখলাম আশে পাশে এই ধরনের পাহাড় বেশ কয়েকটা আছে এবং সেগুলোতেও বেশ কয়েক হাজার সেনা থাকতে পারে।

পাহাড়ের ওপর সমতল জায়গায় পৌঁছে দেখলাম প্রচুর লোকজন ঘুম থেকে উঠে ঐখানে এসে জড়ো হয়েছে এবং মহাকাশের ঐ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছে। তাদের সাথে কোনো বাক্য ব্যয় না করে আমরা এগিয়ে চললাম এবং সমতলের মধ্যবর্তী স্থানে একটা কুটিরে প্রবেশ করলাম। ময়দানে যে নাচের আসর বসেছিল সেখান থেকে পালিয়ে আসবার সময় আমাদের যে সমস্ত জিনিস থেকে গিয়েছিল সেগুলো নিয়ে দুটো লোক ইতিপূর্বেই কুটিরে এসে হাজির হয়েছে।

ইনফাদুস বলল, 'এই জিনিসগুলো আমি সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে বলেছিলাম।' দেখলাম, ঐসব জিনিসের মধ্যে ক্যাপ্টেন গুডের প্যান্টটি রয়েছে।

নিজের প্যান্টটি যে আর কোনোদিন ফেরত পাবে সেই ভরসা বোধ হয় ক্যাপ্টেন গুডের ছিল না। মহানন্দে ছুটে গিয়ে প্রথমে সেটি হাতিয়ে নিল এবং পর মুহূর্তে পরে নেবার চেষ্টা করল।

তার প্রচেষ্টা দেখে ইনফাদুস মনমরা হয়ে বলল, 'প্রভু নিশ্চয়ই এমন কাজ করবেন না যাতে তার মরাল শুভ্র পা দুখানি আমাদের চোখের অন্তরালে চলে যায়।'

ক্যাপ্টেন গুড নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকল। কুকুয়ানা জাতির লোকেরা এরপর কেবল একবারই তার সাদা পা দুটি দেখবার সুযোগ পেয়েছিল। অবশ্য তারা ক্যাপ্টেনের একদিকের গালের দাড়ি, চলমান দাঁতের পাটি এবং স্বচ্ছ গোলাকার একটি মাত্র চোখ দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

ক্যাপ্টেন গুডের প্যান্টের সাথে জড়িত স্মৃতির কথা ভাবতে ভাবতেই ইনফাদুস আমাদের বলল যে, তার ও তার ঘনিষ্ঠ প্রধানদের অধীনে যত সেনা আছে তাদের সকলকে খুব তাড়াতাড়ি এখানে আসতে বলা হয়েছে। রাত শেষ হবার আগেই যে তারা এসে যাবে ইনফাদুস সে কথা জানাল।

তারা এলে রাজা টোয়ালার অত্যাচার, অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ এবং প্রকৃত রাজাকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তার কথা তাদের বলা হবে। ইগনোসি যখন এখানে উপস্থিত আছে তাকেও সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে।

সকালের দিকে কুকুয়ানা ফৌজের সবচেয়ে বাছাই করা প্রায় কুড়ি হাজার সেনা বড় মাঠটায় সমবেত হলে তাদের চতুর্ভুজ আকৃতিতে মাঠের তিন পাশে দাঁড় করানো হল। স্থানীয় প্রধানরাও নিজ নিজ বাহিনীর পুরোভাগে থাকল।

সকলকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়ে ইনফাদুস সরল ভাষায় তার বক্তব্য রাখল। কুকুয়ানাদের উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা জন্মগতভাবেই সুবক্তা। তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল ইগনোসির জীবন বৃত্তান্ত– কীভাবে রাজা টোয়ালা তার বাবাকে হত্যা করেছিল এবং তার স্ত্রী ও ছেলেকে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছিল। রাজা টোয়ালার অত্যাচারের কাহিনী সকলকে আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে গত রাতে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কতজন নিরপরাধ উচ্চ বর্গের লোককে সকলের চোখের সামনে টোয়ালা খুন করল এবং তাদেরকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি করল তা বিবৃত করল। ইনফাদুস বলেই চলল যে তারকাদের দেশ থেকে শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিরা সব কিছু দেখে অসহ্য হয়ে উঠলেন এবং কত অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করে তারা এই অনাচারের প্রতিকারের নিমিত্ত এই দেশে এলেন। দেশের মানুষের দুর্দশার অবসান ঘটাতে এই দেশের প্রকৃত রাজা ইগনোসিকে সাথে করে নিয়ে এলেন। ইগনোসি এই দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে বহু কষ্ট স্বীকার করেছে। শ্বেতকায় ব্যক্তিরা টোয়ালার নিষ্ঠুরতার অজস্র প্রমাণ পেয়েছিলেন এবং তা অবসান ঘটানোর জন্য এবং ফুলের মতো নিষ্পাপ কিশোরী ফৌলাটার জীবন রক্ষার জন্য আগেভাগেই দেওয়া তাদের সতর্কবাণী অনুযায়ী চাঁদের আলো নিভিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মহা পরাক্রমশালী রাজার তনয় স্ক্রাগাকে কেমন শাস্তি তাঁরা দিয়েছেন তা সকলেই দেখেছে। এখন শ্বেতকায় ব্যক্তিরা চাইছেন ইগনোসিকে এই দেশের সিংহাসনে বসাতে কারণ রাজা হবার বৈধ অধিকার কেবল তারই আছে।

তার বক্তব্য শেষ হলে ইগনোসি সামনে এগিয়ে এল এবং জ্বালাময়ী ভাষায় তার বক্তব্য রাখল–

'মাননীয় প্রধানরা, সৈনিকরা এবং দেশের বাসিন্দারা! তোমরা আমার কাকার কথা শুনেছো। এখন তোমাদের বেছে নিতে হবে সর্বময় কর্তা হিসাবে তোমরা কাকে চাও আমাকে, না যে অবৈধভাবে সিংহাসনে বসে আছে। বর্তমানের রাজা সম্পর্কে আমার কাকা হয়, কিন্তু সে ভ্রাতৃহত্যা করে, তার ভাইয়ের স্ত্রী ও ছেলেকে নির্বাসনে পাঠিয়ে অনাহারে ও ঠাণ্ডায় মেরে ফেলতে চেয়েছিল। ঐ যে প্রধানরা দাঁড়িয়ে আছে ওরা সকলেই আমার শরীরে নাভির পাশে উল্কি দিয়ে আঁকা কুণ্ডলী পাকানো সাপ দেখেছে। তাছাড়া, আমার যদি বৈধ অধিকার না থাকত তাহলে কি এই মহা বলবান শ্বেতকায় ব্যক্তিরা আমাকে সাহায্য করতে সম্মত হতেন? চিন্তা কর, কী মহান কাজ এঁরা করেছেন! পূর্ণিমার রাতে টোয়ালার রাজ্যে অন্ধকার নামিয়ে এনেছেন যাতে টোয়ালার জ্ঞান হয় এবং সেই সুযোগে আমরা নাচের স্থান থেকে পালিয়ে আসতে পারি। এসব তো আমার মনগড়া কথা নয়, তোমাদের চোখের সামনে সব কিছু ঘটেছে।'

উপস্থিত সকলে এক বাক্যে তার কথায় সায় দিল।

ইগনোসি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে হাতের বিশাল কুড়ালটা উঁচু করে ধরে বলল, 'আমিই তোমাদের রাজা। এখানে যদি এমন কেউ থাকে যে আমার দাবি মানতে স্বীকৃত নয়, আমি তাকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার কথার প্রতিবাদ জানাতে বলছি আর তাকে আমার সাথে যুদ্ধ করবার আহ্বান জানাচ্ছি। তার রক্তের সাহায্যে আমি প্রমাণ করব আমি যা বলছি তা সত্য।' কথা শেষ করে হাতের কুড়ালটা সে পুনরায় মাথার ওপরে তুলল। সূর্যের আলো পড়ে অস্ত্রটা চকচক করতে লাগল।

ইগনোসির কথার প্রতিবাদ করবার জন্য কেউ উঠে দাঁড়াল না। একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলতে শুরু করল, 'যদি তোমরা আমাকে তোমাদের রাজা বলে স্বীকার করে নাও এবং আমাকে পরিত্যাগ করবে না বলে কথা দাও তাহলে আমিও শপথ করে বলছি যে আমি তোমাদের বিজয় ও সম্মান এনে দেব। আমি তোমাদের পারিবারিক সুখ ও শান্তি এনে দেব। তোমরাই হবে আমার সামরিক শক্তি। টোয়ালার সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি তোমাদের পরাজয় হয়, সেই পরাজয় হবে আমার।

'শপথ করে আমি একথাও বলছি যে পৈতৃক অধিকারের জোরে ক্ষমতায় এলে এই ভূখণ্ডে রক্তপাত আমি বন্ধ করব। স্বার্থসিদ্ধির জন্য অকারণ কোনো প্রাণহানি আমি হতে দেব না। ন্যায় বিচারের জন্য ব্যর্থ হয়ে তোমাদের চোখের পানি ফেলতে হবে না। ডাইনি বদনাম দিয়ে একটি লোককেও হত্যা করা হবে না। দেশের আইন মান্য করে চললে কাউকে মরতে হবে না। রাত্রিতে নির্ভাবনায় তোমরা ঘুমাতে পারবে এবং দেশের আইনই হবে বিচারের শেষ কথা। এখন বল, তোমরা কাকে চাও– টোয়ালাকে, না আমাকে?'

হাজার কণ্ঠে একটাই উত্তর এল, 'রাজা হিসাবে আমরা তোমাকে চাই।'

ইগনোসি বলল, 'খুব ভাল কথা। একবার ওদিকে তাকিয়ে দেখ, টোয়ালার গুপ্তচররা কীভাবে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে ঘোরা ফেরা করছে। ওরা আরো সৈন্য সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। ওদের উদ্দেশ্য একটাই– তোমাদের মেরে ফেলা, আমাকে মেরে

ফেলা এবং আমার রক্ষাকারীদের শেষ করে দেওয়া। টোয়ালা আমাদের ছাড়বে না, তার অনুগত ও বিশ্বস্ত সেনাদের নিয়ে সে আমাদের সাথে হয় কাল, নয়তো দু'দিন পর যুদ্ধ করতে আসবেই। তখনই আমি বুঝব তোমাদের মধ্যে কারা সত্যিকারের আমার লোক যারা আমাকে ভালোবাসে, আমার জন্য মরতেও ভয় পায় না। বিজয়ের দিনে আমার উপকারী লোককে আমি ভুলে যাব না কথা দিলাম। এখন যে যার বাড়ি ফিরে যাও এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।'

কেউ কোনো কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। একটু পরে একজন প্রধান হাত উঠিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গিতে 'কুম' বলতেই সব সৈন্যরা তার কথার প্রতিধ্বনি করল। এর অর্থ হল, ইগনোসিকে তারা রাজা বলে মেনে নিল। অভিবাদন জানানোর পর সৈনিকরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেল।

আধ ঘণ্টা পর বিভিন্ন সেনাদলের নায়কদের নিয়ে আমরা আলোচনায় বসলাম। এটা বুঝে গিয়েছিলাম যে খুব শীঘ্রই টোয়ালা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে এবং তার অধীনে প্রচুর সৈন্য আছে। পাহাড়ের ওপর থেকে সুবিধাজনক অবস্থানের জন্য টোয়ালার গুপ্তচর ও দূতদের ছোটাছুটি আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। তারা যে রাজার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছিল না। আমাদের স্বপক্ষে দেশের বাছাই করা সৈন্য নিয়ে গঠিত সাতটা বাহিনী অর্থাৎ বিশ হাজার যোদ্ধা ছিল। ইনফাদুস ও অন্যান্য প্রধানদের হিসাব অনুযায়ী টোয়ালার পক্ষে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার সেনা ছিল এবং আগামী দু'একদিনের মধ্যে আরো হাজার পাঁচেক সেনা জুটিয়ে নেবার সম্ভাবনা ছিল। টোয়ালার দল ছেড়ে বেশ কিছু সেনা যে আমাদের দিকে চলে আসবে সে রকম একটা ইঙ্গিত ইনফাদুস দিলেও তার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করা যাচ্ছিল না। আমাদের পরাজিত করবার সব চেষ্টাই যে টোয়ালা করছে তা বোঝা যাচ্ছিল তার সেনাদের তৎপরতা এবং পাহাড়ের পাদদেশে জমায়েত হওয়া দেখে।

ইনফাদুস ও অন্যান্য প্রধানরা মত ব্যক্ত করল যে, যুদ্ধ আসন্ন হলেও তা ঐ দিন শুরু হবে না। শ্বেতকায় ব্যক্তিদের জাদু শক্তির পরিচয় পেয়ে রাজার সেনারা বেশ ভয় পেয়েছে। সেই ভয় কাটাতে আরো একটা দিন সময় লাগবে, তারপরেই যুদ্ধ শুরু হবে। তাদের ধারণা সঠিক ছিল। সমাগত যুদ্ধের জন্য আমাদের প্রস্তুত না হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করলাম। আমাদের গ্রামে যত পুরুষ মানুষ ছিল তাদের সকলকে তৈরি করিয়ে নিলাম। এত কাজ করা হল যে একটা দিনকে মন হল এক ঘণ্টা। আমাদের পাহাড়ে উঠবার যে রাস্তাটা আছে সেটা মোটেই দুর্ভেদ্য নয়। যে সব সৈনিকরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়েছিল তাদের বসবাসের জন্য পাহাড়ি পথের দুধারে অসংখ্য শিবির নির্মাণ করা হয়েছিল। পাহাড়ে ওঠার রাস্তা দুর্গম করতে আমরা তার ওপর বড় বড় পাথর ছড়িয়ে রাখলাম, বেশ কিছু জায়গায় স্তূপ করে রাখলাম। শত্রুসৈন্য এলে ওগুলো ওপর থেকে গড়িয়ে দেওয়া হবে। পথের নানা জায়গায় সেনা ঘাঁটি তৈরি করা হল এবং এক একজন দক্ষ প্রধানকে তার দায়িত্বে রাখা হল।

সূর্যাস্তের খানিক আগে একটা ছোট সেনাদলকে লু থেকে আমদের পাহাড়ের দিকে আসতে দেখলাম। দলের পুরোভাগে যে লোকটা ছিল তার হাতে পামগাছের একটা

ডাল ছিল। তার মানে, এই লোকটা একটা দূত; রাজার তরফ থেকে কোনো সংবাদ নিয়ে আসছে।

লোকটা আরো কিছুটা এ য়ে এলে ইনফাদুস, ইগনোসি ও আমরা কয়েকজন পাহাড় থেকে নেমে নিচে গে ম তার সাথে কথা বলবার জন্য। লোকটার চেহারা একেবারে বীর পুরুষের মতো এবং তার পরনে ছিল চিতাবাঘের চামড়া দিয়ে তৈরি একটা পে শাক।

কাছা গছি এসে লোকটা ব ল, 'রাজার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করতে চায়, অকল্যাণ তাদেরই হয়। রাজা তাদের অভিনন্দন জানিয়েছে। এ হল সিংহের বিরুদ্ধে শেয়ালের যুদ্ধ; সিংহ তার অভিনন্দন জানিয়েছে।'

আমি বললাম, 'রাজার বার্তা কী, তা বল।'

সে জানাল, 'রাজা বলে পাঠিয়েছে, করুণা ভিক্ষা করে তার কাছে আত্মসমর্পণ কর। কালো ষাঁড়ের পিঠ ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং রাজা তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।'

কৌতূহলী হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, 'টোয়ালার শর্ত কী?

দূত উত্তর দিল, 'মহান রাজার শর্তও মহান, করুণায় ভরা তার শর্ত। পরাক্রমশালী, এক চক্ষু, হাজার পত্নীর কর্তা, কুকুয়ানাদের সর্বময় প্রভু, সলোমনের রাজপথের রক্ষক, তিন মৌন পাহাড়ের ওপর থেকে যারা আমাদের ওপর নজর রাখছে সেই অজানাদের প্রিয় পাত্র, কালো গাভীর শাবক, পৃথিবী পদদলিত করা ঐরাবতের মতো শক্তিশালী, পাপাচারীদের যম, মরুভূমি কাঁপানো বিশাল উটপাখি সদৃশ, কৃষ্ণকায় ও মহাজ্ঞানী রাজার রাজা টোয়ালা আমার মাধ্যমে যে বার্তা দিয়েছে তা হল : অল্প রক্ত পেলেই আমি সন্তুষ্ট হব এবং তোমাদের মার্জনা করব। তোমাদের প্রতি দশ জনের মধ্যে এক জনের প্রাণ নেব আমি এবং বাকিরা নির্বিঘ্নে বাস করবে। তবে আমার ছেলে স্ক্রাগাকে যে শ্বেতকায় ব্যাক্তি হত্যা করেছে তাকে তো আর ছেড়ে দিতে পারি না। তার কৃষ্ণকায় চাকর কিনা আমার সিংহাসনে বসতে চায়! তাই ঐ দুর্বৃত্তসহ আমার ভাই ইনফাদুস এবং যারা আমার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিচ্ছে তাদের সকলকে মরতে হবে। তাদের সকলকে আমি মৌন ত্রিমূর্তির কাছে বলিদান দেব। এই করুণাভরা প্রস্তাব রাজা টোয়ালা আমার মাধ্যমে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছে।'

অন্যদের সাথে একটুখানি পরামর্শ করে আমি এত জোরে উত্তর দিলাম যাতে উপস্থিত সকলে শুনতে পায়। বললাম, 'আরে কুত্তা, টোয়ালার কাছেই ফিরে যা। তাকে গিয়ে বল : ইগনোসি হচ্ছে প্রকৃত রাজা। যে শ্বেতকায় ব্যক্তিরা তারকাদের দেশ থেকে এখানে এসেছে তারা নিজেদের ক্ষমতার বলে পূর্ণিমার চাঁদকে নিভিয়ে দিয়েছিল। রাজ পরিবারের সদস্য ইনফাদুস এবং এখানে সমবেত প্রধান ও অন্যান্য সৈনিকরা সকলেই এক বাক্যে জানিয়ে দিচ্ছে টোয়ালার কাছে আত্মসমর্পণ তারা করবে না; তারা আরো বলেছে যে আগামী দুদিনের মধ্যে টোয়ালার শব তার নিজের বাড়ির সামনেই পড়ে থাকবে। টোয়ালা খতম হয়ে গেলে সে যার বাবাকে হত্যা করেছিল সেই ইগনোসি তার সিংহাসনে বসবে।'

টোয়ালার দূত খুব জোরে জোরে হেসে বলল, 'ফাঁকা বুলিতে কোনো কাজ হয় না মশাই। এই সাহসটা কাল দেখিও যদি বীর হও, আগামীকাল যুদ্ধে তার পরিচয়

দিও। আমাদের সাথে যুদ্ধ, মজাটা কী জানো তোমার শরীরে পচন ধরবার আগেই শরীরের হাড়গুলো আলাদা হয়ে যাবে। কাল রণক্ষেত্রে দেখা হবে। আশা করি, আমাদের ভয়ে এখান থেকে পালিয়ে তারকাদের দেশে চলে যাবে না।' নানাভাবে আমাদের বিদ্রূপ করে রাজার দূত ফিরে গেল। একটু পরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল।

রাত যত বাড়তে লাগল আমাদের ব্যস্ততাও তত বৃদ্ধি পেল। চাঁদের আলোর সুবিধা নিয়ে পরের দিন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। আমাদের দূতরা বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা রকম খবর নিয়ে আসতে লাগল। মধ্য রাত্রির এক ঘণ্টা পর আমাদের করণীয় কাজ সমাপ্ত হল এবং শিবিরের সান্ত্রী ছাড়া আর কেউ জেগে থাকল না। ইগনোসিকে সঙ্গে নিয়ে আমি ও স্যার হেনরি বেরিয়ে পড়লাম শিবিরের বিভিন্ন প্রবেশ দ্বারে প্রহরীরা সজাগ আছে কিনা দেখার জন্য। দূরে দাঁড়িয়ে চাঁদের আলোয় বর্শার ফলার ঝলসানি দেখে বুঝলাম প্রহরীরা কেউই ঘুমায়নি এবং প্রত্যেকেই সজাগ আছে। ফিরবার পথে আমরা অসংখ্য নিদ্রিত সৈনিককে দেখলাম। তাদের মধ্যে হয়ত অনেকে শেষ ঘুম ঘুমাচ্ছে।

সৈনিকদের বর্শার ফলা থেকে প্রতিফলিত চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছিল যেন অসংখ্য অশরীরি জীব শুয়ে আছে। তাদের মাথায় বাঁধা পালকের টুপিগুলো রাতের শীতল হাওয়ায় নড়ছিল, দূর থেকে তাও বোঝা যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাত-পা ছড়িয়ে আবার কেউ কেউ পা গুটিয়ে শুয়েছিল। চাঁদের আলোয় তাদের খুব ক্লান্ত লাগছিল।

'আগামীকাল এই সময় এদের কতজন বেঁচে থাকবে বলে তোমার মনে হয়?' স্যার হেনরি প্রশ্ন করল।

নিদ্রিত লোকগুলির দিকে আমি আরেকবার তাকালাম। মানুষগুলিকে দেখে আমারও মনে হল, মৃত্যু ইতিমধ্যে তাদের স্পর্শ করে ফেলেছে। মনের চোখে তাদের কয়েকজনকে আলাদা করতে পারলাম যারা মৃত্যুর দ্বারা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। জীবনের অসারতা, শোক এবং রহস্যের কথা চিন্তা করে আমার মন ভারি হয়ে গেল। এই কয়েক হাজার লোক আজকের রাতে কত নির্বিঘ্নে নিদ্রা যাচ্ছে কিন্তু আগামীকাল রাতে কী হবে! এদের মধ্যে অনেকের, হয়ত আমাদেরও, শরীর খোলা আকাশের তলায় শক্ত হয়ে পড়ে থাকবে। কত পত্নী তাদের স্বামীকে হারাবে, কত সন্তান তাদের বাবাকে হারাবে। এই লোকগুলি আর কোনোদিন তাদের জন্মভূমি দেখে চোখ ভরাতে পারবে না। আকাশের ঐ চাঁদের শীতল কিরণ কালকেও পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়বে, রাতের সমীরণ এমনি ভাবে ঘাসের ওপর দিয়ে বয়ে যাবে। বিশাল পৃথিবী তার অপার বিস্ময়ের ভাণ্ডার নিয়ে আমাদের জন্মের পূর্বে যেমন ছিল, আমাদের চলে যাওয়ার পরও একই ভাবে থেকে যাবে।

মা বসুন্ধরা যদি টিকে থাকে তাহলে মানুষ শেষ হয় কীভাবে? মানুষের নাম হারিয়ে যায় কিন্তু যে বাতাস সে গ্রহণ করেছিল তা এই পৃথিবীর বুকে, পাইনগাছের পাতার ফাঁকে থেকেই যায়; যে কথা সে বলেছিল তা মহাশূন্যে অনুরণিত হতে থাকে; তার চিন্তা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে; তার অনুপ্রেরণা সন্তানদের উজ্জীবিত করে; তার আনন্দ ও বিষাদ অন্যদের কাছে সুপরিচিত হয়ে থেকে যায়।

অনির্বাণ আধ্যাত্মিক সত্তার সমষ্টি হল এই বিশ্ব সংসার। এই সত্তার সাথে অন্য সত্তার মিশ্রণ ঘটে; সত্তার পরিবর্তন হয় কিন্তু কখনো বিলোপ ঘটে না।

চিন্তার নানা তরঙ্গ আমার মনে বয়ে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে ভাবি, এই চিন্তা থেকে আমাকে মুক্তি পেতে হবে কিন্তু তা আর হয় না। নিদ্রিত সৈনিকদের সারি দেখে দার্শনিকের উক্তি মনে পড়ল, 'এ যেন বর্শার ফলার ওপর ঘুমিয়ে পড়া।'

স্যার হেনরিকে মনের কথাটা বলেই ফেললাম, 'দেখ কার্টিস, আমার কিন্তু খুব ভয় করছে।'

নিজের হলুদ রঙের দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে সে জবাব দিল, 'তুমি আগেও এই ধরনের কথা বলেছ, এর কোনো গুরুত্ব নেই।'

আমি উত্তর দিলাম, 'এখন যা বলছি, তা একেবারে মনের কথা। আগামীকাল আমাদের একজনও বেঁচে থাকবে কিনা সন্দেহ আছে কারণ রাজার সৈন্য বাহিনী আমাদের তুলনায় অনেক বড়।'

স্যার হেনরি বলল, 'দেখ, এইসব যুদ্ধ-টুদ্ধের মধ্যে আমরা অহেতুক জড়িয়ে পড়লাম। আমি তো এসেছিলাম ভাইকে খুঁজতে। মনে হচ্ছে, তাকে আর পাব না। এই যুদ্ধে আমাদের কী স্বার্থ আছে? তবে পরিস্থিতির মোকাবিলা শক্ত হাতেই করতে হবে। বীর পুরুষই সৌভাগ্য লাভ করে। অতএব ভয় না পেয়ে আমাদের সুনাম রক্ষার খাতিরে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে জয় লাভ করতেই হবে।'

স্যার হেনরির কণ্ঠে অনুতাপ থাকলেও তার চোখের দৃষ্টিতে বিষণ্নতার লেশ মাত্র ছিল না। আমার মনে হল, স্যার হেনরি কার্টিস যুদ্ধ করতে মজাই পাবে।

অতি অল্প সময় ঘুমানোর পর ইনফাদুসের ডাকে উঠে পড়তে হল খুব ভোরে। সে বলতে এসেছে রাজার গ্রাম 'লু'-তে বেশ কর্মব্যস্ততা লক্ষ করা যাচ্ছে এবং বেশ কিছু রাজসৈন্য আমাদের ঘাঁটির দিকে এগিয়ে আসছে।

আসন্ন লড়াইয়ের জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে নিলাম। রাজার উপহার দেওয়া লৌহ জালিকার জামাটা ভিতরে অন্তর্বাসের মতো পরে নিয়ে ওপরে সৈন্যদের উর্দি পরে নিলাম। স্যার হেনরি আমাদের বলল, 'কুকুয়ানাদের দেশে থাকবার সময় কুকুয়ানাদের মতোই আচরণ করবে।' লৌহ জালিকার জামাটা তার গায়ে খুব সুন্দরভাবে সেঁটে গেল যেমন, হাতের সাথে দস্তানাও মাপে মাপে লেগে গেল। ইতিমধ্যেই ইনফাদুসের সাহায্যে সে নিজের শরীরের মাপ মতো স্থানীয় সৈনিকের পোশাক আনিয়ে নিয়েছিল। উচ্চ পদস্থ সেনা অফিসারদের কায়দায় নিজের গলায় সে একটা নেকড়ের চামড়ার ফিতে লাগিয়ে নিল। সেনা নায়কেরা মাথায় যেমন কালো উট পাখির পালক বেঁধে নেয় হেনরি ঠিক তাই করল। সাদা গরুর লেজ কোমরে বেঁধে, চটি পরে হাতে বড় একটা কুড়াল নিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল। অবশ্য যে জিনিসটাকে সে নিতে ভুল করল না সেটা হল তার রিভলবার। তার সামরিক পোশাকের মধ্যে একটা গ্রাম্য ছাপ থাকলেও এটা স্বীকার করতে হবে যে, জাত সৈনিক না হয়েও সামরিক পোশাকের ছদ্মবেশে স্যার হেনরি কার্টিসকে একেবারে বীর পুরুষের মতোই লাগছিল। একটু পরে ইগনোসি এল। তার পরনেও সামরিক পোশাক। এই পোশাকে দুজনকে কী সুন্দর না লাগছিল! তাদের পুরুষালি চেহারার পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল।

ক্যাপ্টেন গুড তো নিজের প্যান্ট ছাড়া অন্য কিছুই পরতে চাইছিল না। এতদিন পরে সে নিজের প্যান্টখানি ফেরত পেয়ে সেটিকে আর তুলে রাখতে চাইছিল না। তার চেহারা সবল হলেও তার অন্য বৈশিষ্টগুলিই চোখে পড়ে যেমন, তার গালের দাড়ি যেটা কেবল এক দিক কামানো, চোখের চশমা ইত্যাদি। এবার আমার কথা বলি, লৌহ জালিকার তৈরি জামাটা আমার গায়ে খুব ঢিলে হল। তাই ঠিক করলাম, অন্য সব জামাকাপড় পরবার পর সোয়েটারের মতো ওটাকে চাপিয়ে নেব। যুদ্ধক্ষেত্রে খালি পায়ে যাওয়াটা ভাল বলে মনে হল। এর সুবিধা হল, তেমন বুঝলে খুব দ্রুত গতিতে রণক্ষেত্র থেকে ছুটে পালানো যায় তবে যুদ্ধক্ষেত্রের মতো জায়গায় যেতে হলে মানানসই কিছু জিনিসপত্র তো লাগেই। তাই মাথার টুপিতে আমি একটা বড় পালক লাগিয়ে নিলাম। ব্যবহার করতে না জানলেও এক হাতে ঢাল ও অন্য হাতে একটা বর্শা নিলাম, তবে শেষ রক্ষা করতে পারে কেবল রিভলবার। তাই সেটাকে তো ফেলে আসা যায় না। আমরা চার জনেই কিন্তু একটা করে রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে নিতে ভুললাম না। তবে রাইফেল নিলেই তো হবে না, কার্তুজ চাই। কার্তুজ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকজন লোককে দায়িত্ব দেওয়া হল।

অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে আমরা তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে পাহাড়ের ওপর টেবিলের উপরিভাগের মতো যে সমতল জায়গাটা আছে তা দেখবার জন্য রওয়ানা দিলাম। সেখানে বাদামি রঙের পাথর দিয়ে তৈরি একটা বড় থাম ছিল। শত্রুসেনার ওপর নজরদারি করতে ঐ জায়গাটা খুব কাজে লাগবে। তাছাড়া ঐ জায়গাটা আমাদের সদর কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করাও যাবে। ইনফাদুস তার পাঁচ হাজার সেনা নিয়ে ওখানে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। কুকুয়ানাদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ ও সাহসী সেনা হল এরাই। এই সেনাদলকে জরুরি অবস্থায় কাজে লাগানো হবে বলে তাদের বিশ্রাম নিতে বলা হল। খোলা মাঠে ঘাসের ওপর তারা এখানে ওখানে শুয়ে থাকল কিন্তু তাদের চোখ থাকল নিচে রাজসেনাদের গতিবিধির ওপর। লু থেকে পিঁপড়ের মতো সারি দিয়ে সেনারা বেরিয়ে আসছে। বিরামহীনভাবে তারা বেরিয়ে আসছে। 'লু' থেকে তিনটা বাহিনী বেরিয়ে আমাদের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। প্রতিটা বাহিনীতে এগারো থেকে বারো হাজার সৈন্য ছিল।

'লু' থেকে বেরিয়ে বাহিনী তিনটা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একটা গেল ডানদিকে, আরেকটা বাঁ দিকে এবং তৃতীয়টা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

ইনফাদুস বলল, 'ওরা তিন দিক থেকে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে।'

তার হিসাবটা যে ভয়প্রদ তা বুঝতে কারো বাকি থাকল না। যে পাহাড়ের ওপর আমরা আছি তার পরিধি দেড় মাইল। তিন দিক থেকে এলে শত্রুরা তো আমাদের একেবারে পিষে মেরে ফেলবে। আবার এটাও আগে ভাগে বোঝা যাচ্ছে না আক্রমণ প্রথম কোন দিক থেকে আসবে। ঠিক হল, কিছু কিছু সৈন্য তিন দিকেই মোতায়েন করা থাকবে। আঘাত এলে প্রত্যাঘাত যদি করা যায় তো শত্রুর মনোবল ভেঙে যাবে।

১৩
আক্রমণ

কোনোরকম চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে ধীর গতিতে এবং স্বাভাবিক ছন্দে রাজকীয় সেনার তিনটি বাহিনী আমাদের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমাদের অবস্থানের পাঁচশো গজ দূরে রাস্তাটা দুভাগ হয়ে একটা অংশ পাহাড়ে উঠে এসেছে। ঠিক ঐ জায়গায় সেনাদলটা থেমে গেল, তারপর সেনাদলের মধ্যবর্তী বাহিনীটা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল এবং অন্য দুটো বাহিনী দুদিক থেকে অশ্বক্ষুরাকৃতি পাহাড়কে ঘিরে ফেলতে লাগল। তাদের উদ্দেশ্য, তিনটা বাহিনীই এক যোগে আক্রমণ চালাবে।

ক্যাপ্টেন গুড বলল 'ঐ সেনাদলকে আমি কুড়ি মিনিটের মধ্যে সাফ করে দিতে পারি।'

স্যার হেনরি আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আচ্ছা, কোয়ার্টারমেইন, তুমি যদি গুলি চালাও তাহলে কি ঐ অফিসারকে মারতে পারবে?'

তার খোঁচাতে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। ঠিক করলাম, ঐ অফিসারকে মেরে আমার দক্ষতা প্রমাণ করব। অফিসারটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে আরো দশ গজ এগিয়ে এসে আমাদের ওপর নজরদারি করতে লাগল। এই সময় এক বেয়ারা তার পাশেই ছিল। আমি দেখলাম এই সুযোগ। যে দূরত্বে সে আছে সেখানে বন্দুকের গুলি পৌঁছে যাবে। হিসাব করে দেখলাম তার সাথে বন্দুকের নলের দুরত্ব সাড়ে তিনশো গজ। তাকে লক্ষ্য করে আমি বন্দুক নিয়ে তৈরি থাকলাম। যখন সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলাম যে আমার গুলি ঐ অফিসারের হয় গলা, নয় বুক চিরে বেরিয়ে যাবে ঠিক তখনই ট্রিগারে চাপ দিলাম। বন্দুকের নল থেকে খানিকটা ধোঁয়া বের হল। বন্দুক নামিয়ে দেখলাম, অফিসার সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই আছে। তবে তার বেয়ারাটা পাশেই মাটিতে পড়ে আছে। তার মানে, বেয়ারাটা শেষ হয়ে গিয়েছে। হয়ত উত্তেজনায়, না হয় বাতাসের বেগের জন্য কিংবা দূরত্বের জন্য বন্দুকের গুলি সামান্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। অফিসারের বদলে তার বেয়ারা মারা গেলেও আমি কিন্তু আশানুরূপ ফল পেলাম। সঙ্গীর মৃত্যু, পাহাড়ের ওপর বন্দুকের আওয়াজ এবং ধোঁয়া দেখে অফিসার প্রাণ ভয়ে নিজের সেনাদলের দিকে দৌড়াতে লাগল।

ক্যাপ্টেন গুড এই সাফল্যের জন্য আমাকে অভিবাদন জানাল। কিন্তু আমি সফল হয়েছি কোথায়! আমি তো অফিসারকে নিশানা করেছিলাম। ক্যাপ্টেনের

আনন্দ দেখে আমার যথেষ্ট রাগ হল। যে কাজটা মানুষ খুব দক্ষতার সাথে করে, সুনাম বজায় রাখবার জন্য সেই কাজে কখনো সে ফাঁকি দেয় না। এখন বন্দুকবাজ হিসাবে আমার সুনামটাই তো স্পষ্ট হয়ে গেল। অন্যেরা বুঝতে না পারলেও আমার ব্যর্থতা আমি বুঝেছি। সুনাম পুনরুদ্ধারের জন্য আমি বন্দুকের দ্বিতীয় নলটাকে কাজে লাগালাম। অফিসারকে লক্ষ্য করে আমি দ্বিতীয় নল দিয়ে গুলি ছুড়তেই অফিসারটা হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এবার আমার লক্ষ্য একেবারে অব্যর্থ! মানুষ নিজের গর্ব, সুনাম ও সুরক্ষার জন্য সবই করতে পারে। ফিসারের মৃত্যুর দৃশ্য দেখবার মতো মনের কঠোরতা কীভাবে এল তা ভেবে আমার কষ্ট হল '

আমাদের পক্ষের যে সব সৈন্য বা প্রধান এই দৃশ্য দেখল তারা উন্মত্তভাবে আমার প্রশংসা করতে লাগল। দূর থেকে একটা মানুষকে মেরে ফেলাটা যে শ্বেতকায় ব্যক্তিদের জাদু বিদ্যার সাহায্যেই সম্ভব এ বিষয়ে তাদের কোনো সন্দেহ থাকল না। এই ঘটনাকে তাদের বিজয়ের শুভ ইঙ্গিত বলে ধরে নিল তারা। অপর দিকে, নিহত অফিসারের সৈনিকদের মনোবল একেবারে ভেঙে গেল। স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুড এবার তাদের রাইফেল তুলে নিয়ে গুলি চালাতে শুরু করল, আমিও যে হাত গুটিয়ে বসে থাকলাম তা নয়, দু-একটা গুলি আমিও চালালাম।

গুলি চালানো বন্ধ করবার একটু পরেই একটা গর্জন শুনতে পেলাম। সেটা আসছিল আমাদের ডান দিক থেকে, সাথে সাথে বাঁ দিক থেকেও আওয়াজটা আসতে শুরু করল। রাজকীয় সেনাদের দুটো দল দুদিক থেকে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে।

তাদের আগমনের বার্তা পেয়ে আমাদের সৈন্যরা ধীর গতিতে এগিয়ে গেল। তারা এতই শান্ত ছিল যে খুব নিচু গলায় গানও করছিল। আমরা তিনজন ছাড়াও গুলি চালানোর কাজে ইগনোসি মাঝে মাঝে হাত লাগাচ্ছিল। কিন্তু শত্রু সৈন্য একেবারে সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো আসছিল। সাগরের ঢেউ আটকানোর জন্য পাথর ছুড়লে যে ফল পাওয়া যায় এই বিশাল সেনাবাহিনীর ওপর গুলি চালালেও সেই ফল পাওয়া যেত।

বর্শা ঘোরাতে ঘোরাতে এবং চিৎকার করতে করতে তারা বড় বড় পাথরের পিছনে লুকিয়ে রাখা আমাদের ঘাঁটিগুলোর দিকে এগোতে থাকল। কিছুটা চড়াই ওঠবার পর তাদের গতি কমে এল। এতক্ষণ আমরা কোনো প্রতিরোধ করিনি বলে তাদের মনে সন্তুষ্টির ভাব জেগে থাকবে। দ্বিতীয় কারণ হল, পাহাড়ে উঠতে হলে দম নেবার জন্য মাঝে মাঝে থামতেই হবে। পাহাড়ে ওঠার মাঝপথে ছিল আমাদের প্রথম বাহিনী, তার পঞ্চাশ গজ পিছনে ছিল দ্বিতীয় বাহিনী, তৃতীয় এবং শেষ বাহিনী ছিল পাহাড়ের মাথায় সমতল ভূমিতে।

রণ হুঙ্কার দিতে দিতে তারা এগিয়ে আসছিল। আমাদের সৈন্যরা সমস্বরে চিৎকার করছিল, 'টোয়ালা নিপাত যাক, ইগনোসি জিন্দাবাদ।' শত্রুসৈন্য এগিয়ে আসছিল, তাদের কোমরে গোঁজা ছুরিগুলো চক চক করছিল।

শত্রুসেনার চাপে আমাদের প্রথম সেনাদল পিছু হটতে বাধ্য হল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় দল মিলেমিশে গেল। এইখানে বেশ ঘোর যুদ্ধ হল এবং

আমাদের সৈন্যদলকে আরো পিছিয়ে আসতে হল। মিনিট কুড়ি যুদ্ধের পর তৃতীয় দলকেও আসরে নামতে হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আক্রমণকারীদের মনোবল বেশ ভেঙে গেল কারণ তাদের বেশ কিছু লোক হত কিংবা আহত হয়েছিল এবং আমাদের দলের সৈন্য সংখ্যা দেখে তারা শঙ্কিত হয়েছিল। শত্রুসেনারা সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো কখনো সামনে আসছিল, কখনো পিছনের দিকে সরে যাচ্ছিল। স্যার হেনরি খুব কৌতূহলের সাথে বেশ খানিকটা সময় ধরে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি লক্ষ করবার পর কাউকে কোনো কথা না বলে হঠাৎ যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করল। তার পিছন পিছন চলে গেল ক্যাপ্টেন গুড। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম।

তার মতো সুঠাম চেহারার দীর্ঘকায় একজনকে সাথে পেয়ে আমাদের সেনারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'গজরাজ-জিন্দাবাদ।'

এই মুহূর্ত থেকে যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আর থাকল না। আমাদের সেনাদের রণকৌশলে শত্রুসেনারা ধীরে ধীরে পিছু হটতে লাগল। একটা সময় এল যখন তারা পাহাড়ের পাদদেশে পৌছাল এবং আরো একটু পরে তারা আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য সংরক্ষিত সেনাদলের ঘাঁটিতে প্রাণভয়ে ঢুকে গেল। ঠিক সেই সময় এক বার্তাবহ এসে জানাল যে বাঁদিকের শত্রুসেনারা পিছু হঠে গিয়েছে। এই সুখবরের আনন্দটুকু আর উপলব্ধি করতে হল না কারণ আমাদের সৈন্যরা যারা পাহাড়ের ডান দিকে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তারা শত্রুদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসছে। শত্রুসেনারা এই প্রান্তরে সফল হয়ে আমাদের সেনাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছে।

ইগনোসি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখে সে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা ভাল কাজ করে বসল। জোর গলায় সৈন্যদের সে হুকুম দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জরুরি অবস্থার জন্য সংরক্ষিত সেনারা শত্রুর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ইগনোসি আবার একটা হুকুম দিল। অন্যান্য সেনানায়করা তার হুকুমের পুনরাবৃত্তি করতেই অন্য একটা দল যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে এগোতে লাগল। বিরক্তি সহকারে দেখলাম এই দলের সেনারা আমাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। ইগনোসির বিশাল চেহারার পিছনে আমি আশ্রয় নিতে চাইলেও লাভ হল না। পিছনের ভিড়ের ঠেলায় আমি এমনভাবে এগোচ্ছিলাম যেন মৃত্যুবরণ করে আমি কতই না আনন্দ পাব। আমার চারদিক থেকে কানে তালা লাগানো মানুষের কোলাহল এবং ঢালের ধাতব আওয়াজ ভেসে আসছিল। হঠাৎ শত্রু পক্ষের একটা দৈত্য আমাকে দেখতে পেল। তার চোখ দুটো যেন কপালের ওপর বসানো ছিল এবং সেই বিস্ফারিত চোখের রঙ ছিল একেবারে জবা ফুলের মতো লাল। লোকটার হাতে ছিল একটা বর্শা। আমাকে দেখেই সে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। লোকটার চেহারা দেখে অতি বড় সাহসী ব্যক্তিও জ্ঞান হারাবে। আমি তো বাঁচবার আশা ছেড়ে দিয়ে একটা কাজ করলাম। দৈত্যটা যখন সবেগে আমার দিকে ছুটে এল আমি নিমেষের মধ্যে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। লোকটা আমার শরীরে হোঁচট খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল। বিদ্যুৎ গতিতে আমি মাটি

ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রিভলবার বের করে এক গুলিতে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দিলাম।

এই ঘটনার পর কেউ যেন আমাকে প্রচন্ড ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল এবং আমি জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরলে দেখলাম ক্যাপ্টেন গুড আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে এবং তার হাতে ধরা আছে জলের একটা পাত্র। চোখ খুলতেই আমি কেমন বোধ করছি তা সে জানতে চাইল। তার কথা শুনে আমি উঠে বসলাম।

সে বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওরা যখন তোমাকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল তখন আমি সবচেয়ে খারাপটাই ভেবেছিলাম।'

আমি বললাম, 'কেউ আমার মাথায় সজোরে আঘাত করেছিল বলে জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম। কিন্তু তার পর কী হয়েছিল বল তো।'

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'বিভিন্ন জায়গায় ওদের ছত্র ভঙ্গ করে দিয়েছি আমরা। আমাদের দলের হতাহতের সংখ্যা দু'হাজার হলে ওদের সংখ্যাটা তিন হাজার ছাড়িয়ে যাবে, ওদিকে তাকালেই সব দেখতে পাবে।' দেখলাম, মৃতদেহ কিংবা আহত সৈনিকদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অসংখ্য দল যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়েছে। চারজন লোক নিয়ে এইরকম এক একটা দল গঠিত হয়েছে।

প্রতি দলের কাছে আছে পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি একটা করে স্ট্রেচার। কুকুয়ানারা মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ধরনের স্ট্রেচার ব্যবহার করে থাকে। আহত লোকদের নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পরেই চিকিৎসকরা তাদের পরীক্ষা করছে। প্রতিটা সেনাদলে অন্তত দশজন চিকিৎসক আছে। যদি দেখা যায় আঘাত খুব গুরুতর নয় তাহলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অবশ্য আঘাত খুব মারাত্মক হলে তার চিকিৎসা পদ্ধতি আলাদা। চোট খুব গুরুতর হলে আহত ব্যক্তি যাতে দ্রুত আরাম পায় সে ব্যবস্থাও আছে। চিকিৎসার আবরণে ডাক্তার আহত ব্যক্তির ধমনী কেটে দিচ্ছে। এতে মাত্র দুই মিনিটেই রোগীর জীবনাবসান ঘটছে এবং সেই মৃত্যু একেবারে যন্ত্রণাবিহীন। এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অসংখ্য লোকের ওপর প্রয়োগ করা হচ্ছে দেখলাম। কুকুয়ানাদের বর্শা সাধারণত চওড়া হয়, সেই বর্শা মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় ওষুধ এবং মলম লাগিয়ে তার নিরাময় করা সম্ভব হয় না। বর্শার আঘাতে মানুষ প্রথমেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে, অতএব তাকে নিয়ে যা খুশি করা যায়। যারা জ্ঞান হারায়নি অথচ গুরুতরভাবে আহত, তাদের ধমনী কেটে দেওয়া হয় একেবারে অচকিতে এবং বিদ্যুৎ গতিতে। চিকিৎসার নামে এই ধরনের হত্যা দেখা এক কষ্টকর অভিজ্ঞতা। একবার আমার অভিজ্ঞতাটা একটু ভিন্ন ধরনের হয়েছিল। দেখেছিলাম, খুব গুরুতর আহত যোদ্ধাদের যন্ত্রণা মুক্তির জন্য তাদের জ্যান্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলা হচ্ছিল। সোয়াজি সম্প্রদায়ের লোকরা এই পদ্ধতিতে কাজ করছিল।

অন্য এক জায়গায় গিয়ে দেখলাম স্যার হেনরি, ইগনোসি এবং ইনফাদুস একত্রে বসে কোনো কিছু নিয়ে শলা পরামর্শ করছে। স্যার হেনরির হাতে সেই বিশাল আকৃতির কুড়ালটি আছে।

আমাকে দেখেই স্যার হেনরি বলে উঠল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তুমি এখানে এসে পড়লে। ইগনোসি যে কী করতে চায় তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাটা আমরা সামলে উঠতে পেরেছি ঠিকই কিন্তু টোয়ালা আরো সৈন্য জোগাড় করছে, সে আমাদের অনাহারে মারতে চায়।'

– এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য!

– অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। ইনফাদুস বলছে আমাদের শিবিরে পানির কষ্ট শুরু হয়েছে।

ইনফাদুস বলল, 'হ্যাঁ, হুজুর, যে ঝরনা থেকে এখানে পানি পাওয়া যায় তা এত বিশাল সংখ্যক লোকের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তা ছাড়া ঝরনাটা শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। রাত্রির পূর্বেই আমাদের সঞ্চিত পানি শেষ হয়ে যাবে। হুজুর, আপনারা নিশ্চয়ই অনেক লড়াই যুদ্ধ আগেও দেখেছেন। আমি অবশ্য সঠিক জানি না, যে দেশ থেকে আপনারা এসেছেন, মানে তারকাদের দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ বলে কিছু আছে কিনা। এখন বলুন, আমাদের কী করা উচিত হবে। টোয়ালার দলের যত লোক মারা গিয়েছে সেই সংখ্যার চেয়েও অধিক সৈন্য সে জোগাড় করেছে। অবশ্য টোয়ালাকে একটা শিক্ষা আমরা দিতে পেরেছি। শিকার মরতে প্রস্তুত কিনা বাজ পাখি কি সে জন্য অপেক্ষা করে? টোয়ালার প্রস্তুতির জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারি না। ইতিমধ্যেই আমরা তার বুকে থাবা বসিয়ে দিয়েছি। আগের মতো তেজ নিয়ে সে আমাদের সামনে আসতে সক্ষম নয়। আমরাও ক্ষত বিক্ষত। টোয়ালা চাইছে অনাহারে এবং পিপাসায় আমরা মরে যাই। সাপ যেমন হরিণকে পেঁচিয়ে মাটিতে ফেলে ধীরে ধীরে মেরে ফেলে টোয়ালা ঠিক সেইভাবে আমাদের মেরে ফেলতে চাইছে।'

আমি বললাম, 'তোমার অনুমান সঠিক।'

ইনফাদুস বলে চলল, 'হুজুর, আমাদের খাওয়ার পানি শেষ হয়েছে, খাদ্যও অল্প আছে। এই অবস্থায় তিনটি জিনিসের মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে। এক, ক্ষুধার্ত সিংহের মতো নিজের গুহাতে মরে পড়ে থাকতে হবে। দুই, এই স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। তিন, দূরে ঐ যে শত্রুরা দাঁড়িয়ে আছে সরাসরি ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আজ স্যার হেনরি ইনকুবু কী যুদ্ধটাই না করল! জালে আটকে পড়া মহিষের মতো কী তেজ তার! শিলা বৃষ্টি হলে ছোট চারা গাছ যেমন বিনষ্ট হয় তেমনি তার হাতের কুড়ালের আঘাতে টোয়ালার সৈন্যরা লুটিয়ে পড়তে লাগল। হে পন্ডিত, আপনি বলুন, এমতাবস্থায় আমাদের কী কর্তব্য। হে স্বচ্ছ চোখের মালিক (ক্যাপ্টেন গুড) আপনি তো রাতের আঁধারেও দেখতে পান, আপনি এই তিমিরে আমাদের পথ দেখান। ইগনোসি তো আমাদের রাজা, যুদ্ধ সম্বন্ধে তার কী বক্তব্য তা আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন।'

সামরিক পোশাকে ইগনোসিকে মস্ত বড় বীর মনে হলেও বিনয়ের সাথে সে বলল, 'আপনাদের বিচক্ষণতার কাছে আমি তো শিশু। আপনারা যা সঠিক বলে মনে করবেন আমি তাই করব।'

যুদ্ধ পরিচালনার সব দায়িত্ব আমাদের ওপর সমর্পিত হলে, ক্যাপেটন গুড ও স্যার হেনরির সাথে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে বর্তমানের অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে ফলাফলের কথা চিন্তা না করে শত্রু সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়তে হবে। আমাদের 'ক্ষত শুকিয়ে' যাওয়ার আগেই প্রত্যাঘাত করতে হবে। এমনও হতে পারে, টোয়ালার সৈন্য বাহিনী বৃদ্ধি পেলে আমাদের সৈনিকদের মনোবল ভেঙে যাবে কিংবা যে সমস্ত প্রধান যারা আমাদের সমর্থন করছে তারা আমাদের পরিত্যাগ করে টোয়ালার সঙ্গে সন্ধি করে নেবে। তারা হয়ত আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারে।

আমার অভিমত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হল। উপস্থিত সকলেই আমার জোরালো যুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করল। অধিকার বলে ইগনোসি তাদের রাজা, তাই সেনাপতি কীভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করবে তা জানবার জন্য সকলে তার দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

কী বলবে তা মনে মনে ঠিক করে নেবার জন্য ইগনোসি একটু সময় নিয়ে বলতে শুরু করল, 'হে আমার শ্বেতাঙ্গ বন্ধুগণ, আমার পিতৃব্য ইনফাদুস এবং উপস্থিত প্রধানগণ! সকলের কথা শুনে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আজই আমি টোয়ালাকে আক্রমণ করব। আমাদের যা রসদ আছে তা নিয়েই আমি বাজি ধরব। আমার জীবন এবং তোমাদের সকলের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি যুদ্ধে নামব। অর্ধ চন্দ্রের মতো এই পাহাড়টা বাঁকা এবং সামনের সবুজ তৃণভূমি যেন একটা জিভের মতো আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে।'

আমি বললাম, 'তোমার দেওয়া উপমা একেবারে সঠিক।'

ইগনোসি বলল, 'এখন দুপুর, সৈন্যরা এখন খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম করছে। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হলে কাকা ইনফাদুস তার বাহিনী নিয়ে সবুজ তৃণভূমির দিকে এগিয়ে যাবে। টোয়ালা যখন এই অপ্রত্যাশিত আগমনের সংবাদ পাবে সে তৎক্ষণাৎ নিজের সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য পাঠাবে। কিন্তু অপ্রশস্ত রাস্তার জন্য টোয়ালার সৈন্যরা একযোগে এগিয়ে আসতে পারবে না। এই সুযোগটাই নিতে হবে কাকা ইনফাদুসকে। শত্রুসেনারা যখনই অল্প সংখ্যায় তৃণভূমিতে প্রবেশ করবার চেষ্টা করবে তখনই তাদের বধ করে ফেলতে হবে। টোয়ালার সেনাবাহিনীর দৃষ্টি থাকবে এই লড়াই এর ওপর। ইত্যবসরে স্যার হেনরি আরেকটা বাহিনী নিয়ে অন্য এক দিক থেকে টোয়ালাকে আক্রমণ করলে অপ্রস্তুত অবস্থায় তাদের পরাজয় ঘটবে। স্যার হেনরির সেনাবাহিনী দেখে শত্রুপক্ষের মনোবল একেবারে ভেঙে যাবে। অন্য আর এক দিক থেকে সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হবেন কোয়ার্টারমেইন।'

ইগনোসি বিজয়ের সম্ভাবনার কথা বললেও ইনফাদুসের মনের আশঙ্কা দূরীভূত হল না। সে নিশ্চিত, টোয়ালার বিশাল বাহিনীর সামনে তার সেনাদল কুটোর মতো ভেসে যাবে। কুকুয়ানা জাতির লোকেরা কর্তব্যের টানে মৃত্যুভয়কেও উপেক্ষা করতে পারে। ইনফাদুস কেবল মন্তব্য করল, 'আমার কোনো আপত্তি নেই।'

ইগনোসি বলেই চলল, 'টোয়ালার সৈন্যরা যখন এইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে তখন আমাদের সেনাবাহিনীর এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ হাজার ছয়েক লোক পাহাড়ের বাঁ দিক দিয়ে নেমে শত্রুসেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই দলে আমি থাকব। আমাদের পরিকল্পনা মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে টোয়ালাকে বন্দী করাটা খুব কঠিন কাজ হবে না। তাহলে আজ সন্ধ্যায় পাকাপাকিভাবে আমরা 'লু' দখল করবই। এখন সকলে মিলে খাওয়া দাওয়া করে নিই। ইনফাদুস, তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিই, ছক

অনুযায়ী অতি অবশ্যই কাজ করতে হবে। পাহাড়ের ডান দিকের অংশে থাকবেন ক্যাপ্টেন গুড, তার উজ্জ্বল চোখ দিয়ে সব কিছু দেখে আমাদের প্রধানদের উৎসাহ দেবেন।'

আক্রমণের পরিকল্পনা এত দ্রুততার সাথে করা হল যা কুকুয়ানাদের সামরিক দক্ষতারই পরিচয় বহন করে। এক ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যেই সব সৈন্যকে খাদ্য সরবরাহ করা হলে তারা খাওয়া শেষ করল। এবার সৈন্যদের তিনটি বাহিনীতে ভাগ করা হল। এখন আঠারো হাজার সৈন্য তিন দিক থেকে শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করতে প্রস্তুত। আহতদের পরিচর্যা ও দেখাশুনার জন্য কিছু সংখ্যক সৈন্য ওখানে রেখে দেওয়া হল।

এই সময় ক্যাপ্টেন গুড আমার ও স্যার হেনরির কাছে এসে বলল, 'সেনা নায়কের আদেশ অনুযায়ী পাহাড়ের ডান দিকে আমি চললাম। যদি আর আমাদের আর কখনো দেখা না হয় তাই তোমাদের সাথে হাত মেলাতে এলাম।'

কোনোরকম আবেগ তাড়িত না হয়ে আমরা তার সাথে হাত মেলালাম।

মনে হল, একটুখানি কাঁপা গলায় স্যার হেনরি বলল, 'কী অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল! আগামিকালের সুর্যোদয় দেখতে পাব কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে যথেষ্ট। আমি এমন এক স্থানে যাচ্ছি যেখানে হয় বিজয় লাভ করতে হবে, না হয় মৃত্যুবরণ করতে হবে। তবে ওখানে মৃত্যু মানে বীরগতি– বীরের মতো মৃত্যু। যাক, বন্ধু, বিদায়। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। সমস্ত হিরা তোমার হস্তগত হোক। একটা কথাই তোমাকে বলব– ভণ্ডদের থেকে সাবধান।'

হাত মিলিয়ে ক্যাপ্টেন গুড চলে গেল। একটু পরেই এল ইনফাদুস। স্যার হেনরিকে সাথে করে নিয়ে বাহিনীর একেবারে পুরোভাগে দাঁড় করিয়ে দিল। আমি চললাম ইগনোসির সাথে– আমার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে।

১৪
ধূসর বাহিনীর প্রতিরোধ

আমাদের সৈন্যদলে দুই ধরনের যোদ্ধা ছিল– ধূসর (গ্রে) এবং মহিষ (বাফেলো)। এই যোদ্ধাদের দেহে ছিল প্রচুর শক্তি এবং মনের বল ছিল দৃঢ়। সকাল থেকে এদের কাউকে কোনো কাজে লাগানো হয়নি।

পরবর্তী কয়েক মিনিটের মধ্যে একেবারে নিস্তব্ধভাবে সাঁড়াশি আক্রমণের জন্য তারা নিজ নিজ জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

এইরকম এক দুঃসাহসিক অভিযানের শুরুতে যোদ্ধাদের মনোবল ও উৎসাহ বাড়ানোর গুরুত্ব যে কতখানি তা ইনফাদুসের মতো এক অভিজ্ঞ সেনানায়কের পুরোপুরি জানা ছিল। তাই কয়েক মিনিটের অবকাশ পেয়েই সে কাব্যিক ভাষায় তাদের অনুপ্রাণিত করার কাজে লেগে গেল। এইরকম এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে একেবারে সামনের সারিতে থেকে লড়াই করা যে অত্যন্ত সম্মানের বিষয় তা সে প্রথমেই উল্লেখ করল। তারকাদের দেশ থেকে আগত শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিরা এই যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় যুদ্ধের গুরুত্ব বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে বলেও সে মন্তব্য করল। সে আশ্বাস দিল, ইগনোসি যদি এই যুদ্ধে বিজয়ী হয় তাহলে সকল সৈনিককে পুরস্কার হিসাবে বেশ কয়েকটি গবাদি পশু দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হবে।

সৈন্যদের মাথায় কালো পালক লাগানো ছিল। পালকের তলায় ছিল যোদ্ধাদের ভাবলেশহীন মুখ। যোদ্ধাদের সকলেরই বয়স চল্লিশের নিচে। তাদের দিকে তাকিয়ে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই এদের অনেকেই হয় মৃত কিংবা মৃতপ্রায় হয়ে মাটিতে পড়ে থাকবে। এর অন্যথা হবার নয়। জীবন নিয়ে এরা খেলা করতে ভালোবাসে। বেপরোয়া মনোভাবের জন্যই এরা যুদ্ধে জয়লাভ করে। কপালে মৃত্যু লেখা আছে জেনেও তারা যুদ্ধ করে। ইনফাদুসের সেনারা সব কিছু বুঝেই রাজা টোয়ালার সৈনিকদের বাধা দেবে এবং অপ্রশস্ত প্রবেশ পথেই তাদের হত্যা করবার চেষ্টা চালাবে। তাদের প্রচেষ্টা সফল হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। অসফল হবার সম্ভাবনা থাকলেও তারা ভীত নয়। চির জীবনের জন্য তারা দিনের আলো থেকে বঞ্চিত হবে তা নিশ্চিতভাবে জেনেও ভয় পায় না। এই মুহূর্তে আমার ও তাদের মনের অবস্থার মধ্যে তুলনা করতেই প্রশংসা ও ঈর্ষার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। কর্তব্যের প্রতি এত অনুরাগ ও তার বিষাদময় ফলের প্রতি এত অনীহা ইতিপূর্বে আমি দেখিনি।

ইগনোসির দিকে ইঙ্গিত করে ইনফাদুস বলল, 'তোমাদের রাজার দিকে তাকাও। নিজের রাজার জন্য যুদ্ধ কর, প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ কর। সেই মৃত্যু সম্মানের। যে বীর, সে শত্রুর ভয়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালায় না। রাজার জন্যই সে অস্ত্র ধারণ করে। রাজদেহে যে পবিত্র সর্প চিহ্ন আঁকা আছে তোমরা তাকে সম্মান জানিয়ে আমাকে অনুসরণ কর। আমি এবং এই শ্বেতকায় বীর তোমাদের রণভূমিতে নিয়ে যাব।'

ইনফাদুসের কথা শেষ হলে সেখানে এমন এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করল যাকে দুরবর্তী সমুদ্রের নীরবতার সাথে তুলনা করা যায়। ছয় হাজার যোদ্ধা ইগনোসিকে সম্মান জানানোর জন্য হাতের বর্শাকে নিজের ঢালের সাথে ছোঁয়াল, এই শব্দটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল, গভীরতর হল এবং এক সময় সমুদ্রের গর্জনের মতো মনে হল। পাহাড়ের মধ্যে মেঘের ডাকের প্রতিধ্বনির মতো সৈন্যদের কোলাহল শোনা যেতে লাগল। কোলাহল এক সময় থিতিয়ে এল এবং হাজার কণ্ঠে সৈন্যরা রাজার বিজয় কামনা করল।

আমার মনে হল, রোমান সম্রাটদের চেয়েও ইগনোসি ভাগ্যবান কারণ তারাও 'প্রাণ দিতে ইচ্ছুক' এত মানুষের থেকে অভিবাদন লাভ করেনি।

এই সম্মানের প্রত্যুত্তরে ইগনোসি নিজের হাতের কুড়াল উঁচু করে তুলে ধরল এবং সৈন্যরা তিন সারিতে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে এগোতে লাগল। বাহিনীর শেষ সৈন্যটি পাঁচশো গজ এগিয়ে গেলে ইগনোসি মহিষ বা বাফেলো বাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সেটাকেও তিন সারিতে ভাগ করে নেবার পর এগিয়ে যাওয়ার হুকুম দিল। সৈন্যদের সাথে আমিও পা মেলালাম বটে কিন্তু আমার মন পড়ে থাকল ঈশ্বরের চরণে; এই ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে সুস্থ দেহে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য আমি পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম। আগেও আমি অনেক প্রতিকূল অবস্থায় পড়েছি কিন্তু এবারের পরিস্থিতি এমনই যে নিরাপদে মুক্তি পাবার সম্ভাবনা বড়ই ক্ষীণ।

'গ্রে' বা ধূসর বাহিনী খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর 'মহিষ' বাহিনী যাত্রা শুরু করেছিল বলে ধূসর বাহিনী যখন পাহাড়ের নিচে পৌছে গেল তখন আমরা সমভূমির থেকে বেশ খানিকটা ওপরে। এখান থেকে শত্রুপক্ষের গতিবিধি বেশ ভালভাবে নজরে আসছিল। পাহাড়টা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেটাই হল সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গা। যে পক্ষ প্রথমেই ঐ জায়গা দখল করে নিতে পারবে পাল্লা তার দিকেই ভারি হবে কারণ জায়গাটা এত অপ্রশস্ত যে দেরিতে আসা সৈন্যরা একযোগে ওখানে ঢুকতে পারবে না। ঠিক এই কারণে টোয়ালার সৈন্যরা বেশ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল। ঐ সরু জায়গা দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করা মানেই শত্রুর তরবারির সামনে গলা বাড়িয়ে দেওয়া।

নিচের 'ধূসর' বাহিনীর সেনারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল; পাহাড়ের অল্প উচ্চতায় 'মহিষ' বাহিনীও স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এই অবসরে দেখলাম, রাজার সৈন্য বাহিনী আমাদের চেয়েও অনেক বড়। সকালে তারা আমাদের হাতে মার খেলেও এখন তাদের সংখ্যা চল্লিশ হাজার। রাজার বিশাল সেনাবাহিনী এবার আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। একটু পরেই তারা বুঝতে পারল কেবল এক বাহিনী সেনা এগিয়ে যেতে পারবে কারণ সামনে খাড়া পাহাড় এবং পাহাড়ে উঠবার

রাস্তাটা বেশ সংকীর্ণ; তদুপরি পাহাড়ে উঠবার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুকুয়ানাদের গৌরব বহনকারী 'ধূসর' বাহিনীর সেনারা, সংখ্যায় তারা কম হলেও শৌর্যে এবং অবস্থানগত সুবিধা লাভের ফলে তারা অপরাজেয়। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল মাত্র তিনজন রোমান সৈন্য কয়েক হাজার শত্রুসেনাকে একটা সেতুর মুখে কীভাবে প্রতিহত করেছিল।

রাজসৈন্যরা মনোবল হারিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। এখন মনে হচ্ছিল আক্রমণ করবার কোনো ব্যস্ততা তাদের নেই। এই সময় রাজসৈন্যদের মাঝখানে একজন লম্বা চওড়া লোককে দেখা গেল। তার শিরস্ত্রাণে উটপাখির পালক লাগানো ছিল এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ সেনানায়ক তাকে পরিবৃত করে রেখেছিল। বুঝলাম, লম্বা লোকটি স্বয়ং টোয়ালা। টোয়ালা হুকুম দিতেই সামনের সেনাদল রাজার নামে জয়ধ্বনি দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল এবং চল্লিশ গজের মধ্যে পৌঁছে আমাদের লক্ষ্য করে 'তোল্লা' মানে ছুরি, ছুড়তে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই হাতের বর্শা উঁচু করে বিরাট হুংকার ছেড়ে তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অসংখ্য বর্শার ওপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল এবং ঢালের ঠোকাঠুকির শব্দ কানে তালা লাগিয়ে দিল। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিটি কোণা থেকে আহত মানুষের আর্তনাদ শোনা যেতে লাগল। সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালে মাঝে মাঝে দেখা যায় এক একটা বড় ঢেউ সব কিছুকে অতিক্রম করে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে আসছে। এখানেও দেখলাম, রাজ সৈন্যদের ভূলুণ্ঠিত করে ধূসর বাহিনীর সেনারা একটা বড় ঢেউ-এর মতো সব কিছুকে ছাপিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। 'ধূসর' বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিহত হল বটে কিন্তু রাজ-বাহিনীর একটা বিশাল অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

খানিকটা অগ্রসর হয়ে ধূসর বাহিনী পুনরায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। শত্রুপক্ষ আক্রমণ করুক সেই জন্য বোধ হয় তারা অপেক্ষা করছিল। এই সময় স্যার হেনরির হল্‌দ রংয়ের দাড়ি আমার চোখে পড়লে আমি বেশ আনন্দ পেলাম। সে তাহলে এখনও বেঁচে আছে! স্যার হেনরি নিজের বাহিনীর মধ্যে ঘোরাঘুরি করে সৈন্য সাজাচ্ছিল।

ঘোরতর লড়াই ঠিক যে স্থানে হয়েছিল আমরা এবার সেখানে গেলাম। কী অসহনীয় দৃশ্য! সারা প্রান্তর জুড়ে লাল রঙের পুরু একটা আস্তরণ, সেই পিচ্ছিল মাঠে পড়ে রয়েছে অগণিত মৃতদেহ, মুমূর্ষু এবং আহত মানুষের দল। ইগনোসির কড়া আদেশ রয়েছে যে শত্রু পক্ষের হলেও কোনো আহত মানুষকে বধ করা যাবে না; তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান সেনা নায়কের আদেশ যথোচিতভাবে পালিত হচ্ছিল। যে দৃশ্য একটু আগে আমাদের দেখতে হয়েছিল তা নিয়ে চিন্তা করলে কোনো মানুষের মস্তিষ্ক আর সুস্থ থাকবে না।

রাজার দ্বিতীয় সেনাদল এবার এগিয়ে আসতে লাগল। তাদের মাথার পাগড়িতে সাদা রঙের পালক গোঁজা ছিল। এদিকে 'ধূসর' বাহিনীর দু'হাজার সৈনিক আগের মতোই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। রাজসেনারা প্রবল বেগে তাদের দিকে ধেয়ে চল্লিশ গজের মধ্যে পৌঁছালে তারা প্রত্যাঘাত করল এবং ফলাফল আগের মতোই হল।

এবার রাজসৈন্যদের অধিকাংশই ছিল যুবক এবং তাদের মধ্যে প্রবল রোষ ছিল। প্রথম দিকটায় মনে হয়েছিল এবার বুঝি 'ধূসর' বাহিনীকে পরাজয় স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু পরের দিকে চাকা ঘুরে গেল। প্রতি মিনিটে কতজন যুবক যে নিহত হল তা হিসাব করা যায় না। রণক্ষেত্রে যা শোনা যাচ্ছিল তা হল, তরবারি চালানোর সো সো শব্দ এবং তারপরই আহতদের আর্তনাদ।

নিয়মানুবর্তিতা, দৃঢ়তা এবং সাহসিকতার ফলে বহু অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়। একজন অভিজ্ঞ সৈনিক দুজন কমবয়সি সৈনিকের চেয়েও মূল্যবান। স্যার হেনরি তার হাতের কুড়াল উঁচু করে ধরে সৈনিকদের হুকুম দিচ্ছিল। তার আদেশে ধূসর বাহিনীর সেনারা আগে যেমন পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল এখনও তাই থাকল। ওদিক থেকে রাজ সৈন্যরা আঘাত করতে এসে নিজেরাই মৃত্যুবরণ করল। যুদ্ধে যেহেতু কোনো গোলা বারুদ ব্যবহৃত হয়নি তাই সেখানে কোনো ধোঁয়া ছিল না এবং প্রতিটি ঘটনাই আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। কয়েক মিনিট পর রাজসেনাদের আক্রমণ স্তিমিত হয়ে এল।

ইগনোসি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। উত্তেজনায় দাঁত কিড়মিড় করতে করতে সে বলল, 'হ্যাঁ, বীর বটে আমাদের যোদ্ধারা। দেখ! কীভাবে কাজ সারলো!'

একটু পরেই মাথায় সাদা পালক গোঁজা রাজসেনারা পিছন দিকে ছুটতে শুরু করল। যেদিকে পারল সেদিকে ছুটতে লাগল। বিপরীত দিকে অর্থাৎ আমাদের পক্ষে চল্লিশ মিনিট আগে তিন হাজার সৈন্য ছিল কিন্তু এখন আছে মাত্র ছয়শো সৈন্য। কিন্তু দৃঢ় মনোবলের জন্য তারা মৃত্যুকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। আবার স্যার হেনরিকে দেখতে পেলাম তার পাশে রয়েছে বন্ধু ইনফাদুস। ওদিকে রাজা টোয়ালার সৈন্যদল তো এগিয়ে আসছে।

যারা এই বৃত্তান্ত পড়ছেন তারা বুঝে গিয়েছেন আমি কী রকম ভিতু প্রকৃতির লোক এবং যুদ্ধে কতখানি অনাগ্রহী যদিও ঘটনাচক্রে এই ধরনের অস্বস্তিকর অবস্থায় আমি মাঝে মধ্যে পড়ে গিয়েই থাকি। অন্যের রক্ত ঝরানো আমার একদম ভাল লাগে না আর নিজের শরীরের রক্ত বাঁচানোর মতো পবিত্র কাজের জন্য আমি নিজের পা দুটিকে যথা সম্ভব কাজে লাগাই অর্থাৎ রণক্ষেত্র থেকে ছুটে পালাই। আজ এই মুহূর্তে জীবনে প্রথমবার অনুভব করলাম যে আমার মধ্যেও সৈনিকের বীরত্ব আছে। বইতে পড়া যত বীরগাথা এবং প্রাণ বিসর্জনের গরিমার ছড়া হঠাৎ আমার মনকে নাড়া দিল। আমার শরীরের যে রক্ত যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে হিম হয়ে গিয়েছিল তা যেন ফুটতে শুরু করল। হত্যা করবার এক বন্য বাসনা আমাকে পেয়ে বসল। এই অবসরে আমি অন্য সহযোদ্ধাদের দিকে চোখ ফেরালাম। নিজেদের হাতের ঢালের দিকে তারা মাথাটা নিচু করে রেখেছে এবং হাতের বর্শাটা শক্ত করে ধরে রেখেছে। তাদের সারা শরীরে যুদ্ধের হিংস্রতার ভাব ফুটে উঠেছে। শিকার দেখলে শিকারি কুকুরের চোখে যে লালসা ফুটে ওঠে এদের চোখেও তা ছিল। মনে হল, আমার নিজের দৃষ্টি, চেহারা এবং অভিব্যক্তি ওদের থেকে মোটেই আলাদা নয়।

ইগনোসি যদিও দাঁতে দাঁত ঘষছিল কিন্তু তার চেহারায় কিছুটা শান্তভাব ছিল। অবশ্য তার এই রূপ আমার একেবারেই পছন্দ হল না। আমি বলেই ফেললাম, 'কী

ভাবছো উমবোপা ইগনোসি? রাজা টোয়ালা যতক্ষণ না আমাদের সমূলে বিনাশ করে ততক্ষণ পর্যন্ত কি আমরা এখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকব?'

তার কথা শেষ হবার আগেই এক দল রাজসেনা আমাদের দিকে এগিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে ইগনোসি কুকুয়ানাদের মধ্যে প্রচলিত রণ হংকার দিয়ে হাতের কড়ুল উঁচু করে শত্রুসেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দিল। সমুদ্রের ন্যায় গর্জন করতে করতে 'মহিষ' বাহিনী সামনের দিকে ছুটে গেল।

তারপর যা ঘটল তা বর্ণনা করা আমার পক্ষে শক্ত। যেটুকু মনে করতে পা রি তা হল, অস্ত্রের ঝলকানি, উন্মত্ত শোরগোল, দুর্বোধ্য গর্জন, দৃঢ় ও নিষ্কম্প পদক্ষে প এক দল সেনার এগিয়ে যাওয়া এবং লাল রঙের কুয়াশার একটা আবরণ।

এতক্ষণ তো আমি 'মহিষ' বাহিনীর মধ্যে ছিলাম, হুঁশ হলে দেখলাম আমি 'ধূসর' বাহিনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি এবং স্যার হেনরি ঠিক আমার পিছনে। এই ঘটনা কীভাবে ঘটল পরবর্তীকালে তা জানতে চাইলে স্যার হেনরি বলেছিল যে 'মহিষ' সেনাদের ধাক্কা ধাক্কিতে আমি একেবারে তার পায়ের কাছে গিয়ে পড়েছিলাম এবং সে আমাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

কী ঘোর যুদ্ধ! আমাদের এক দল সেনা এগিয়ে গেল; ওপাশ থেকে বাধা দেওয়ার জন্য একদল রাজসৈন্য এল। দুই দলের মধ্যে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে শবের সারি। কয়েক মিনিট পর শবের স্তূপ আরো একটু উঁচু হয়ে উঠল। বলা বাহুল্য, এই স্তূপের বহুলাংশ অধিকার করেছিল রাজসেনাদের দেহ। ইগনোসি কিন্তু আগের মতোই শান্ত ছিল। সৈন্যদের মাঝেই সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কখনো আক্রমণ প্রতিহত করছিল, সেনাদের অনুপ্রাণিত করছিল এবং কখনো মজার মজার কথাও বলছিল। ওদিকে স্যার হেনরি তো বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছিল। তার হাতের বিশাল কুড়ালটা মাঝে মাঝেই ওপরে উঠছিল এবং প্রচন্ড জোরে নিচে নামছিল। নামার সাথে সাথে মাথার খুলি ফাটবার আওয়াজ আসছিল এবং সেই সঙ্গে লাল রঙের ধারা মাটিকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

শত্রু শিবির থেকে কান ফাটানো জয়ধ্বনি ভেসে এল– রাজা টোয়ালার জয়! দেখলাম এক চক্ষু একটা দানব লৌহ জালিকার বর্ম পরে হাতে কুড়াল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করল। সে আর কেউ নয়– রাজা টোয়ালা স্বয়ং।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করেই আমাদের দিকে তাকিয়ে রাজা টোয়ালা চিৎকার করে বলল, 'আরে ইনকুবু! কোথায় তুই? কোথায় লুকিয়েছে সেই শ্বেতকায় ব্যক্তি যে আমার পুত্র স্ক্রাগাকে হত্যা করেছিল?' স্যার হেনরিকে দেখা মাত্রই তার দিকে সে একটা ছুরি ছুড়ে মারল। স্যার হেনরি তার গতিবিধির ওপর নজর রেখেছিল বলে হাতের ঢাল দিয়ে ছুরিটা আটকে দিল। তার ঢালের সামনের দিকটা চামড়া দিয়ে ঢাকা ছিল বলে ছুরিটা চামড়াতে আটকে থাকল বেশ খানিকক্ষণ।

এতে টোয়ালার রাগ বেড়ে গেল। প্রচন্ড আক্রোশে স্যার হেনরির দিকে ছুটে এসে হাতের কুড়াল দিয়ে আঘাত হানল সে। এবারেও ঢালের সাহায্যে সেই আঘাত আটকাল স্যার হেনরি কিন্তু তাকে মাটিতে বসে পড়তে হল।

ঠিক ঐ মুহূর্তে রাজকীয় সেনাদের মধ্য থেকে একটা হতাশাপূর্ণ কোলাহল শোনা গেল। একটু পরে কারণটা বুঝতে পারলাম। সেটা আর কিছু নয়। আমাদের 'ধূসর' ও 'মহিষ' বাহিনীদ্বয় খুব দ্রুত তাদের আক্রমণ করেছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যুদ্ধের গতি অন্য দিকে মোড় নিল। মনোবল হারিয়ে রাজার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিকে ছুটতে লাগল। তখন তাদের লক্ষ্য নিজের নিজের প্রাণ রক্ষা করা। তারা যতই ছত্রভঙ্গ হতে লাগল আমাদের সেনারা ততই সুবিধাজনক জায়গায় পৌছে যেতে লাগল। রাজসেনাদের তারা কচুকাটা করতে লাগল। পানি পিছিয়ে গেলে সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে থাকা পাথরের ঢিবিকে যেমন নিঃসঙ্গ মনে হয়, রাজসৈন্যরা পালিয়ে গেলে নিজেদের তাই মনে হল। আমাদের সামনে, পিছনে ও পাশে মৃতদেহের স্তূপ, একটু আগেই যারা আমাদের শত্রু ছিল এখন তারা সব সম্পর্কের অতীত। আমাদের ধূসর বাহিনীর মাত্র পঁচানব্বইজন জীবিত আছে।

হাতের ক্ষতস্থানটা বাঁধতে বাঁধতে খুব শান্ত কণ্ঠে ইনফাদুস তার সহযোদ্ধাদের উদ্দেশে বলল, 'সেনাবাহিনীর মর্যাদা রক্ষার জন্য তোমরা যা করলে তা তোমাদের অধস্তন কয়েক পুরুষ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।' স্যার হেনরির দিকে ফিরে তার হাতে হাত রেখে ইনফাদুস বলতে শুরু করল, 'ইনকুবু, তুমি সত্যিই মহান! সারাটা জীবন আমি সৈনিকদের সাথেই কাটিয়েছি এবং অনেক বীর, মহাবীরও দেখেছি কিন্তু তোমার সমকক্ষ আমি কাউকে দেখিনি।'

'মহিষ' বাহিনী 'লু' যাওয়ার জন্য রওয়ানা হল। ওই সময় ইগনোসির কাছ থেকে একটা অনুরোধ এল। সে বলে পাঠিয়েছে ইনফাদুস, স্যার হেনরি এবং আমি যেন তার সাথে মিলিত হয়ে এই অভিযানের সঙ্গী হই। তার একান্ত ইচ্ছা রাজা টোয়ালাকে বীন্দ করে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানো। 'ধূসর' বাহিনীর অবশিষ্ট নব্বইজন সেনাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন অবিলম্বে আহত সেনাদের যত্ন নেয়। খানিক দূর যাওয়ার পর রাস্তার পাশে একটা বিরাট পাথরের নিচে ক্যাপ্টেন গুডকে বসে থাকতে দেখলাম। তার পাশে শায়িত ছিল একজন কুকুয়ানা সৈনিকের মৃতদেহ।

দৃশ্যটা চোখে পড়তেই স্যার হেনরি সখেদে বলল, 'আহারে, লোকটা বেশ চোট পেয়েছে!' কথাটা শেষ হওয়া মাত্রই অন্য একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। এতক্ষণ যাকে মৃত বলে মনে হচ্ছিল সেই সৈনিকটা তড়াক করে লাফ দিয়ে দাঁড়াল এবং ক্যাপ্টেন গুডকে মাটিতে ফেলে হাতের অস্ত্র দিয়ে তার সারা শরীরে আঘাত করতে লাগল। ক্যাপ্টেন গুড যন্ত্রণায় হাত পা ছুড়তে লাগল। এই অবস্থা দেখে ক্যাপ্টেন গুডের সাহাযার্থে আমরা ছুটে গেলাম। আমাদের আসতে দেখে কুকুয়ানা সৈনিকটা ক্যাপ্টেন গুডের শরীরে আর একটা আঘাত হানল। এই সময় তাকে বলতে শোনা গেল, 'এই নে, জাদুকর।' তারপরেই লোকটা ছুটে পালিয়ে গেল। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, ক্যাপ্টেন গুড মারা গিয়েছে। বিষণ্ন মনে আমরা কাছে গেলাম কিন্তু কাছে যেতেই সে আমাদের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল। তার চোখের চশমাটা একই জায়গায় অবস্থিত আছে দেখে আমরা বেশ আশ্চর্য হলাম।

পরনের জামার নিচে লৌহ জালিকার যে বর্মটা ছিল তার কারণেই সে রক্ষা পেয়েছে বলে জানালো এবং তার পরেই সজ্ঞাহীন হয়ে গেল। তার শরীরে হাত রেখে বুঝলাম, তার পায়ে আঘাত লাগলেও বুকে আঘাত লাগেনি, কয়েকটা গাছের ডাল সংগ্রহ করে একটা স্ট্রেচার বানিয়ে আমরা তাকে তুলে নিয়ে চললাম।

'লু'-লোকালয়ের প্রথম প্রবেশ দ্বারের কাছে গিয়ে দেখলাম ইগনোসির আদেশ মতো আমাদের সশস্ত্র সেনারা সেখানে পাহারা দিচ্ছে। অন্য সব প্রবেশ দ্বারেও সেনা

মোতায়ন করা হয়েছে যাতে 'লু' থেকে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে। ইগনোসি সেখানে পৌঁছালে সেনারা তাকে রাজা বলে অভিবাদন জানালো। শোনা গেল, টোয়ালার সেনারা 'লু' লোকালয়ের মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে। রাজা টোয়ালাও আত্মগোপন করে আছে সেখানে। রাজার সেনারা মনোবল হারিয়ে আত্মসমর্পণ করবার জন্য প্রস্তুত, এই খবর শুনে ইগনোসি আমাদের সাথে পরামর্শ করে প্রতিটি প্রবেশ দ্বারে দুত পাঠিয়ে রাজ-সেনাদের উদ্দেশে ঘোষণা করল যদি তারা অস্ত্র পরিত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করে তাহলে তাদের কোনো ভয় নেই; তাদের নিঃশর্তে ক্ষমা করা হবে। এই আশ্বাস বাণী শুনবার পর 'লু'-এর পরিখার পাশে যে কাঠের সেতু ছিল তা রাজসেনারা নামিয়ে দিল যাতে আমরা লু-তে প্রবেশ করতে পারি।

লু-এর ভিতর রাস্তার দুপাশে হতাশ রাজ-সৈনিকরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের ঢাল ও বর্শা পায়ের কাছে নামানো ছিল। ইগনোসি যখন তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা তাকে রাজা বলেই অভিবাদন করছিল। আমরা সোজা টোয়ালার রাজগৃহের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক দুদিন আগে এখানে কত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে! সামান্য দুটো দিনের ব্যবধানে রাজা আজ ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে আছে। একটু বাদে টোয়ালাকে দেখা গেল, দূরে এক কোণায় মহাশক্তিধর নৃপতি বসে আছে। তার অদূরে মাত্র একজন মানুষ বসে আছে। সে হল গাগুল।

রাজার যুদ্ধাস্ত্র বিশাল কুড়াল ও ঢাল তার পায়ের কাছে রাখা আছে। তার এই অসহায় অবস্থা দেখে আমার কেমন যেন মায়া হল। অতীতের নিষ্ঠুরতা ও দম্ভের কোনো চিহ্নই নেই। এত বড় সেনাদলের নায়ক হয়ে আজ একটা নিরস্ত্র লোককেও সে তার পাশে পায়নি, বহুসংখ্যক সভাসদ থাকলেও সে আজ একা। এ যে গৌরবের শিখর থেকে একেবারে ধুলায় পড়ে যাওয়া। পতনের ও পরাজয়ের কষ্ট শুনবার মতোও কেউ নেই তার পাশে। নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোককে ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে অনেক কিছু শিখতে হয়। তখন তারা অন্যদের মার্জনা পায় না। আজ টোয়ালাও কারোর সহানুভূতি পাবে না।

রাজার সাথেই তো আমাদের চূড়ান্ত মোকাবিলা করতে হবে। টোয়ালা যেখানে বসেছিল আমরা সেদিকে এগিয়ে গেলাম। পঞ্চাশ গজ দূরে আমাদের সশস্ত্র সঙ্গীদের থামতে নির্দেশ দিয়ে কয়েকজন তার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাদের অগ্রসর হতে দেখে এক চক্ষু টোয়ালা মাথা তুলে আমাদের দিকে তাকাল। তার চোখ একটি হলে কী হয়, সেটা দিয়েই চাপা রাগের আগুন বের হতে লাগল। তার জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন ইগনোসিকে পুড়িয়ে মারতে লাগল।

কৌতুকের সুরে ইগনোসিকে উদ্দেশ করে বলল, 'হে রাজা, তুমি আমাকে নিঃস্ব করেছ, শ্বেতকায় ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে জাদুবিদ্যার প্রভাবে আমার সৈন্যবাহিনীকে বশীভূত করেছ। এবার ভাবছো আমাকে নিয়ে কী করা যায়?'

ইগনোসি উত্তর দিল, 'আমার বাবার সাথে যে আচরণ তুমি করেছিলে আজ তারই প্রতিদান দিতে এসেছি। এত বছর তো তারই সিংহাসনে বসে তুমি রাজত্ব করলে।'

টোয়ালা বলল, 'খুব ভাল, কীভাবে মরতে হয় তা তুমিও শিখে নাও, ঐ তো সূর্যদেবতা অস্ত যাচ্ছেন। আমিও ওর সাথে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। তবে

কুকুয়ানাদের রাজবংশের ঐতিহ্য অনুযায়ী, তুমি তো জানো, রাজবংশের কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে তাকে একটা স্বাধীনতা দেওয়া হয় সে কীভাবে মৃত্যুবরণ করবে তা বেছে নেওয়ার। এই স্বাধীনতা তুমি যদি না দাও তাতে তোমার অপযশা হবে। আমি যুদ্ধ করে মারা যেতে চাই।'

ইগনোসি বলল, 'ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছা পূরণ করলাম। তবে আমি তো রাজা। রণক্ষেত্র ছাড়া আমি যুদ্ধ করব না। তুমি অন্য যে কোনো লোকের সঙ্গে লড়তে পারো।'

যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর খোঁজে টোয়ালার রক্তচক্ষু ঘুরতে ঘুরতে এক সময় আমার ওপর এসে থামল। ভয়ে তো আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। ভেবেছিলাম, যুদ্ধ থেমেছে এবার আমি বেঁচে গেলাম কিন্তু এ কী বিপদ! টোয়ালা তো একটা দৈত্য। ছয় ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, তেমনি চওড়া; ওর কাছে তো আমি একটা মশা। ওর সাথে লড়তে যাওয়া আর আত্মহত্যা করা তো একই কথা। স্থির করলাম, আমি লড়াই করতে অস্বীকার করব। অস্বীকার করলে অবশ্য এই মুহূর্তে, নিয়ম অনুযায়ী, কুকুয়ানাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। ঐ বিশাল কুড়ালের আঘাত মাথায় সহ্য করা অপেক্ষা লোকের উপহাসের পাত্র হওয়া ভাল।

স্যার হেনরিকে ইঙ্গিত করে টোয়ালা বলল, 'আমি ঐ শ্বেতকায় ইনকুবুর সাথে লড়ব।'

ইগনোসি বলল, 'তা সম্ভব না।'

টোয়ালা মন্তব্য করল, 'অবশ্য ও যদি ভয় পেয়ে থাকে তাহলে আমি লড়তে চাই না।'

ঐ দুজনের মধ্যে কী কথাবার্তা হচ্ছে তা স্যার হেনরির বোধগম্য হওয়ায় সে বলে উঠল, 'আমি ওর সাথে লড়ব। ও দেখুক আমি ভয় পেয়েছি কিনা।'

আমি স্যার হেনরিকে বললাম, 'ওর প্ররোচনার ফাঁদে পা দিও না। আজ সকালে যারা তোমাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেখেছে তারা এক বাক্যে স্বীকার করবে তুমি কাপুরুষ নও।'

নিরুত্তাপ কণ্ঠে স্যার হেনরি বলল, 'একজন লোকও আমাকে কাপুরুষ বলুক আমি তা চাই না, আমি অবশ্যই লড়ব।' হাতের কুড়ালটা তুলে ধরে সে টোয়ালার দিকে অগ্রসর হল।

স্যার হেনরি যে একটা মাথা মোটার মতো কাজ করতে চলেছে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ রইল না। হতাশ হয়ে আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমার তো এমন কোনো শক্তি নেই যে তাকে নিবৃত্ত করতে পারি।

ইগনোসি তাকে বলল, 'টোয়ালার কথায় কর্ণপাত করো না। সকাল থেকে লড়াই করে তুমি যথেষ্ট ক্লান্ত। তোমার কিছু হয়ে গেলে তো আমার বুকটা ফেটে যাবে।'

স্যার হেনরিকে বিরত করতে না পেরে ইগনোসি বলল, 'ঠিক আছে ইনকুবু, এগিয়ে যাও, ঐ হাতিটা তোমার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে।'

পরাভূত রাজা অট্টহাসি হেসে এগিয়ে এল, অস্তমিত সূর্যের রক্তিম আলোয় দুই যোদ্ধাকে যেন আগুনের তৈরি মনে হচ্ছিল। আমার মনে হল, ওরা দুজনে একে অপরের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

মাথার ওপরে কুড়াল তুলে ধরে যোদ্ধা দু'জন পরস্পরের দিকে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল।

এক সময় স্যার হেনরি অকস্মাৎ ঝাঁপ দিয়ে টোয়ালার দিকে এগিয়ে গেল এবং তাকে লক্ষ্য করে প্রচন্ড শক্তিতে কুড়াল দিয়ে আঘাত করবার চেষ্টা করল। সে এত জোরে ঝাঁপিয়েছিল যে টাল সামলাতে না পেরে প্রায় মাটিতে পড়েই যাচ্ছিল। টোয়ালা এই সুযোগ হাত ছাড়া করল না। ক্ষিপ্র গতিতে সে হাতের কুড়ালটা মাথার ওপরে একবার ঘুরিয়ে স্যার হেনরির মাথা লক্ষ্য করে নামিয়ে আনল। দৃশ্যটা দেখে আমার হৃদপিন্ডটা একেবারে গলার কাছে এসে গেল। ভাবলাম, এবার তো সবই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু সুখের বিষয়, বিদ্যুৎগতিতে স্যার হেনরি হাতের ঢালটা দিয়ে কুড়ালের ঘা আটকে দিল। কিন্তু তার ঢালের প্রান্তটা ভেঙে গেল এবং কাঁধে আঘাত পেল। ভাগ্যক্রমে আঘাতটা খুব মারাত্মক নয়। পর মুহূর্তে স্যার হেনরি টোয়ালার ওপর আঘাত হানল কিন্তু ঢালের জোরে সেই আঘাত প্রতিহত করল টোয়ালা। এরপর একবার টোয়ালা আঘাত করে, তো পরের বার স্যার হেনরি। উভয় পক্ষই ঢালের সাহায্যে কিংবা একটু সরে গিয়ে সেই আঘাত ব্যর্থ করতে থাকল। ইগনোসির সৈন্যদের মধ্যে ক্রমেই উত্তেজনা বাড়তে থাকল এবং টোয়ালাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য তারা এগিয়ে আসতে লাগল। স্যার হেনরির প্রতিটি আঘাতের চেষ্টায় তারা আনন্দ প্রকাশ করছিল এবং টোয়ালার প্রচেষ্টা দেখে শোক প্রকাশ করছিল। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন গুডের সংজ্ঞা ফিরে এসেছে। ব্যথা ছিল বলে এক পায়ে লাফাতে লাফাতেই স্যার হেনরিকে সে উৎসাহিত করছিল।

স্যার হেনরি এমন একটা আঘাত হানল যে টোয়ালার ঢালটা ফেটে গিয়ে তার কাঁধে লাগল এবং রক্ত ঝরতে লাগল। যন্ত্রণায় ও রাগে চিৎকার করে টোয়ালাও এমন একটা আঘাত হানল যে, হেনরির গালটা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করল।

আমাদের 'মহিষ' বাহিনীর সেনাদের বিলাপ শুনে দেখলাম স্যার হেনরির হাতের কুড়ালটা দূরে ছিটকে পড়েছে এবং টোয়ালা তার হাতের অস্ত্রটা হেনরিকে তাক করে ছুড়ে মারছে।

সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। চোখ খুলে অন্য এক দৃশ্য দেখলাম। টোয়ালার কোমরটা বজ্রমুষ্টিতে জড়িয়ে ধরেছে স্যার হেনরি। টোয়ালাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। একটু পরে সেও হেনরিকে জড়িয়ে ধরল। মূল্যবান জীবন এবং তার চেয়েও মূল্যবান সম্মানের খাতিরে দুই বন্য বরাহের প্রাণপণ লড়াই। টোয়ালা এক সময় তার শত্রুকে শূন্যে উঠিয়ে নিল এবং দুজনেই মাটিতে পড়ে গেল। টোয়ালার হাতে অবশ্য কুড়ালটা ধরা ছিল। সেটা দিয়েই হেনরিকে সে আঘাত করতে লাগল। ওদিকে হেনরিও তার ছুরিটা বের করে ফেলেছে। এই সময় ক্যাপ্টেন গুড চিৎকার করল, 'ওর হাতের কুড়ালটা ছিনিয়ে নাও।'

এই কথাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে হেনরি টোয়ালার কুড়ালটা ধরে প্রচন্ড একটা টান দিল। চামড়ার ফিতে দিয়ে কুড়ালটা টোয়ালার হাতের সাথে বাঁধা থাকলেও ফিতে ছিঁড়ে সেটা বেরিয়ে এল। এখন হেনরির হাতে একটা বড় কুড়াল এবং টোয়ালার হাত খালি। দুই যোদ্ধার মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। টোয়ালা কোমর থেকে ছুরি বের করে এনে নিমেষের মধ্যে হেনরির পাঁজরে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তার বুকের ওপর তো লৌহ জালিকার বর্ম ছিল। টোয়ালার আঘাতে সে খানিকটা পিছন দিকে

হেলে গেল ঠিকই কিন্তু পর মুহূর্তে টোয়ালার গলা লক্ষ্য করে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে কুড়াল দিয়ে আঘাত করল। উপস্থিত সৈন্যরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। টোয়ালার কাটা মুন্ডুটা গড়াতে গড়াতে একপাশে গিয়ে পড়ল। ধড়হীন দেহটা একটু খানি দাঁড়িয়ে থেকে সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল। পরিশ্রান্ত হেনরি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। টোয়ালার মৃতদেহের ওপর সেও পড়ে গেল।

সকলে ছুটে গিয়ে তাকে তুলে ধরে মুখে চোখে পানি ছিটিয়ে দিতেই সে চোখ মেলে তাকাল। সৌভাগ্যের বিষয়, স্যার হেনরি জীবিত ছিল।

সূর্য তখন পাটে বসেছে। আমি দৌড়ে গিয়ে ধুলায় লুটিয়ে থাকা টোয়ালার মস্তক থেকে হিরাটা খুলে নিয়ে ইগনোসিকে বললাম, 'জন্মসূত্রে এবং বীরত্বের বিচারে তুমিই এদেশের প্রকৃত রাজা। এটা তুমি গ্রহণ কর।'

হিরাটা নিজের কপালে বেঁধে নিয়ে ইগনোসি লড়াই-এর ময়দানে গিয়ে টোয়ালার মৃতদেহের ওপর পা রেখে দাঁড়াল। এই দৃশ্যটা আমার কাছে এতই অরুচিকর যে তার বর্ণনা দিতে পারব না। সেখানে দাঁড়িয়ে খুব সুন্দর ভাষায় নিজের সেনাদের একটা ছোট ভাষণ দিল। ভাষণের আবেগে এবং কণ্ঠস্বরে আমার এক পন্ডিতের কথা মনে পড়ল যে সুললিত কণ্ঠে হোমার থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিল।

ইগনোসি বলতে শুরু করল, 'শুরুতে যা ছিল বিদ্রোহ, পরিসমাপ্তিতে তা হয়েছে বিজয়। পরাক্রমের দ্বারাই এই ফল লাভ করেছি আমরা।

'আজ সূর্যোদয়ের সময় অত্যাচারীরা রণসজ্জায় নিজেদের শোভিত করে হাতে অস্ত্র নিয়ে নিজেদের সেনানায়কের কাছে আদেশ প্রার্থনা করেছিল। সেনানায়করা আবার রাজার কাছে গিয়ে নিবেদন করেছিল : আপনি আমাদের সকলকে পরিচালিত করুন।

'তাদের বুকে ছিল গর্ব এবং সংখ্যায় তারা ছিল কুড়ি হাজার।

'পাখির বাসা যেমন পালক দিয়ে আবৃত থাকে সেনাদের মাথায় গোঁজা পালকও রণক্ষেত্রকে আবৃত করে ফেলেছিল। উত্তেজনায় হাতের বর্শাগুলো তারা আকাশের দিকে ছুড়ছিল এবং সূর্যের আলোয় সেগুলো ঝলসে উঠছিল। যুদ্ধের জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল এবং আনন্দে তাদের মন নেচে উঠছিল।

'তারা আমার দিকে ধেয়ে আসছিল। তাদের মধ্যে যারা মহাবীর তারা ধৈর্য্যহীন হয়ে পড়ছিল আমাকে বধ করবে বলে। তারা চিৎকার করে বলছিল : ও তো শেষ হয়েই আছে।

'এবার তাদের ওপর আমি নিঃশ্বাস ছাড়লাম। সেই ঝড়ে কুটোর মতো উড়ে গেল তারা।

'আমার নিক্ষিপ্ত বজ্র তাদের এফোড় ওফোড় করে দিল। আমার বজ্রের আঘাতে তাদের পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল।

'তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং প্রাতঃকালের কুয়াশার মতো এক সময় বিলীন হয়ে গেল।

'এখন তারা নেকড়ে ও শকুলের খাদ্য হয়ে রণক্ষেত্রে পড়ে আছে। রণক্ষেত্র এখন তাদের রক্তে সিক্ত।

'সূর্যোদয়ের সময় যে সব মহাবীরগণ রণহুঙ্কার দিচ্ছিল তারা এখন কোথায়?

'গর্বভরে যারা সকালে চিৎকার করছিল : ওরে ও তো একটা মৃত সৈনিকমাত্র– তারা এই মুহূর্তে কোথায়?

'তারা তো এখন মাথা নিচু করে আছে তবে নিদ্রায় নয়। তারা এখন মাটিতে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে তবে নিদ্রিত নয়।

'তারা এখন বিস্মৃতির আঁধারে আবৃত; তারা আর কখনো প্রত্যাগমন করবে না। অন্যেরা এখন তাঁদের পত্নীর নায়ক এবং তাদের সন্তানরাও এখন তাদের স্মরণ করে না।

'আর আমি ইগল পাখির মতো অনেক উঁচুতে গিয়েও নিজের বাসায় প্রত্যাগমন করেছি।

'আমি সারা রাত হেঁটে বেড়িয়ে প্রাতঃকালে আমার সন্তানদের কাছে ফিরে এসেছি।

'তোমরা আমার আপনজন। এসো আমার বুকে এসো, আমি তোমাদের সুখ দেব, আরাম দেব। তোমরা আশাহত হবে না আমার কাছে এলে।

'সু-সময় আমাদের এসেছে, যা পেয়েছি তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিই।

'শীত বিগত, বসন্ত সমাগত।

'অশুভ শক্তি মুখ লুকিয়েছে, মার্জনা ও আনন্দ এখন এখানে রাজত্ব করবে।

'আনন্দ করো। হে আমার ভাইরা তোমরা আনন্দ করো।

'অত্যাচারীর দিন শেষ হয়েছে। দলনকারীকে আমরা দলিত করেছি, সেই আনন্দে সারা বিশ্ব মেতে উঠুক।'

ইগনোসির বক্তব্য শেষ হতেই সমস্বরে সকলে বলে উঠল,

'তুমিই আমাদের রাজা, এই ভূখণ্ডের অধীশ্বর।'

এইভাবেই আমার ভবিষদ্বাণী নির্ভুল প্রমাণিত হল এবং আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে টোয়ালার মুন্ডহীন শব তারই প্রাসাদের বাইরে শুকিয়ে শক্ত হয়ে পড়ে থাকল।

১৫
অসুস্থ ক্যাপ্টেন গুড

যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে আহত স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুডকে রাজবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। সেইখানেই তাদের থাকবার ব্যবস্থা ছিল। আমিও তাদের সঙ্গে গেলাম। রক্তক্ষরণ এবং প্ররিশ্রমের ফলে ওরা দুজনেই অত্যন্ত অবসন্ন। অবশ্য ওদের তুলনায় আমার শারীরিক অবস্থা ভাল ছিল। আমার শরীর রোগা বলে আমি অনেক পরিশ্রম করতে পারি ও অনেক কষ্টও সহ্য করতে পারি। কিন্তু সত্যি বলতে কী, ঐ রাতে আমার অবস্থা বেশ কাহিল হয়ে গিয়েছিল। আমার সমস্যা একটাই ছিল, খুব ক্লান্ত থাকলে অতীতে সিংহের আক্রমণের ফলে শরীরে যে ব্যথাটা হয়েছিল তা চাগিয়ে উঠত। তাছাড়া, আজ সকালে টোয়ালার সেই দানবাকৃতি সৈন্যটার মারে আমি তো সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের তিন মূর্তির যা দুরবস্থা হয়েছিল তার জুড়ি মেলা ভার। তবে আমাদের সান্ত্বনা একটাই যে, আমাদের চেয়েও বহু গুণ শক্তিশালী ব্যক্তিরা খোলা আকাশের নিচে হাত পা ছড়িয়ে চির নিদ্রায় শায়িত ছিল। তারা যখন ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠেছিল তখন তো বেশ শক্ত সামর্থ ছিল।

ফৌলাটা নামের যে নর্তকীকে আমরা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম সে আমাদের দেখাশুনা করবার ভার নিজেই নিয়েছিল। রাজপুত্র স্ক্রাগার হাতে তো তার নিশ্চিত মৃত্যু ছিল। ফৌলাটার সহায়তায় ক্যাপ্টেন গুডের বুকে বেঁধে রাখা লৌহ জালিকার বর্মটা খুলে ফেলা হল। এই বর্মের জন্যই কুকুয়ানা সৈন্যের হাত থেকে ক্যাপ্টেন গুড বেঁচে গিয়েছিল। বর্মের জন্য সৈন্যের বর্শাটা তার বুকে প্রবেশ করতে পারেনি ঠিকই তবে তার পাঁজরে জোর আঘাত লাগিয়েছিল। স্যার হেনরির আঘাতও বেশ গুরুতর ছিল। ফৌলাটা সবুজ রংয়ের কয়েকটা পাতাকে বেটে নিয়ে এল এবং সেই থকথকে মলমের মতো জিনিসটা আমাদের সকলের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিল। এতে অবশ্য আমরা বেশ আরাম বোধ করলাম।

আমাদের তিনজনের মধ্যে ক্যাপ্টেন গুড ও স্যার হেনরির শরীরের আঘাতই ছিল গুরুতর। ক্যাপ্টেন গুডের সুন্দর শুভ্র পায়ের মধ্যে তো আস্ত একটা গর্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সেটা দিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল। টোয়ালার কুড়ালের আঘাতে স্যার হেনরির চোয়ালে বেশ বড় একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে ক্যাপ্টেন গুড শল্য চিকিৎসায় দক্ষ ছিল। তার ওষুধের বাক্সটি আনিয়ে স্যার হেনরির মুখের ক্ষত প্রথমে ভালভাবে পরিষ্কার করে নিল এবং তারপর সেটা সেলাই করে দিল। এবার সে নিজেই

নিজের ডাক্তারি করল। হারিকেনের স্বল্প আলোয় নিজের শরীরের ক্ষতস্থান সমূহ পরিষ্কার করে মলম লাগিয়ে দিলে রুমাল দিয়ে আমরা তা বেঁধে দিলাম।

ফৌলাটা এই অবসরে আমাদের জন্য বেশ ঝাঁঝালো একটা স্যুপ বানিয়ে আনল। সেটা খাওয়ার পর আমরা যেখানে পারলাম শুয়ে পড়লাম। ভাগ্যের কী পরিহাস! গত রাতে যে বিছানায় মহা শক্তিধর টোয়ালা নিদ্রা গিয়েছিল আজ সেখানে এক অজ্ঞাত পরিচয় ভিন দেশি পুরুষ হাত পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে।

'ঘুমাচ্ছে' কথাটা বোধ হয় ঠিক বললাম না কারণ চতুর্দিকে শুধুই যখন কান্নার ও বিলাপের রোল শোনা যাচ্ছে তখন ঘুমানো কি সম্ভব! শহরের প্রতিটি কোণা থেকে ভেসে আসছিল হৃদয় বিদারক রোদন ধ্বনি। ষাট হাজার কুকুয়ানা সেনানীর মধ্যে বারো হাজার তো নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। যারা চলে গিয়েছে তারা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। স্বামী, ভাই অথবা পুত্রকে চিরদিনের মতো হারিয়ে শহরের নারীরা চোখের পানি ফেলছিল। মাত্র একজন মানুষের উচ্চাশাকে ফলপ্রসূ করতে গিয়ে কত অসংখ্য মানুষকে জীবন্মৃত অবস্থায় ফেলা হয় তা ভেবে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। মাঝরাতে অন্য দিকগুলো নিস্তব্ধ হলেও আমাদের শয়ন গৃহের পিছন দিক থেকে দীর্ঘ বিরতির পর একটা টানা বিলাপের সুর ভেসে আসছিল। পরে আমি জেনেছিলাম, মৃত রাজার জন্য বুড়ি গাগুল মাঝে মাঝেই নাকী সুরে কেঁদে উঠছিল।

রাতে আমি শুয়েছিলাম বটে কিন্তু মাঝে মধ্যেই চমকে চমকে উঠছিলাম। কেবলই আমার মনে হচ্ছিল, গত চব্বিশ ঘণ্টায় যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এবং আমি তার অন্যতম নায়ক। ঘোরের মধ্যে আমি দেখলাম সেই যে দানবের মতো যোদ্ধাটা আমাকে আক্রমণ করতে এসে নিজেই মারা গিয়েছিল সে আমার দিকে তেড়ে আসছে। আবার কখনো দেখলাম আমি 'ধূসর' বাহিনীর একজন বীর যোদ্ধা; ছোট টিবির ওপর দাঁড়িয়ে টোয়ালার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করছি। আবার এক সময় দেখলাম, রাজা টোয়ালার ছিন্ন মস্তকটা মাটিতে গড়াতে গড়াতে আমার পায়ের কাছে এসে থামল। সেখান থেকেই আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল এবং রাগে দাঁতে দাঁত ঘষল।

আমার রাত তো এইভাবে কাটল। তারপর শুনলাম, অন্যদের অভিজ্ঞতাও অনুরূপ। তবে ক্যাপ্টেন গুডের শরীরে বেশ জ্বর এবং মাথা ভার হয়ে আছে। খানিক পরে তার থুতুর সাথে রক্ত উঠে আসতে লাগল। তার মানে, সেই কুকুয়ানা সৈনিকটা তাকে মারতে না পারলেও ক্যাপ্টেন গুডের শরীরের ভিতর এমন আঘাত করেছে যে এখন রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এতে আমরা সকলেই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। স্যার হেনরিকে অবশ্য অনেকটাই সুস্থ মনে হল যদিও মুখের ক্ষতের জন্য খাবার খেতে তার অসুবিধা হচ্ছিল এবং হাসতে আরো বেশি অসুবিধা হচ্ছিল।

সকাল আটটার সময় ইনফাদুস আমাদের সাথে দেখা করতে এল। সারাটা রাত নিদ্রাহীন অবস্থায় সে ছিল বলে শুনলাম। ক্যাপ্টেন গুডের শারীরিক অবস্থার কথা শুনে সে ব্যথিত হল। স্যার হেনরির সাথে সে এমনভাবে কথা বলছিল যেন হেনরি কোনো অতি-মানব। পরে জেনেছিলাম, বীরত্বের জন্য স্যার হেনরি কুকুয়ানাদের দেশে প্রবাদ পুরুষ হয়ে গিয়েছিল। সারা দিন প্রচন্ড পরিশ্রমের পর মানসিক চাপ সহ্য করে কোনো রক্ত মাংসের মানুষ যে টোয়ালার মতো মহাবীরকে একক যুদ্ধে বধ করতে পারে তা

বিশ্বাস করা যায় না। টোয়ালা যে কেবল দেশের রাজা ছিল তা নয়, তার সমকক্ষ যোদ্ধা ঐ দেশে দ্বিতীয় কেউ ছিল না। টোয়ালার গলাটা ষাঁড়ের গলার মতো শক্ত। সেই গলা এক কোপে কেটে ফেলা! এই মোক্ষম কোপকে দেশের লোক নাম দিয়েছিলেন, হেনরির কোপ।'

ইনফাদুসের মুখে শুনলাম, রাজার মৃত্যু সংবাদে দুরবর্তী স্থানে অবস্থিত রাজার অনুগত সব সেনা নায়করা ইগনোসির বশ্যতা স্বীকার করেছে এবং কোথাও কোনো গন্ডগোলের আশংকা নেই। রাজা টোয়ালার একমাত্র সন্তান স্ক্রাগা জীবিত না থাকায় ভবিষ্যতেও বিদ্রোহের কোনো সম্ভাবনা নেই।

রক্তের নদীতে সাঁতার কেটে ইগনোসি সিংহাসনের কাছে পৌঁছেছে– এই মন্তব্য করলে ইনফাদুস বলল, 'মাঝে মধ্যে রক্তপাত না ঘটালে কুকুয়ানাদের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। লোক কিছু মারা গিয়েছে ঠিকই কিন্তু তাদের ছেলেরা বেঁচে আছে এবং তাদের স্ত্রীরাও বেঁচে আছে। কিছু কাল পর তারা মাথা চাড়া দেবে। তবে বেশ কয়েক বছর এখানে শান্তি বিরাজ করবে।'

আরো বেলা বাড়লে ইগনোসি আমাদের সাথে দেখা করতে এল। রাজকীয় সম্মানের প্রতীক বড় হিরাটা তার কপালে জ্বল জ্বল করছিল। তার প্রতিটি প্রতিক্ষেপে ক্ষমতার গাম্ভীর্য প্রকাশ পাচ্ছিল। কয়েকজন সুঠাম দেহী যোদ্ধা তার পিছনে পিছনে আসছিল। তাকে দেখে কয়েক মাস আগের ঘটনাটা মনের পটে ভেসে উঠল। এক জুলু যুবক ডারবান শহরে আমাদের সাথে দেখা করে একটা কাজ চাইছে। ভাগ্যের চাকা কীভাবে ঘোরে! নতমুখে দরজার বাইরে বসে থাকা সেই যুবকটিই আজ এই দেশের অধীশ্বর!

তাকে দেখে আমি বললাম, 'রাজাকে স্বাগত জানাই।' তিলমাত্র বিলম্ব না করে সে বলল, 'রাজা ঠিকই কিন্তু তা সম্ভব হয়েছে তোমাদের তিন জনের শক্তিতে।'

কথা প্রসঙ্গে সে জানালো যে, পক্ষ কালের মধ্যে সে একটা মহাভোজের আয়োজন করতে চলেছে এবং ঐ ভোজসভায় জনসাধারণের সাথে সে পরিচিত হবে।

গাগুলকে নিয়ে তার চিন্তা ভাবনা কী তা জানতে চাইলে সে বলল, 'শয়তানি বুদ্ধির আকর হল ঐ বুড়ি। ওকে এবং ওর সাথে সব ডাইনি বিশারদগুলোকে একেবারে মেরে ফেলতে না পারলে আমার শান্তি নেই। বুড়ির যে কত বয়স তা কেউ জানে না। সবাই ওকে বুড়ি হিসাবেই দেখেছে। ডাইনি চিহ্নিত করবার অজুহাতে গাগুল ও তার অনুচরেরা যে কত লোকের প্রাণ নিয়েছে তার হিসাব নেই। ওর দুষ্কর্মের জন্যই এই দেশের পাপ বেড়েছে।'

ইগনোসিকে সাবধান করে দিয়ে বললাম, 'দেখ, জ্ঞান সংগ্রহ করা কঠিন কিন্তু বিনষ্ট করা সহজ। একথা অনস্বীকার্য যে অনেক রহস্যের চাবিকাঠি গাগুলের কাছে আছে।'

একটু চিন্তা করে ইগনোসি উত্তর দিল, 'সেটা মানছি। ঐ যে রাজপথটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, মারা গেলে রাজাদের কোথায় সমাধিস্থ করা হত, দূরের ঐ ত্রিমূর্তি পাহাড়ের গোপন কথা কিংবা ঐ মহামৌন পাহাড়ের ইতিহাস সব কিছুই বুড়ি গাগুল জানে।'

আমি বললাম, 'শুধু তাই নয়, হিরার খবর যদি কেউ জানে তো সে হল গাগুল। তোমার শপথের কথা ভুলে যেও না। তুমি কথা দিয়েছিলে হিরার খনি আমাদের চিনিয়ে দেবে। গাগুলকে হত্যা করলে কে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে? প্রয়োজনে গাগুলকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

ইগনোসি বিদায় নিলে আমি ক্যাপ্টেন গুডকে দেখতে গেলাম। তার জ্বর বেড়েছে এবং জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছিল। তার সঙ্কটজনক অবস্থা আরো চার পাঁচ দিন ছিল, ফৌলাটা প্রতি নিয়ত তার সেবা করে চলেছিল বলেই ক্যাপ্টেন খানিকটা আরাম বোধ করতে পেরেছিল।

গাত্রবর্ণ যাই হোক না কেন, দেশ যাই হোক না কেন, নারী সর্বত্রই নারী। মমতাময়ী মায়ের জাত তারা। কৃষ্ণকায় এই নারী যেন সেবার প্রতীক। না খেয়ে, না ঘুমিয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সাথে একাগ্রচিত্তে ক্যাপ্টেন গুডের সেবা করে চলেছিল। প্রথম দু-একদিন আমি তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। স্যার হেনরিও তাকে বিশ্রাম নিতে বলেছিল কিন্তু ফৌলাটা একেবারেই সম্মত হয়নি। অবশেষে ক্যাপ্টেন গুডের পরিচর্যার ভার সে নিজের হাতেই তুলে নিয়েছিল। দিন ও রাতের চব্বিশটি ঘণ্টাই সে তার খেয়াল রাখত, দুধ ও অন্যান্য স্থানীয় জড়ি-বুটি দিয়ে তৈরি একটা পানীয় তাকে দিত এবং তার ক্ষতস্থানে মাছি বসতে দিত না। আজও আমার সেই দৃশ্যটা মনে ভেসে ওঠে। ঘরের মধ্যে একটা প্রদীপ জ্বলছে, বিছানায় অসুস্থ ক্যাপ্টেন গুড এপাশ ওপাশ করছে, মাঝে মাঝেই বিড় বিড় করে কীসব যেন বলছে আর তার পাশেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে এক কুকুয়ানা যুবতী যার নাম ফৌলাটা; তার চোখে অতল সহমর্মিতা নাকি তার চেয়েও বেশি কিছু?

দুদিন অতিবাহিত হল। আমরা ধরেই নিলাম ক্যাপ্টেন গুড আর বাঁচবে না। আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু ফৌলাটার আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরল না। সে ধরেই নিয়েছিল ক্যাপ্টেন গুড ঠিক সুস্থ হয়ে উঠবে।

যেখানে ক্যাপ্টেন গুডকে রাখা হয়েছিল তার আশে পাশের বাড়িগুলোতে কোনো লোককে থাকবার অনুমতি দিল না নতুন রাজা ইগনোসি। অবশ্য আমি ও স্যার হেনরি যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকলাম। সব লোককে সরিয়ে দেওয়ার একটিই কারণ যাতে কোনোরকম হৈ হট্টগোল ক্যাপ্টেন গুডের কানে না পৌছায়। পঞ্চম রাতে আমি ক্যাপ্টেন গুডের ঘরে গেলাম।

পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে দেখলাম ক্যাপ্টেন নিশ্চল হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে, একদম ছটফট করছে না। তার এই অবস্থা দেখে আমার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তাহলে কি সব আশার অবসান হল?

রোগীর পিছন থেকে কেউ যেন 'হুস' শব্দ করে আমাকে চুপ করতে বলল। খুব সাবধানে লঘু পায়ে কাছে এসে দেখলাম ক্যাপ্টেন গুড গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন এবং ফৌলাটার একটা আঙ্গুল সে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে আছে। পরে শুনেছিলাম আঠারো ঘণ্টা ফৌলাটা ঐভাবে বসেছিল। হাত ছাড়িয়ে নিলে পাছে ক্যাপ্টেনের ঘুম ভেঙে যায় তাই ঐ অবস্থায় সে বসেছিল। এতটা সময় এক ভাবে বসে থাকলে মানুষের শরীরে খিল ধরে যায়। ফৌলাটা সব সহ্য করেছে। এতক্ষণ ধরে সে না খেয়েছে খাবার, না খেয়েছে পানি। ক্যাপ্টেনের ঘুম ভাঙবার পর ফৌলাটার নিজের

শক্তিতে আর উঠে দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না। তাকে তুলে ধরে অন্যত্র নিয়ে যেতে হয়েছিল।

এরপর থেকেই ক্যাপ্টেন গুডের আরোগ্যলাভ খুব দ্রুত হতে শুরু করল। সুস্থ হবার মুখে স্যার হেনরি একদিন তাকে এই ঘটনার কথা বললে ক্যাপ্টেনের চোখ তো জলে ভরে গেল। সব শুনে সে ফৌলাটার কুটিরে গেল, মেয়েটা তখন আমাদের সকলের জন্য দুপুরের খাবার তৈরি করছিল। যাবার সময় দোভাষী হিসাবে সে আমাকেও সঙ্গে নিল। ফৌলাটা যদি বিদেশি শব্দের মানে না বুঝতে পারে তখন আমার কাজ হবে তা বুঝিয়ে বলা।

ক্যাপ্টেন গুড শুরু করল, 'ওকে বুঝিয়ে বল যে আমার জীবন ফিরে পাবার জন্য আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ এবং ওর মমতার কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।'

তর্জমা করে দিয়ে দেখলাম গায়ের রঙ কালো হলেও লজ্জায় তার মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে। বনের পাখির মতো চট করে সে ক্যাপ্টেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে সুন্দর বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল, 'মালিক এই ধরনের কথা বলে আমাকে ছোট করছেন কেন? সেদিন যদি আপনি না থাকতেন, তাহলে আজ আমি কি সূর্যের আলো দেখতে পেতাম?'

ফৌলাটার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে মনে বড় ব্যথা পেলাম। টোয়ালার হাত থেকে তাকে বাঁচানোর প্রক্রিয়ায় আমার ও স্যার হেনরির কী ভূমিকা ছিল তা সে একেবারেই ভুলে গেল! কেবল ক্যাপ্টেন গুডের অবদানই তার মনে থাকল! ধন্য তুমি, নারী! এই প্রসঙ্গে আমার স্ত্রীর কথা মনে পড়ল। তিনিও একই ধরনের আচরণ করেন। বিষণ্ন মনে এখান থেকে চলে এলাম, তবে ফৌলাটার চোখের নরম দৃষ্টি কিংবা ক্যাপ্টেন গুডের জাহাজীর দৃষ্টি কোনোটাই আমার ভাল লাগল না।

পৃথিবীতে দুটো জিনিস কেউ আটকাতে পারে না। প্রথমটা হল, জুলু সম্প্রদায়ের লোকদের লড়াই করবার প্রবৃত্তি এবং ছোট আস্কারাতেই জাহাজীদের প্রেমে পড়বার আসক্তি।

কয়েকদিন পর ইগনোসি সমস্ত প্রধানদের এক সভা ডাকল এবং সকলেই তাকে রাজা বলে স্বীকার করে নিল। সভা শেষ করে পুরো সেনাবাহিনী সে পরিদর্শন করল। 'ধূসর' বাহিনীর যে সব যোদ্ধারা জীবিত ছিল তারা সকলে তার সামনে প্যারেড করে গেল। মহাযুদ্ধে মহান ভূমিকার জন্য ইগনোসি তাদের ভূয়সী প্রশংসা করল। প্রতিটি সেনাকে গবাদি পশু উপহার দেওয়া হল এবং তাদের পদোন্নতি করা হল। সারা কুকুয়ানা ভূখণ্ডে রাজা আদেশ জারি করল যে আমাদের তিনজন শ্বেতকায় ব্যক্তিকে দেশের সমস্ত লোক রাজকীয় সম্মান জানাবে। মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতাও আমাদের দেওয়া হল। পূর্বের শপথ অনুসারে ইগনোসি ঘোষণা করল যে বিনা বিচারে কারো শাস্তি হবে না এবং ডাইনি চিহ্নিতকরণ পুরোপুরি অবৈধ ঘোষিত হল।

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর ইগনোসিকে বললাম, 'এবার রত্ন-খনির রহস্য জানতে চাই। সলোমনের নামাঙ্কিত রাস্তাটাই তো ওদিকে গিয়েছে। তুমি কি এ বিষয়ে কোনো খোঁজ খবর নিয়েছো?'

ইগনোসি উত্তর দিল, 'যে বিষয়ে তোমাদের কৌতূহল আছে তা কি পরে করব বলে ফেলে রাখা যায়? যে জায়গায় ঐ 'মৌন ত্রিমূর্তি' আছে সেখানেই আছে সলোমনের

রত্নাগার। ঐ পাহাড় তিনটার উদ্দেশে রাজা টোয়ালা তো মেয়েটাকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিল। ঐখানে পাহাড়ের মধ্যে এক গুহায় এই দেশের রাজাদের সমাধিস্থ করা হয়। টোয়ালার মৃতদেহকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হবে। ঐ গুহা ছাড়িয়ে গেলে একটা সুগভীর বিশাল আকারের কুয়া আছে। কতকাল আগে যে ঐ কুয়াটা খনন করা হয়েছিল তা কেউ বলতে পারে না। আমি যখন নাটালের কিমবার্লি শহরে ছিলাম তখন শুনেছিলাম ত্রিমূর্তি পাহাড়ের গায়ে যে বড় কুয়াটা আছে সেখান থেকে প্রচুর উজ্জ্বল সাদা রঙের পাথর পাওয়া গিয়েছিল। এই পাথরের খোঁজেই তো তোমরা এখানে এসেছ। যেখানে রাজাদের সমাধিস্থ করা হয়েছে সেখানে আরো একটা গুপ্ত গুহা আছে যার কথা রাজা এবং গাগুল ভিন্ন অন্য কেউ জানে না। রাজা টোয়ালা তো এখন মৃত আর আমি রাজা হয়েও গুহার অবস্থান সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারিনি। গুপ্ত গুহাতে কী রাখা আছে তাও আমার জানা নেই। তবে এখানে একটা উপকথা চালু আছে যে বহুকাল আগে এই দেশে একজন শ্বেতকায় ব্যক্তি এসেছিল এবং এদেশেরই একজন নারী তাকে ঐ গুপ্ত গুহায় নিয়ে যায়। গুহাতে সঞ্চিত বিশাল রত্নভাণ্ডার নারীটি শ্বেতকায় লোকটিকে দেখিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঐ নারী তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং রাজা ঐ পুরুষটিকে বিতাড়িত করে। ঐ দিনের পর থেকে লোকটির সম্বন্ধে আর কোনো কথাই শোনা যায়নি এবং অন্য কোনো লোকও ঐ গুহায় পা রাখেনি।'

আমি বললাম, 'প্রচলিত উপকথাটি একেবারে সত্যি। ইগনোসি তোমার কি মনে আছে, এখানে আসবার পথে একটা গুহায় আমরা এক শ্বেতাঙ্গের মরদেহ দেখেছিলাম?'

ইগনোসি বলল, 'হ্যাঁ, বেশ মনে আছে সেই দৃশ্য। তবে রাজা হিসাবে আমি তোমাকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি এবং যাওয়ার সব ব্যবস্থাও করে দেব। ওখানেই যে রাশি রাশি হিরা সঞ্চিত করে রাখা আছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

– তোমার কপালে বেঁধে রাখা হিরাটাই সে কথা প্রমাণ করে দিচ্ছে।

– তাহলে সেখানে গিয়ে দেখে এসো। এদেশ ছেড়ে যদি তোমরা কোনোদিন চলে যেতে চাও তাহলে তোমাদের খুশি মতো হিরা সংগ্রহ করে নিয়ে এসো।

– কিন্তু ঐ গুপ্ত গুহার সন্ধান তো পেতে হবে প্রথমে।

– ঐ গুহার সন্ধান কেবল একজন মানুষই দিতে পারে যার নাম গাগুল।

– যদি সে আমাদের না দেখাতে চায়?

– তাহলে তাকে মরতে হবে। এই কাজের জন্যই আমি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি।

একজন ভৃত্যকে ডেকে ইগনোসি আদেশ করল গাগুলকে যেন তার সামনে হাজির করানো হয়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দু'জন রক্ষী বুড়ি গাগুলকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হল। সারাক্ষণ বুড়ি তাদের অকথ্য ভাষায় অভিশাপ দিচ্ছিল। আমাদের সামনে এসে রক্ষীরা গাগুলকে মাটিতে নামিয়ে দিল। আমার মনে হল তারা একটা বস্তা নামিয়ে দিল। তার চোখের দৃষ্টি দেখে আমি শিউরে উঠলাম। যেন একটা সাপ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

খনা গলায় বুড়ি বলল, 'কিরে ইগনোসি, আমাকে নিয়ে কী করবি তাই ভাবছিস বুঝি? আমাকে স্পর্শ করলে কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। যেখানে

বসে আছিস ওখানেই মরে পড়ে থাকবি, আমার মন্ত্রের গুণ তো জানিস ভাল করেই।'

ইগনোসিও কম যায় না। সে বলল, 'তোর মন্ত্র কি টোয়ালাকে রক্ষা করতে পারল? তুই আমার কিছুই করতে পারবি না। তোর কাছ থেকে জানতে চাই চকচকে পাথরগুলো কোথায় গেলে পাব।'

বুড়ি চিৎকার করে বলল, 'সেটি বলছি না বাপু। আমি ছাড়া সেই পাথরের সন্ধান আর কেউ জানে না। তোর ঐ শ্বেতকায় শয়তান বন্ধুগুলোকে খালি হাতেই এখান থেকে ফিরে যেতে হবে।'

– তোকে আমি বলিয়ে ছাড়ব। তুই আমাকে বলবি।

– ইগনোসি, তুই রাজা হতে পারিস কিন্তু কোনো নারীর মুখ খোলাতে তুই পারবি না।

– কাজটা শক্ত হলেও আমি নিশ্চয়ই পারব।

– কেমন করে পারবি? খুব শুনতে ইচ্ছা করছে।

– তুই না বললে তোকে তিলে তিলে শুকিয়ে মারব।

– মারবি! আমাকে একবার ছুঁয়ে দেখ না, তোর কী হয়। আমি তোর বাপকে, তার বাপকে, তার বাপকে আবার তারও বাপকে জন্মাতে ও মরতে দেখেছি, এই দেশটার জন্মলগ্নে আমি ছিলাম, এখনও আছি আবার পরেও থাকব। দুর্ঘটনা ছাড়া আমার মৃত্যু হবে না। তুই আমাকে মারবি কিরে!

– দেখ শয়তানি বুড়ি গাগুল। এক কোপে তোকে আমি মেরে ফেলব। তুই এতই বুড়ো হয়েছিস যে জীবনটা তোর একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোর চুল নেই, দাঁত নেই, শরীরের কোনো আকৃতি নেই। কেউ যদি তোকে হত্যা করে সে তোর উপকারই করবে।

গাগুল বলল, 'আরে মূর্খ! যৌবনটাই কি জীবন? যৌবনেও মানুষ নিজের মৃত্যু কামনা করে। যখন তাদের ভালোবাসার লোক জীবনের পরপারে চলে যায় তখন তারা আর বাঁচতে চায় না। আর যারা বুড়ো, তারা ওসব গ্রাহ্যই করে না। কে এল, কে গেল– এই নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। অন্যের মৃত্যু দেখে তারা হাসতে পারে, অ-কাজ, কু-কাজ দেখে তারা মজা পায়। তারা জীবনকেই শুধু ভালোবাসে। উষ্ণতা, সূর্যের উষ্ণতা; মধুরতা, বাতাসের মধুরতাকে তারা ভালোবাসতে জানে। শীতলতা, কেবল শীতলতা ও অন্ধকারকেই তারা বড় ভয় পায়।' কথাগুলো বলে হা হা করে হাসতে হাসতে গাগুল মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

বজ্রকণ্ঠে ইগনোসি বলল, 'ঢের হয়েছে, চুপ কর। কোথায় চকচকে পাথরগুলো রাখা আছে তা তুই দেখাবি কিনা বল। যদি না বলিস, এই বর্শাটা ছুড়ে তোকে এখুনি মেরে ফেলব।'

এতেও গাগুল ভয় না পেয়ে বলল, 'কিছুতেই বলব না। আমাকে যে হত্যা করবে সে নিজেই ধ্বংস হবে।'

বুড়ির কাছে গিয়ে ইগনোসি বর্শা দিয়ে আস্তে করে তার গায়ে খোঁচা দিল। বুড়ি গাগুল চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল আবার ধীরে ধীরে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

গাগুল বলল, 'সব দেখিয়ে দেব। আমাকে একটু বসতে দে। রোদে বসতে দে, একটু খেতে দে।'

ইগনোসি বলল, 'খুব ভাল কথা। কাল তুই এই শ্বেতকায় বন্ধুদের এবং ইনফাদুসের সঙ্গে যাবি এবং সব কিছু দেখিয়ে দিবি। অন্যথা হলেই না খেয়ে তুই মরবি।'

– না, না, কেন দেখাব না! আমার কথার দাম আছে। একটা শ্বেতকায় লোককে এক নারী ঐ গুপ্ত গুহাতে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু সাদা চামড়ার লোকটা আর ফিরে এল না। জানো, সেই মেয়েটার নাম কী ছিল? তারও নাম ছিল গাগুল।

আমি আর চুপ থাকতে না পেরে বললাম, 'এ একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা। সে তো দশ পুরুষ আগের ঘটনা।'

গাগুল বলতে লাগল, 'হতে পারে, দীর্ঘ দিন বাঁচলে মানুষের মতিভ্রম হয়। হয়ত আমার মায়ের মা ছিল ঐ মেয়েটা। তারও নাম ছিল গাগুল। এক সময় যেখানে চোখ ধাঁধানো সাদা পাথরগুলো ছিল এখন হয়ত নুড়ি পাথরে ভর্তি একটা বস্তা পড়ে আছে। সাদা চামড়ার লোকটা তো ঐ রকম একটা বস্তা নিয়েই ওখানে গিয়েছিল। বস্তাটা অবশ্য পশু চামড়ার তৈরি। ঐ বস্তাতে চকচকে পাথরগুলো ভরেও ফেলেছিল কিন্তু কপালে সইল না। এসব কাহিনী আমি দিদিমার মুখে শুনেছি। চল, আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। যুদ্ধে যারা মারা গিয়েছে তাদের শবগুলো রাস্তায় পড়ে আছে ঠিকই কিন্তু চোখগুলো কেউ খুবলে নিয়ে গিয়েছে এবং তাদের বুকের পাঁজরগুলোও ফাঁপা হয়ে গিয়েছে। হা-হা।'

১৬
মৃত্যুর দেশে

তিন দিন পর সন্ধ্যার মুখোমুখি আমরা 'মৌনী ত্রিমূর্তি' অর্থাৎ পাহাড় তিনটা যেখানে একটা ত্রিভূজ তৈরি করেছে সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। সলোমনের রাজপথটা ওপাশ দিয়েই গিয়েছে। আমরা তিনজন ছাড়াও দলে ছিল তিনজন ভৃত্য, ইনফাদুস, ফৌলাটা যে আমাদের তিন জনকে দেখাশুনা করলেও ক্যাপ্টেন গুডের খেয়াল বেশি রাখত এবং গাগুল। তাকে একটা পালকি করে বয়ে আনা হয়েছিল এবং সারাটা রাস্তা সে দলের সব লোক জনকে গালি গালাজ করতে করতে এসেছিল। আমাদের সাথে বেশ কয়েকজন রক্ষীও ছিল। পাহাড় তিনটার একটা ছিল আমাদের ডানদিকে, আরেকটা ছিল বাঁদিকে এবং তৃতীয়টা ছিল একেবারে আমাদের সামনের দিকে। পরের দিন সকালে সূর্যের প্রথম আলোয় পাহাড় তিনটার চূড়াগুলো কী যে অপরূপ লাগছিল! বরফের সাদা মালা পরে শৃঙ্গ তিনটা আমাদের থেকে অনেক অনেক ওপরে নীল আকাশের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। বরফ রেখার নিচের অংশটা ছিল বেগুনি, আরো নিচের অংশটা ছিল ঝোপঝাড়ে ভর্তি। সলোমনের রাজপথটা পাঁচ মাইল দূরে মাঝের পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওটাই ছিল রাজপথের শেষ প্রান্ত।

সকালে আমরা যখন ঐ স্বপ্নপুরীর উদ্দেশে রওয়ানা দিই তখন আমাদের মধ্যে যে কী উন্মাদনা ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা সেই রত্নের খনিতে পৌঁছাতে চলেছি যার জন্য তিনশো বছর আগে পতুর্গীজ অভিযাত্রী হোসে ডা সিলভেস্ট্রা এবং তার বংশধর এবং আরো পরবর্তীকালে স্যার হেনরির ভাই জর্জ কার্টিসকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। আমাদের কপালে কি ভাল কিছু লেখা আছে? বুড়ি গাগুল তো বলেই দিয়েছে, আগেও লোকে খালি হাতে ফিরেছে এবং আমাদেরও ফিরতে হবে। আমাদের গন্তব্যস্থলের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে নিজেকে বেশ সংস্করাচ্ছন্ন মনে হতে লাগল। আমার মনে হয়, স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুডের মানসিক অবস্থা একই রকম ছিল।

মনের উত্তেজনায় ঘণ্টা দেড়েক আমরা তিনজন ছুটতেই শুরু করেছিলাম বলা যায়। আর একটুখানি গেলেই হিরার খনি চলে আসবে আমাদের হাতের মুঠোয়। সে যে কী আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমাদের ছুটবার ফলে গাগুলের পালকি বাহকরা আমাদের সাথে তাল রাখতে না পেরে বারবার পিছিয়ে পড়ছিল। পালকির ঝাঁকুনিতে ব্যথা পেয়ে গাগুল আরো বেশি গালি গালাজ করছিল।

পালকি থেকেই সে চিৎকার করছিল, 'আরে সাদা ভুতের দল, অত জোরে ছুটছিস, কেন? রতনের টানে, না মরণের টানে ছুটছিস তোরা?' কথাগুলো বলে সে এমনভাবে হাসছিল যে, উৎসাহ হারিয়ে আমরা একেবারে ভেঙে পড়ছিলাম।

তার কথাকে উপেক্ষা করে আরো কিছুদূর যাওয়ার পর পাহাড়ের গায়ে একটা বড় গহ্বর দেখতে পেলাম। দূর থেকেই মনে হল ওটার গভীরতা কম পক্ষে তিনশো ফুট হবেই। গহ্বরের মুখটা অন্তত আধ মাইল চওড়া হবে এবং বাইরের দিকটা বেশ ঢালু।

অদ্ভুত আকারের এই গিরি বিবর দেখে আমি প্রশ্ন করলাম, 'এটা কী হতে পারে বলে তোমাদের মনে হয়?' স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুড দুজনেই অপার বিস্ময়ে গুহার দিকে তাকিয়ে আছে দেখলাম। আমার প্রশ্ন শুনে তারা কেবল ঘাড় নাড়ল। বুঝলাম, গুহার বিশেষত্ব তারা অনুমান করতে পারছে না।

আমি বললাম, 'কিমবার্লিতে খনি থেকে কীভাবে হিরা তোলা হয় তা তোমরা দেখনি মনে হচ্ছে। আমি জোর দিয়ে বলছি ওটাই হল সলোমনের হিরার খনি। গুহার আশে পাশে নীল রংয়ের পাথরগুলো দেখ। ওখান থেকে কীভাবে পাথর কেটে কেটে সিঁড়ির ধাপ তৈরি করেছিল দেখ। ঐ ধাপ দিয়ে ওরা নিচে ঐ নদীতে এসে খনি থেকে বের করে আনা পাথরগুলো ধুয়ে নিত।'

এখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে পড়ল হোসে ডা সিলভেস্ট্রার কাছে দেখা একটা মানচিত্রের কথা। এইখানেই তো রাস্তাটা ভাগ হয়ে গিয়েছে যার একটা ভাগ আংটির মতো গোল হয়ে এই পাহাড়টাকে ঘিরে রেখেছে। পাহাড় কেটে রাস্তাটা তৈরি করা হয়েছে এবং যাতে ধস না নামে সেজন্য পাহাড়ের অংশগুলোকে থাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বহুদূর থেকে পাহাড়ের ঢালু জায়গায় তিনটা বড় বড় থাম অস্পষ্টভাবে দেখা যেত। ওগুলো যে কী বস্তু তা জানবার আগ্রহ আমার আগের থেকেই ছিল। আজ সুযোগ পেয়ে ঐ থাম তিনটার দিকে এগিয়ে যেতেই বুঝলাম, স্থানীয় অধিবাসীরা এগুলোকেই 'মৌন ত্রিমূর্তি' বলে উল্লেখ করে। এগুলো আসলে তিনটা বিশাল আকারের মূর্তি, থাম মোটেই নয়। 'লু' লোকালয় থেকে ওগুলোর দূরত্ব প্রায় ষাট মাইল। মাথার মুকুট থেকে নিচের বেদী পর্যন্ত ওগুলোর দৈর্ঘ্য আঠারো ফুট। মূর্তিগুলোর মধ্যে একটা নারী মূর্তি, অন্য দুটো হল পুরুষের।

খোলা আকাশের নিচে থাকবার ফলে মূর্তিগুলোর অনেক ক্ষয় হয়েছে। নারী মূর্তিটা একেবারে আবরণহীন। পুরুষ মূর্তি দুটোর মধ্যে একটার মুখের ভাব তো একেবারে শয়তানের মতো। একটা পাশবিক নিষ্ঠুরতার ছাপ রয়েছে দ্বিতীয় মূর্তির মুখে। তৃতীয় মূর্তির মুখে রয়েছে একটা অন্য ধরনের ভাব। অন্য মানুষের কষ্ট উপভোগ করবার ভাব নয়, বরং বলা চলে কোনোরকম প্রতিক্রিয়া ছাড়াই অন্যের কষ্ট দেখে যাওয়ার ভাব। বিগত কয়েক শতাব্দী মুখের ঐ ভাব ও চোখের ঐ দৃষ্টি নিয়ে এই তিন 'মৌন মূর্তি' লু লোকালয়ের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে।

মূর্তি তিনটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বেশ কিছু প্রশ্ন আমার মনে ভিড় করতে শুরু করল। যেমন, কারা এই মূর্তিগুলো বানিয়েছিল, কার আদেশে ঐ বিশাল খনির মতো গর্তটা খোঁড়া হয়েছিল কিংবা ঐ রাজপথটা তৈরি করা হয়েছিল। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার মনে পড়ল বাইবেলের পুরনো সংস্করণে উল্লিখিত একটা ঘটনার কথা, যেখানে বলা আছে তিন দেবদেবীর সান্নিধ্যে সলোমন একবার নিরুদ্দেশ হয়ে

গিয়েছিল। এঁরা হলেন, জিডোনিয়ানদের উপাস্য দেবী অ্যাসটোরেথ, মোয়াবাটেদের দেবতা কেমোস এবং অ্যামন সন্তানদের দেবতা মিলকম। মূর্তি তিনটা যে ঐ তিন দেবদেবী ছাড়া অন্য কারো নয় সে কথা সঙ্গীদের আমি বললাম।

স্যার হেনরির উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল। আমার ধারণার কথা শুনে সে মন্তব্য করল, 'তুমি যা বলছ তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সলোমনের রাজত্বকালে ফিনিসিয়ানরা ব্যবসা বাণিজ্য করত এবং তাদের এক উপাস্য দেবী ছিলেন। পরবর্তীকালে গ্রীকরা তাঁর পূজা শুরু করে। তাঁর মাথায় বাঁকা চাঁদের মতো দুটো শিং ছিল। খুব সম্ভব যাদের ওপর এইসব খনি পরিচালনার ভার ছিল তারাই এইসব মূর্তি তৈরি করেছিল।'

আমরা যখন অতীতের এইসব স্মৃতি চিহ্নগুলো খুঁটিয়ে দেখছিলাম সেই সময় ইনফাদুস ওখানে এসে দাঁড়াল। ত্রিমূর্তির উদ্দেশে সে হাতের বর্শাটা উঁচু করে তুলে ধরে তার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাকে প্রশ্ন করল, 'আপনারা কি এখনই এই মৃত্যুর দেশে যেতে চান, নাকি দুপুরের খাওয়া শেষ করে গুহার ভিতরে ঢুকবেন? গাগুল বলছে দেরি না করে যদি এই মুহূর্তে আমরা ভিতরে যেতে চাই সে আমাদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাবে।' তখন সবে এগারোটা বাজে। তীব্র কৌতূহলের টানে আমরা তৎক্ষণাৎ যেতে রাজি হলাম। গুহার ভিতরে যদি একটু বেশি সময় থাকতে হয় তাহলে সঙ্গে কিছু খাদ্য দ্রব্য নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন বলে আমি সকলকে জানালাম। পালকি করেই গাগুলকে ত্রিমূর্তির সামনে আনা হলে সে নিজেই বেরিয়ে এল। ওদিকে ফৌলাটা আমাদের জন্য কিছু খাবার ও জলের ব্যবস্থা করে ফেলল। এখন আমাদের সামনে একটা খাড়া পাথরের দেওয়াল পঞ্চাশ ফুটের বেশি উঁচুতে উঠে ধীরে ধীরে বরফ চূড়াওয়ালা পাহাড়ের কোলের দিকে নেমে গিয়েছে। পালকি থেকে নেমে লাঠির ওপর ভর রেখে অগ্নিদৃষ্টিতে আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে ঐ খাড়া দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেল গাগুল। একটু এগোতেই চোখে পড়ল খনিতে প্রবেশ করবার একটা বড় গর্ত।

খনির প্রবেশ দ্বারে গাগুল আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার মুখে ছিল শয়তানের বিদ্রূপ মাখানো হাসি।

গাগুল আমাদের উদ্দেশ করে বলল, 'তারকালোক থেকে আগত হে শ্বেতকায় ব্যক্তিরা! তোমরা ভিতরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছো তো? হে সৈনিকগণ! তোমরাও প্রস্তুত তো? মহামান্য রাজার আদেশ পালন করতেই আমি এখানে এসেছি। চকচকে পাথরের ভান্ডার দেখানোর জন্য তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছেন, হা-হা।'

ভিতরে যাওয়ার জন্য আমরা সকলে প্রস্তুত সে কথা জানাতেই গাগুল বলল, 'অতি উত্তম, যা দেখবে তার জন্য তোমাদের মনকে শক্ত কর। ইনফাদুস, তুমিও চল। তুমিই সেই লোক যে তার মালিককে প্রতারণা করেছে।'

ইনফাদুস বলল, 'না, রত্নভান্ডারের ভিতরে আমার যাওয়ার কথা নয়। গাগুল, কান খুলে শোন– এই শ্বেতকায় প্রভুদের সম্বন্ধে তুমি কোনো হালকা মন্তব্য করো না, তাদের সাথে কোনোরকম চালাকি করলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য। তোমার মধ্যে পঞ্চাশটা ডাইনির শক্তি থাকলেও তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। আমার কথা কানে ঢুকলো তো?'

গাগুল বলল, 'তোমার কথা বেশ ভালভাবে শুনেছি। তোমাকে তো আমি চিনি, বাল্যকাল থেকেই লম্বা লম্বা কথা বলতে তুমি বেশ ওস্তাদ। আমার বেশ মনে আছে, তুমি যখন খুব ছোট ছিলে তখন তুমি নিজের মাকে পর্যন্ত ভয় দেখাতে। এসব তো সেদিনকার কথা। আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না, আমি যা করতে এসেছি তা রাজার আদেশে। অতীতে অনেক রাজার আদেশ আমাকে পালন করতে হয়েছে। পরিশেষে অবশ্য তারাই আমার আদেশ পালন করেছে, হা-হা। রত্নাগারের ভিতরে চল, এই নাও, প্রদীপটা ধরো।' গাগুল নিজের পরণের কাপড়ের ভিতর থেকে তেল ও সলতে দেওয়া একটা প্রদীপ বের করে আনল।

ক্যাপ্টেন গুড তার একান্ত প্রিয় পরিচারিকার কাছে কিছুটা কুকুয়ানা ভাষা লিখেছিল। সেই ভাষাতেই সে প্রশ্ন করল, 'তুমিও আসছো তো ফৌলাটা?'

মেয়েটা জবাব দিল, 'আমার খুব ভয় করছে।'

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'তাহলে খাবারের ঝুড়িটা আমাকে দাও।'

'তা হয় না। আপনি যেখানে যাবেন আমিও সেখানে যাব।' ফৌলাটা বলল।

প্রবেশ দ্বারটা এত সংকীর্ণ যে কেবল দুজন লোক পাশাপাশি হাঁটতে পারে। তার ওপর খনির ভিতরটা গাঢ় অন্ধকার। গাগুল তো পথ প্রদর্শক। সবার আগে সে ভিতরে প্রবেশ করলে আমরা তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। রত্নাগারের ভিতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর গাগুল আমাদের ডাকতে লাগল। তার কণ্ঠস্বর যে দিক থেকে আসছে তা অনুমান করে আমরাও এগিয়ে যেতে লাগলাম। মাঝে মাঝে কোনো পতঙ্গের ডানার আঘাত আমাদের মুখে লাগছিল।

এইরকম একটা ডানার ঝাপটা মুখে লাগতেই ক্যাপ্টেন গুড জানতে চাইল, 'মনে হল, কেউ যেন আমার মুখে চড় মারল, কী এটা?'

আমি তাকে নিশ্চিন্ত করবার জন্য বললাম, 'ও কিছু নয়, চামচিকে।'

পঞ্চাশ পা হাঁটার পর সুড়ঙ্গ পথে খুব হালকা আলোর আভাস পাওয়া গেল। এক মিনিট পর আমরা যা দেখলাম তাতে একেবারে নির্বাক হয়ে গেলাম। গবাক্ষ বিহীন একটা অতি বিশাল হল ঘর, ছাদটা প্রায় একশো ফুট উঁচু। ছাদের নিচে যে থামগুলো আছে তার পাশ দিয়ে বাইরের আলোর আভা খুব সামান্য পরিমাণে ভিতরে আসছে। প্রকৃতির তৈরি এই হলঘর মানুষের তৈরি যে কোনো হলঘরের চেয়ে অনেক বেশি চওড়া এবং মজবুত। যে বিশালাকৃতি থামগুলো এই হলঘরে ছিল এক নজরে মনে হবে সেগুলো বরফের তৈরি। প্রকৃতপক্ষে, সারি সারি থামগুলো ছিল চুনের তৈরি। গুহার ছাদ থেকে পানি চুইয়ে চুইয়ে পড়ে এই ধরনের থাম কোথাও কোথাও তৈরি হয়ে যায়। গুহার মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এক একটা থামের তলদেশের ব্যাস কম পক্ষে কুড়ি ফুট। চুনের তৈরি ধবধবে সাদা অসংখ্য থাম ছিল এই গুহার মধ্যে; আবার কতকগুলো থাম তৈরি হবার পর্যায়ে ছিল। গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার পর স্যার হেনরির প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, 'আরে, প্রাচীন গ্রীস মন্দিরের মতো দেখতে লাগছে গুহাটাকে।'

আমরা যখন ভিতরে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিলাম তখনও কিন্তু থাম তৈরির কাজ অলসভাবে চলছিল। ছাদ থেকে টিপ টিপ করে নানা জায়গায় জলের বিন্দু পড়বার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ছাদ থেকে কোনো কোনো জায়গায় দু'তিন মিনিট অন্তর

জলবিন্দু পড়ছিল, এই সময়ের ব্যবধানে যদি এক বিন্দু পানি পড়ে তাহলে দশ ফুট ব্যাস এবং আশি ফুট লম্বা একটা চুনের থাম তৈরি হতে কত সময় লাগবে তা একটা জটিল অংকের বিষয়। অর্ধ নির্মিত থামগুলো দেখলে মনে হবে যেন ওটার মাথায় একজন দেবতা বসে আছেন। ইজিপ্টের মমির মাথার দিকে ঠিক ঐ রকম একটা দেব-মূর্তি দেখা যায়। প্রকৃতির এই অমর কর্ম প্রক্রিয়াকে যে কোনো শিল্পী নিজের সৃষ্টি বলে চালিয়ে দিয়ে খ্যাতি লাভ করতে পারে। আমার তো মনে হল, অর্ধ সমাপ্ত তিন ফুট উঁচু একটা থাম তৈরি হতে কম পক্ষে তিন হাজার বছর লেগেছে। সেই হিসাবে এক ফুট উঁচু থাম তৈরি হতে লেগেছে এক হাজার বছর এবং প্রায় এক ইঞ্চি উচ্চতার জন্য লেগেছে এক শতাব্দী। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবার সময় আমরা একটা জলবিন্দু পড়বার শব্দ শুনলাম।

গুহার ছাদ থেকে চুইয়ে পড়া পানি যে সর্বদা একই জায়গার ওপর পড়ছে তা নয়। তাই যে থামটা তৈরি হচ্ছে তার তলদেশ খুব চওড়া হচ্ছে এবং নিচের অংশটা একটা বেদীর মতো লাগছে। এইরকম একটা বেদীর ওজন একশো টনের কাছাকাছি তো হবেই।

বড় হলঘরের ঠিক বাইরে আরো অনেক ছোট ছোট গুহা দেখলাম। তার মধ্যে দু'একটা বেশ বড় আকারের ছিল। প্রকৃতি নিজের খেয়ালে এক অপরিবর্তনীয় নিয়ম মেনে কত অসংখ্য শিল্পকলার কীর্তি সৃষ্টি করে চলেছে!

এই অনন্য সাধারণ গুহার সৌন্দর্য আরো খানিকটা সময় ধরে নিরীক্ষণ করবার ইচ্ছা আমাদের থাকলেও তা বুড়ি গাগুলের জন্য সম্ভবপর হল না কারণ তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতি কীভাবে চুনের থাম তৈরি করে তা দেখতে সে মোটেই আগ্রহী ছিল না। গুহার মধ্যে কীভাবে আলো ঢুকছে তা জানবার প্রগাঢ় কৌতূহল আমার হচ্ছিল। আলো নিয়ে আসবার ব্যবস্থাটা কি মানুষের হাতের তৈরি, না প্রকৃতির, তা না জানলে আমার স্বস্তি হচ্ছিল না।

ঐ গুহাটা অতীতে কেউ ব্যবহার করত কিনা তা জানতে আমার খুব আগ্রহ থাকলেও গাগুলের অনাগ্রহের জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হল। ঠিক করলাম, ফিরবার পথে এখানে আরো কিছুটা সময় কাটিয়ে যাব।

পথ প্রদর্শক গাগুলকে অনুসরণ করে বিশাল ও নিস্তব্ধ হলঘরের ওপর যেতেই আরেকটা দরজা দেখতে পেলাম। এই দরজাটা আগের হলঘরের দরজার মতো বাঁকানো নয়। বলা চলে, চতুর্ভজ আকৃতির; ইজিপ্টের মন্দিরে প্রায়শই এই ধরনের দরজা দেখা যায়।

আমাদের অস্বস্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে গাগুল প্রশ্ন করল, 'কী, সাহেবরা কী ভাবছ? ভিতরে যাওয়ার ইচ্ছা বজায় আছে তো এখনও?'

ক্যাপ্টেন গুড নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, 'চল, রাস্তা দেখিয়ে আমাদের নিয়ে চল।' তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা ভাব যেন সে মোটেই ভয় পায়নি। ক্যাপ্টেন গুড যখন ভীত নয় তখন ফৌলাটাও নয়। একসাথে ভিতরে যাবে বলে সে ক্যাপ্টেন গুডের হাতে হাত রাখল।

স্যার হেনরি আমার উদ্দেশে জোর গলায় বলল, 'কোয়ার্টারমেইন, তুমি সামনে থেকে সকলকে নিয়ে চল। ঐ বুড়িকে আর অহেতুক আটকে রেখো না।' স্যার

হেনরির আমন্ত্রণ যে আমার মোটেই ভাল লাগল না তা অবশ্য আমি আর মুখে প্রকাশ করলাম না।

ঠক্ ঠক্ করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বুড়ি গাগুল এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝেই বিনা কারণে সে হা হা করে হাসছিল। অজানা ভয়ে আমি অবশ্য বেশ ভীত হয়েছিলাম।

ক্যাপ্টেন গুড আমাকে বলল, 'বন্ধু পা চালাও, না হলে আমাদের পথ প্রদর্শককে হারিয়ে ফেলবে।'

কিছু দূর যাওয়ার পর আমরা একটা অন্ধকার হল ঘরে পৌঁছলাম। সেটা ছিল লম্বায় চল্লিশ ফুট, প্রস্থে তিরিশ ফুট এবং উচ্চতায় তিরিশ ফুট। দেখেই মনে হল, অতীতে পাহাড় কেটে মানুষ এই গুহাটা তৈরি করেছে। চুনা পাথরের গুহার ভিতর আলো ছিল কিন্তু এখানে তা নেই। অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেলে দেখলাম, হলঘরটা যতখানি লম্বা তত বড় একটা পাথরের টেবিল রাখা আছে। টেবিলের মাথার দিকে একটা বড় সাদা মূর্তি বসানো আছে এবং মানুষের আকৃতির সমান বেশ কয়েকটা সাদা মূর্তি তার চারিদিকে রাখা আছে। টেবিলের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটা বাদামি রংয়ের বস্তু রাখা আছে। এইসব দেখে আমি তো ঐ স্থান পরিত্যাগ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

চট করে ভেঙে পড়বার মতো লোক আমি নই এবং আমার মধ্যে কোনো কুসংস্কারও নেই। অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে কোনো যুক্তি নেই বলে আমি তা গ্রাহ্য করি না। তবে এই হলঘরের দৃশ্যে আমি যেন বোধ বুদ্ধি হারিয়ে ফেললাম এবং স্যার হেনরি জোর করে আমার জামাটা ধরে না ফেললে আমি নিশ্চয়ই ওখান থেকে পালিয়ে যেতাম এবং কিমবার্লির সমস্ত হিরা পাবার সম্ভাবনা থাকলেও এখানে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করতাম না। পরের মুহূর্তে তার দৃষ্টি পড়ল ঐ দৃশ্যের ওপর। সে আমার জামা ছেড়ে দিয়ে নিজের কপালের ঘাম মুছতে শুরু করল। ক্যাপ্টেন গুড কী যেন বলল তা অবশ্য বুঝতে পারলাম না। ফৌলাটা ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল এবং ক্যাপ্টেন গুডের গলা জড়িয়ে ধরল।

একমাত্র গাগুল বেশ জোরে হেসে উঠল এবং বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাসতেই থাকল।

টেবিলের মাথার দিকে যে মূর্তিটা ছিল সেটা ছিল মৃত্যুর। সেটাকে মূর্তি না বলে কংকাল বলাই ভাল, তার হাতে ছিল একটা সাদা বর্শা। এই কংকালটা ছিল পনেরো ফুটের চেয়েও বেশি লম্বা। নিজের মাথার ওপর সে বর্শাটা তুলে ধরেছিল যেন কাউকে এখুনি তাক করে সেটা ছুড়ে মারবে। তার একটা শীর্ণ হাত টেবিলের ওপর এমনভাবে রাখা ছিল যেন কংকালটা উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। তার চকচকে মাথাটা আমাদের দিকে ঝুঁকে ছিল এবং চোখের শীতল দৃষ্টি আমাদের ওপর নিবদ্ধ ছিল। তার ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে ছিল যেন সে কিছু বলতে চায়।

ভগ্নস্বরে আমি জানতে চাইলাম, 'ওটা কী হতে পারে?'

অন্যান্য মূর্তিগুলোকে নির্দেশ করে ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'ওগুলোই বা কী?'

টেবিলের ওপর রাখা বাদামি বস্তুটার দিকে ইঙ্গিত করে স্যার হেনরি আমার মতোই কৌতূহল প্রকাশ করল।

আমাদের কথা গাগুলের কানে গেলে সে বেশ মজা পেয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'মৃত্যুপুরী! মৃত্যুপুরীতে পা রাখবে, আবার অমঙ্গলের হাত থেকেও বাঁচবে তা কি হয়? হা, হা।'

বুড়ি গাগুল হঠাৎ স্যার হেনরির জামার একটা প্রান্ত চেপে ধরে বলল, 'কী মহাবীর, যুদ্ধে যাকে হত্যা করলে তাকে একবার দেখবে না?' বুড়ি গাগুল যে দিকে এগিয়ে গেল আমরাও সেদিকে চললাম।

টেবিলের ওপর রাখা বাদামি রঙের বস্তুটার কাছাকাছি যেতেই স্যার হেনরির মুখ থেকে একটা বিস্ময় সূচক শব্দ বের হল। কুকুয়ানাদের শেষ রাজা টোয়ালার নগ্ন মৃতদেহ টেবিলের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে আছে। যুদ্ধে স্যার হেনরি তার মাথাটা ধড় থেকে কেটে আলাদা করে দিয়েছিল। কাটা মুন্ডটা তার কোলে রাখা আছে। সবচেয়ে অপ্রীতিকর দৃশ্য হল টোয়ালার মুখ ও কাঁধের চামড়ার ওপর কেমন যেন একটা স্বচ্ছ পর্দা জড়ানো রয়েছে। ঠিক এই সময় টুপ শব্দ করে এক ফোঁটা পানি নিচে পড়তেই আমরা চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকালাম, এবার রহস্যটা উন্মোচিত হল। ছাদ থেকে চুইয়ে যে জলের ফোঁটা পড়ছে তাতে তো রয়েছে চুনামাটি। সেই পানি বিন্দু টোয়ালার মৃতদেহের ওপর পড়ে চুনের একটা আস্তরণ তৈরি করেছে। সেই কারণে তার দেহটা সাদা হয়ে গিয়েছে।

টেবিলের মাথায় এবং তার চারপাশে আমরা এতক্ষণ যে সাদা পাথরের মূর্তিগুলি দেখছিলাম তার রহস্যও এবার আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। ওগুলোও এক সময় মানবদেহ ছিল কিন্তু কালক্রমে তাদের ওপর চুনামাটির প্রলেপ পড়েছে। মৃতদেহগুলো প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় কুকুয়ানা সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের রাজাদের অমর করে রেখেছে। কী বিচিত্র এবং অভিনব প্রক্রিয়া!

বিগত রাজাদের মৃতদেহে চুমামাটির প্রলে পড়লেও খুব খুঁটিয়ে দেখলে তাদের শনাক্ত করা সম্ভব ছিল। এদের মধ্যে ইগনোসির বাবার মৃতদেহও ছিল। গুনে দেখলাম, মোট সাতাশটি রাজার মৃতদেহ সেখানে রাখা আছে। তবে টেবিলের মাথায় যে মূর্তিটি আছে সেটি স্বয়ং যমরাজের অর্থাৎ মৃত্যুর। যদি প্রতিটি রাজা গড়ে পনেরো বছর রাজত্ব করে থাকে তাহলে সাড়ে চারশো বছর আগের থেকে রাজাদের মৃতদেহ রাখা হয়ে আসছে। বলা বাহুল্য, সব রাজার মৃতদেহ যে এখানেই রাখা আছে তা হয়ত নয়। চার শতাব্দীতে দু'চারজন রাজা নিশ্চয়ই যুদ্ধ ক্ষেত্রেই মারা গিয়েছে।

টেবিলের মাথায় যমরাজের মূর্তি যে শিল্পী গড়েছিল সেই শিল্পীই বাইরের তিন 'মৌন মূর্তি'র নির্মাতা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে কারণ নির্মাণ শৈলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। যমরাজের মূর্তিটাও একটা বড় চুনামাটির থাম কেটে বানানো হয়েছে। শরীরবিদ্যাতে ক্যাপ্টেন গুডের খুব ভাল জ্ঞান ছিল। সে বলল, 'যমরাজের মূর্তিটা এতই নিখুঁত যে, মানবদেহে যতগুলি ছোট ছোট হাড় থাকে সেগুলি পর্যন্ত এই মূর্তিতে বসানো হয়েছে।'

এখন প্রশ্ন হল– রাজাদের মৃতদেহ এভাবে সংরক্ষণ করবার কারণ কী? প্রথমত, কুকুয়ানাদের রাজভক্তি। দ্বিতীয়ত, রাজারা স্বয়ং যদি কোথাও বসে থাকে তাদের টপকে ভিতরের রত্নাগারে যাওয়ার মতো মনের জোর কারই বা থাকতে পারে?

১৭
সলোমনের রত্নাগার

যে ভীতিপ্রদ দৃশ্য আমরা দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখছিলাম তার আবেশ থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করতে আমাদের যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়েছিল। এই সময়টা গাগুল অবশ্য অন্য ধরনের কাজ করছিল। যে টেবিলের ওপর টোয়ালার শবদেহ রাখা ছিল হামাগুড়ি দিয়ে তারই তলায় সে গিয়ে বসেছিল। আমরা যেমন পরিচিত লোক দেখলে তাকে সম্ভাষণ করি, গাগুল তেমনই চুনা মাটির প্রলেপ পড়া রাজাদের মৃতদেহের সাথে মাঝে মাঝে কথা বলছিল। অবশ্য নাকী সুরের জন্য তার একটা কথাও আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। একটা সময় সে মৃত্যুর দেবতা যমরাজের সাদা মূর্তির নিচে গিয়ে বসে পড়ল এবং নিজের ভাষায় প্রার্থনা করতে শুরু করল। তার কান্ড কারখানা দেখে আমাদের আর এক মুহূর্তও সেখানে থাকতে ইচ্ছা করছিল না। তার কাছে গিয়ে নিচু গলায় বললাম, 'গাগুল, এবার চলো, রাজার রত্নাগারটা দেখিয়ে দাও।'

আমার কথা শুনে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এত সব দেখেও তোমাদের ভয় করছে না?'

তার উদ্বেগের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে রত্নাগার দেখাতে আমি তার ওপর চাপ দিলাম। যমরাজের মূর্তির পিছন দিকে চলে গিয়ে সে আমাকে কাছে ডাকল। কাছে যেতেই সে খুব নিচু গলায় বলল, 'প্রদীপটা জ্বেলে নাও, ঘরের ভিতরে যাওয়ার দরজাটা দেখতে পাবে।' তার হাতে যে তেলের পাত্রটা ছিল সেটা আমাকে দিতেই খানিকটা তেল আমি প্রদীপের ভিতর ঢেলে দিলাম। আমার কাছে রাখা দেশলাই এর মধ্যে দুচারটা কাঠিই কেবল ছিল। তারই সাহায্যে প্রদীপটা জ্বালিয়ে রত্নাগারের প্রবেশ পথ খুঁজবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম, সেখানে কোনো প্রকারের দরজা চোখে পড়ল না। চোখের সামনে যা ছিল, তা হল, নিরেট পাথরের একটা দেওয়াল। আমি বোকা বনে গিয়েছি দেখে গাগুল জোরে জোরে হেসে বলল, 'ওটাই তো রাস্তা প্রভু, হা-হা!'

গম্ভীরভাবে বললাম, 'আমার সাথে মজা করলে ফল খুব খারাপ হবে, সাবধান!'

নিরেট দেওয়ালটাকে পুনরায় নির্দেশ করে বুড়ি গাগুল বলল, 'হ্যাঁ মশাই, ওটাই তো দরজা।'

কথা বলতে বলতেই দেখলাম নিরেট দেওয়ালের একটা অংশ ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠে গেল। ওপরের দেওয়ালে ঐ দরজার জন্য একটা শূন্যস্থান ছিল। দরজার আকৃতি বেশ বড়– দশ ফুট উচু এবং পাঁচ ফুট মোটা। দরজার ওজন কমপক্ষে বিশ

কিংবা তিরিশ টন। কীভাবে এই ভারসাম্যের নীতি অতকাল পূর্বে কাজে লাগানো হয়েছিল তা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। বিজ্ঞানকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে গাগুল তা আমাদের বলল না। তবে এটা ঠিক যে কোনো একটা গুপ্তস্থানে একটা স্প্রিং রাখা ছিল। সেটাতে চাপ দিলেই দৈত্যাকৃতি ঐ দরজা পালকের মতো ওপরে উঠতে থাকবে।

খুব ধীরে ধীরে দরজাটা ওপরের দিকে উঠতে লাগল এবং এক সময় সেটা আর দেখা গেল না। একটু আগে যেখানে নিরেট পাথরের দেওয়াল ছিল এখন সেখানে একটা অন্ধকার গুহার মুখ দেখা গেল।

স্বপ্নের গুহার দরজা খুলে যেতেই উত্তেজনায় আমার হাত পা ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। একবার মনে হল, গোটা বিষয়টা একটা প্রতারণা। পরক্ষণেই হোসে ডা সিলভেস্ট্রার কথা মনে পড়ল। তাহলে কি সে ঠিক কথাই বলেছিল? এই গুহাতে কি সত্যিই এত ঐশ্বর্য আছে যে আমি সারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি হতে পারি? যাই হোক না কেন, এক মিনিটের মধ্যেই সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।

প্রবেশ দ্বারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে গাগুল বলল, 'হে তারকালোকের শ্বেতকায় ব্যক্তিরা! চলো, ভিতরে চলো, তবে এই বৃদ্ধা ভৃত্যের কথাটা একবার ভাল করে শুনে নাও। এই গুহার ভিতরে যে উজ্জ্বল সাদা পাথরগুলি রাখা আছে সেগুলি তিন 'মৌন ত্রিমূর্তি'র আশে-পাশের মাটি খুঁড়ে খনি থেকে পাওয়া গিয়েছিল। ওখান থেকে তুলে এনে এই গুহাতে সেগুলি সঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। তবে কারা এই কাজ করেছিল তা আমার জানা নেই। সে সব বহুকাল পূর্বের ঘটনা, সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত কেবল মাত্র একবারই এই গুহাতে অন্য লোকজন প্রবেশ করেছে। কিন্তু তারাও বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারেনি। এই রত্নাগারের খবর এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মানুষ শুনেছে কিন্তু রত্নাগারের সঠিক অবস্থান অথবা এর প্রবেশ দ্বারের গোপন তথ্য কেউ জানতে পারেনি। কী জানি, কেমন করে এক শ্বেতকায় ব্যক্তি এই গুপ্তধনের খবর পেয়েছিল। সেও তোমাদের মতোই তারকাদের দেশ থেকে এখানে এসেছিল। এই দেশের রাজা তাকে বন্ধু হিসাবেই গ্রহণ করেছিল। ঐ তো সেই রাজা যে ওখানে বসে আছে।' কথাটা বলে গাগুল পাঁচ নম্বর মূর্তির দিকে ইঙ্গিত করল। গাগুল বলে চলল, 'কী করে যেন এই দেশের এক রমণী তাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসেছিল। হাজার বছরের সন্ধানেও এই দরজার খবর কেউ জানতে পারে না। কী করে যেন সেই নারী দরজা খুলবার গোপন তথ্য পেয়ে গিয়েছিল! মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিটি রত্নাগারে ঢুকে অনেক চকচকে পাথর একটা থলিতে ভরেও নিয়েছিল। মেয়েটির সাথে একটা ছাগলের চামড়ার তৈরি থলি ছিল যাতে করে সে খাবার এনেছিল। বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে একটা বিরাট বড় আকৃতির চকচকে সাদা পাথর শ্বেতকায় ব্যক্তির চোখে পড়লে সেটাকে সে আর ছেড়ে যেতে পারল না; হাত দিয়ে তুলে নিল সেই পাথরটা।'

নিশ্বাস বন্ধ করে আমরা বুড়ির কথা শুনছিলাম। দম নেবার জন্য সে একটু বেশি সময় থামলে আমি অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন কররাম, 'তারপর কী হল সিলভেস্ট্রার-র?' অপ্রত্যাশিতভাবে হোসে ডা সিলভেস্ট্রার নামটা শুনে বুড়ি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বহুকাল আগে মারা যাওয়া ঐ শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির নাম

তুমি জানলে কী করে?' অবশ্য তার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে সে বলেই চলল, 'তারপর হঠাৎ যে কী হয়ে গেল তার, সে কথা আমি বলতে পারব না। পাথর ভর্তি চামড়ার থলিটা মাটিতে ফেলে দিয়ে কেবল ঐ বড় পাথরটা হাতে নিয়েই সে ছুটে এই গুহা থেকে বেরিয়ে গেল। সেই বড় পাথরটা তো টোয়ালার কপালে বাঁধা থাকত। তুমিই তো সেদিন রাজার শরীর থেকে ওটা খুলে নিয়েছিলে যেদিন যুদ্ধ করতে গিয়ে সে মারা গিয়েছিল।'

আমি জানতে চাইলাম, 'তারপর থেকে অন্য কেউ কি এই গুহাতে পা রাখেনি?'

গাগুল বলল, 'না। এই দরজা খুলবার গোপন তথ্য সব রাজাই জানত। তারা এখানে এসে দরজাটা একবার খুলত কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করত না। আমাদের দেশে একটা কথা চালু আছে যদি কেউ এই গুহাতে প্রবেশ করে তাহলে এক পক্ষ কালের মধ্যে তাকে ইহলোক ছেড়ে যেতে হবে। ঐ শ্বেতকায় লোকটিও মারা গিয়েছিল। দূরের ঐ পাহাড়ের গুহায় যদি যাও তার শবদেহটা আজও দেখতে পাবে। আর সেই জন্যই তো আজ পর্যন্ত কোনো রাজাই এই রত্নাগারে প্রবেশ করবার মতো দুঃসাহস দেখায়নি। হা-হা। কী, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?'

আমরা একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়া-চায়ি করলাম। এসব কথা শুনে আমি একটু দমেও গেলাম। কিন্তু ঐ বুড়ি এত সব জানলো কী করে?

বুড়ি বলল, 'তোমরা থমকে গেলে কেন? চলো, ভিতরে চলো, আমার কথা যে কতখানি সত্য তা গুহার ভিতরে গিয়ে ছাগলের চামড়ার থলিটা দেখলেই বুঝতে পারবে। ঐ থলিতে এখনও চকচকে পাথরগুলো ভরা হয়েই আছে। এখানে ঢুকলে যে মরতেই হবে তা এক পক্ষকালের মধ্যেই টের পেয়ে যাবে। হা-হা।' প্রদীপটা হাতে নিয়ে বুড়ি ভিতরে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেও তাকে অনুসরণ করতে আমার মন সায় দিল না।

আমার দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখে ক্যাপ্টেন গুড মন্তব্য করল, 'যত্তোসব প্রতারকের দল! বুড়ি শয়তানীর কথায় কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি না।' কথাগুলো বলেই ভিতরে যাওয়ার জন্য সে পা বাড়াল। ক্যাপ্টেন গুড যদি ভিতরে যায় তাহলে তার সঙ্গী ফৌলাটা আর না গিয়ে পারে? গুপ্তধন খুঁজতে গিয়ে মানুষ মারা যাওয়ার খবর শুনে ফৌলাটার ভয়ই করছিল কিন্তু ক্যাপ্টেন গুডকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ক্যাপ্টেন গুড রত্নাগারে ঢুকলে ফৌলাটা সহ আমরা সকলেই তাকে অনুসরণ করলাম।

দরজা পার হলেই খুব সংকীর্ণ গলির মতো একটা রাস্তা। প্রথমে গুহার মুখ, তারপর পাহাড় কেটে সেই সরু রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। সরু অন্ধকার রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বুড়ি গাগুল থমকে দাঁড়াল। হাতের প্রদীপটা উঁচু করে তুলে ধরে সে আমাদের বলতে লাগল, 'এই গুপ্ত স্থানে ধনরত্ন সঞ্চিত রেখে লোকেরা এখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব পালিয়ে গিয়েছিল এবং প্রকৃত সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেনি। সময়ের অভাবে তারা ঐ ধরনের খিলান তৈরি করেছিল।' ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিশাল আকৃতির পাথর কেটে খিলান তৈরি করা আছে। বর্তমান কালে ব্যবহৃত হয় এমন চুন সুরকিও স্তূপাকারে রাখা আছে।

ফৌলাটা আর অগ্রসর হতে রাজি হল না। এই রাস্তায় আরো খানিক দূর গেলে সে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়বে বলে তার মনে হল। খাবারের ঝুড়ি নিয়ে ঐ অসমাপ্ত

দেওয়ালের পাশে বসে আমাদের ফিরে আসবার জন্য সে অপেক্ষা করতে মনস্থ করল।

সরু গলি ধরে পনেরো কদম দূরে যেতেই খুব সুন্দর কাজ করা রঙিন একটা কাঠের দরজা নজরে এল। দরজাটা একেবারে হাট করে খোলা ছিল। মনে হয়, আগে যে এসেছিল সে দরজাটা বন্ধ করবার সময় পায়নি কিংবা ভুলে গিয়েছিল।

এই দরজার চৌকাঠে পড়েছিল ছাগলের চামড়ার তৈরি একটা থলি। এক নজর দেখেই মনে হল, থলিতে নুড়ি ভর্তি করা আছে।

প্রদীপের আলো থলির ওপর পড়তেই গাগুল হেসে উঠে বলল, 'হি-হি। কি, শ্বেতকায় প্রভুরা, আমি তোমাদের আর এক শ্বেতকায় ব্যক্তির কাহিনী কি বলিনি যে চকচকে পাথর নিতে এসেছিল এবং তার সঙ্গিনীর থলিটা ফেলে রেখেই ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল? এই দেখ, সেই চামড়ার থলি।'

ক্যাপ্টেন গুড ঝুঁকে থলিটা মাটি থেকে তুলে নিল। থলির ভিতর পাথরের কড় কড় আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। সে বলল, 'মনে হয়, এর ভিতর হিরা আছে। ছাগলের চামড়ার একটা থলিতে এত অতুল ঐশ্বর্য! এ সে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।'

স্যার হেনরি বলল, 'কী হল, বুড়ি, একেবারে থেমে গেলে কেন? দাও, প্রদীপটা আমাকে দাও।' গাগুলের হাত থেকে প্রদীপটা নিয়ে সেটা তুলে ধরে স্যার হেনরি এগিয়ে যেতে লাগল। মাটিতে পড়ে থাকা হিরা ভর্তি থলির কথা ভুলে গিয়ে আমরা তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। সলোমনের রত্নাগারের কল্পনায় আমরা তখন বিভোর।

প্রদীপের স্বল্প আলোয় পাথর কেটে বানানো একটা ঘর চোখে পড়ল। দশ বর্গফুট আকৃতির হবে সেটা। তারপরেই চোখে পড়ল স্তূপীকৃত হাতির দাঁত। তার পরিমাণ কতটা হতে পারে তা আমরা অনুমান করতে পারছিলাম না। তবে যতটুকু দেখা যাচ্ছিল তাতে মনে হয় চারশো থেকে পাঁচশোর কম নয় ঐ গজদন্তের সংখ্যা। কেবলমাত্র এই গজদন্তগুলো পেলেই একটা মানুষ বিশাল ধনী হতে পারে। আমি অনুমান করলাম, এই ভান্ডার থেকে গজদন্ত নিয়ে রাজা সলোমন তাঁর সিংহাসন বানিয়ে ছিলেন। এইরকম সিংহাসন আর কোনো রাজ্যে ছিল না।

এই কক্ষের ঠিক বিপরীত দিকে লাল রঙের গোটা কুড়ি বাক্স ছিল। বারুদ রাখবার জন্য কি ওগুলো ব্যবহৃত হত?

একটু ভাল করে দেখে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'আলোটা আনো তো। মনে হয়, এগুলোর মধ্যেই হিরা রাখা আছে।' স্যার হেনরি আলোটা আনলে কাছে গিয়ে বাক্সগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম যে অত শুকনো জায়গায় রাখা সত্ত্বেও বাক্সের ডালাগুলো কেমন নরম হয়ে গিয়েছে। দু'একটার ডালা তো একেবারে ভাঙা, এমনও হতে পারে হোসে ডা সিলভেস্ট্রা নামের লোকটিই বহুদিন আগে হিরার সন্ধান পাবার জন্য ডালাগুলো ভেঙেছিল। বাক্সের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ভিতরের জিনিস বের করে এনে দেখলাম তার মধ্যে যা রয়েছে তা হিরা নয়, বড় বড় আকৃতির সোনার টুকরো। এইরকম বড় সোনার টুকরো ইতিপূর্বে আমরা কেউ দেখিনি। সেগুলোর ওপর হিব্রু ভাষায় কিছু খোদাই করা আছে।

স্বর্ণখন্ডটা রেখে দিয়ে আমি বললাম, 'আমাদের একেবারে খালি হাতে ফিরতে হবে না। এখানে সোনা ভর্তি আঠারোটা বাক্স আছে। মনে হয়, শ্রমিকদের মজুরি ও বণিকদের পণ্যের দাম মেটানো হত এই সোনা দিয়ে। ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'কিন্তু হিরাগুলো গেল কোথায়? বুড়ো পর্তুগীজটা সব হিরা নিয়ে পালিয়েছে নাকি?'

আমাদের কথা বার্তার মাঝেই গাগুল বলে উঠল, 'প্রভুরা কি সাদা পাথরের খোঁজ করছো নাকি? ঐখানে সবচেয়ে অন্ধকার কোণে গিয়ে দেখো না একটিবার। ওখানে তিন তিনটা পেটি রাখা আছে, তার মধ্যে দুটো তালা দেওয়া আর একটা খোলা অবস্থায় আছে।'

গাগুলের কথা অনুবাদ করে স্যার হেনরিকে বলবার আগেই আমি গাগুলের কাছে জানতে চাইলাম এত সব তথ্য সে সংগ্রহ করল কীভাবে যদি সেই শ্বেতকায় ব্যক্তির প্রবেশের পরে এই গুহাতে কেউ প্রবেশ না করে থাকে।

বুড়ি জবাব দিল, 'হ্যাঁ, কয়েক প্রজন্ম পার হয়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু রাতের প্রহরী তো আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। তারকাদের দেশ থেকে এলেও তোমরা কিন্তু জানো না এই দুনিয়ায় এমন চোখও আছে যা পাথরের ভিতর দিয়েও দেখতে পায়। হা-হা।'

গাগুল যে দিকে নির্দেশ করেছিল সেই অন্ধকার কোণের দিকে স্যার হেনরির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সে চিৎকার করে উঠল, 'আরে এখানে এসে দেখে যাও, এখানে একটা বড় কুলুঙ্গি রয়েছে।'

তার কাছে গিয়ে দেখলাম একটা বড় কুলুঙ্গি। ছোট জানলার আকৃতির সমান সেটা। কুলুঙ্গির নিচে দেওয়াল ঘেঁষে সত্যি সত্যিই তিনটি পেটি রাখা আছে। তাদের ডালাগুলো পাথরের তৈরি, পেটি তিনটার মধ্যে একটার মুখ খোলা, অন্য দুটোর ডালা বন্ধ।

মুখ খোলা পেটির ভিতরটা দেখবার জন্য হাতের প্রদীপটা সে তুলে ধরল। আমরা উঁকি মেরে দেখলাম ভিতরে রূপালি আভার কিছু জিনিস আছে। আমি তো আর দেরি না করে বাক্সের ভিতর থেকে সাদা বস্তুর কয়েকটা বের করে আনলাম। ওগুলো হিরাই ছিল তবে পালিশ করা নয়। হিরাগুলো বেশ বেশ বড় বড় আকৃতির।

হিরাগুলো আবার বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়ে আমি মন্তব্য করলাম, 'আমরা তো এখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হতে চলেছি।'

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'এখন আমরা হিরা দিয়ে বাজার ভরিয়ে দেব। আমাদের ভান্ডার অফুরন্ত।'

স্যার হেনরি বলল, 'আরো ভাল মানের হিরা এখানে পাওয়া যাবে, এগিয়ে চলো।'

এখন বিহ্বল দৃষ্টিতে আমরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছি। আমাদের মাঝখানে একটা প্রদীপ আর হাতের নিচে রাশি রাশি হিরা। এই সময় যদি আমাদের কেউ দেখে তো ধরেই নেবে আমরা একটা ডাকাতের দল। ভাগ্যবান বলে আমাদের কেউ মনে করবে না।

আমাদের মানসিক অবস্থা দেখে বুড়ি গাগুল তো হেসেই আকুল। সে বলতে লাগল, ' সাহেবরা, দেখো, দেখো, কত সাদা সাদা চকচকে পাথর তোমাদের

খুব ভাল লাগে এইসব পাথর, তাই না? যত খুশি নিয়ে নাও, ওদের গায়ে হাত বোলাও, ওগুলো পেটের মধ্যে পুরে নাও, ওগুলো জলের মতো গিলে নাও। হা-হা-হা।'

হিরা ভক্ষণ করবার, হিরা পান করবার কথা শুনে আমার এত মজা লাগল যে, আমি অট্টহাসিতে ফেটে পড়লাম। আমার দেখাদেখি অন্যরাও কেন জানি না, খুব জোরে জোরে হাসতে লাগল। এই আনন্দের উৎস কী? রাশি রাশি হিরা আমাদের হাতে এসেছে বলে? হাজার হাজার বছর আগে কষ্ট করে মাটি খুঁড়ে এই গুহাতে যে হিরা সঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল তা পাবার আনন্দে? রাজা সলোমন এই ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারেননি, ডেভিড পারেনি, হোসে ডা সিলভেস্ট্রা পারেনি, এই ধরিত্রীর আর কেউ পারেনি। এখন আমাদের সামনে পড়ে আছে অফুরন্ত হিরা, সোনা ও গজদন্তের ভান্ডার। তাহলে আমাদের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠবে না কেন?

হাসি থামলে গাগুল বলল, 'হে সাহেবরা! এবার এইসব পেটিগুলো খুলে ফেল, তোমাদের যা মন চায় তাই নিয়ে নাও। হা-হা, যা মন চায় তাই নাও।'

এবার বাক্সের তালা ভাঙবার জন্য চেষ্টা করতেই অধর্মাচরণের গ্লানিতে আমাদের মন ভারি হয়ে গেল। তবুও আমরা পেটিগুলোর ডালা খুলে ফেললাম। আরে, এই পেটিটা যে একেবারে কানায় কানায় ভর্তি! দ্বিতীয় পেটিও তাই! বেচারা সিলভেস্ট্রা ছাগলের চামড়ার থলি নিয়ে এসেছিল ঠিকই কিন্তু এই দুটো পেটির মাল এতটুকুও সরাতে পারেনি। তৃতীয় পেটির ভাঙা ডালাটা সরাতেই চোখে পড়ল তার বারো আনা ভাগ খালি। পেটির মধ্যে পড়ে থাকা হিরাগুলো আলোর দিকে তুলে ধরতেই দেখতে পেলাম সেগুলো একটু হলুদ রঙের, এই ধরনের হিরা কিমবার্লিতে পাওয়া যায়। সেখানে এদের 'সাদাটে হিরা' বলে। হিরাগুলোর আকৃতি ছিল পায়রার ডিমের মতো।

হিরা দেখতে আমরা এত মগ্ন ছিলাম যে বুড়ি শয়তানটা কখন যে নিশব্দে সাপের মতো ঐ রত্নাগার থেকে পালিয়ে গিয়েছে তা আমাদের কারো খেয়ালই হয়নি।

* * * * * *

অদূরে কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'বাঁচাও, বাঁচাও!' আরে এ যে ফৌলাটার কণ্ঠস্বর! কী হল তার?

আবার তার গলা শোনা গেল, 'বাঁচাও! বুড়ি যে আমাকে মেরে ফেলল।'

প্রদীপ থেকে যেটুকু আলো পাওয়া যাচ্ছিল সেই আলোতে পথ খুঁজতে খুঁজতে আমরা ছুটে বাইরে বের হবার চেষ্টা করলাম। আর একটা দৃশ্য দেখে আমরা ভয়ে আঁতকে উঠলাম, বিরাট ভারি পাথরের দরজাটা ধীরে ধীরে নেমে আসছে; এখন মেঝে থেকে মাত্র তিন ফুট উঁচুতে আছে। তারই পাশে গাগুল আর ফৌলাটা পরস্পরের সাথে লড়াই করে যাচ্ছে। বন্য বিড়ালের মতো গাগুল মেয়েটাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করছে আর ফৌলাটা তাকে জাপটে ধরে আছে। ফৌলাটার সারা শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কোনোক্রমে গাগুলকে দূরে ছুড়ে দিল মেয়েটা। মেঝেতে পড়তেই সরীসৃপের মতো গাগুলের দেহটা একবার মোচড় দিয়ে উঠল। ওদিকে ততক্ষণে পাথরের দরজাটা তার ওপর নেমে এসেছে। তিরিশ টনের দরজাটা গাগুলের শরীরের ওপর পড়তেই মড়মড় শব্দ করে তার দেহের সব হাড়গুলো ভেঙ্গে

গেল। একটা হৃদয় বিদারক চিৎকার করে গাগুল চিরতরে নিশ্চুপ হয়ে গেল। পুরো ঘটনাটা ঘটতে মাত্র চার সেকেন্ড সময় লাগল।

এবার আমরা ভাল করে ফৌলাটাকে দেখলাম। বুড়িটা তাকে এমনভাবে ছুরি দিয়ে কুপিয়েছে যে, আর বেশিক্ষণ বাঁচবে বলে আমাদের মনে হল না।

ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটা কোনোরকমে বলতে পারল, 'রত্নাগার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে গাগুল বেরিয়ে এসেছিল। দরজাটা নেমে আসছে দেখে আমি যেই না তাকে জাপটে ধরেছি অমনি সে আমাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছিল। আমার সময় হয়ে এসেছে। আমাকে এবার বিদায় দাও।'

কিন্তু ফৌলাটাকে কীভাবে আমরা সারিয়ে তুলতে পারব? এই অসহায় অবস্থায় চোখের পানি ফেলা ছাড়া ক্যাপ্টেন গুডের আর কিছু করবার ছিল না।

ফৌলাটা আমাকে বলল, 'আমার হয়ে ক্যাপ্টেন গুডকে দুটো কথাই কেবল বলে দিও যে আমি তাকে ভালোবাসি। সূর্য যেমন অন্ধকারের পাশে থাকে না, শ্বেতাঙ্গরা তেমনই কৃষ্ণাঙ্গদের থেকে দূরেই থাকে। আমি বেঁচে থাকলে তার সমস্যা বাড়ত।'

'প্রথম যেদিন তাকে দেখেছিলাম সেদিনই আমার মনে হয়েছে আমার বুকের ভিতর যে পাখিটা আছে সেটা একদিন উড়ে গিয়ে অন্যত্র গান গাইবে। আমার হাত দুটো এত ভারি হয়ে গিয়েছে যে আমি ওঠাতে পারছি না, আমার মাথাটা কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমি কিছু অনুভব করতে পারছি না। তবে আমার হৃদয়ে এত ভালোবাসা আছে যে হাজার বছর বাঁচলেও মনটা তরুণ থাকত। ক্যাপ্টেন গুডকে বলো, আমি আবার জন্মাব; হয়ত তারকাদের দেশেই তার সাথে আমার দেখা হবে। আমি তাকে বিশ্ব চরাচরে খুঁজে বেড়াব। জানি না, তখনও আমাদের মিলন হবে কিনা– সে যদি শ্বেতাঙ্গ হয় আর আমি আবার কৃষ্ণাঙ্গ! যাক, ওসব কথা, বাদ দাও, শুধু তাকে বলে দিও– আমি তাকে ভালোবাসি।'

ক্যাপ্টেন গুড কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ফৌলাটার শরীরে আর প্রাণ নেই।'

স্যার হেনরি বলল, 'এখন এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই।'

ক্যাপ্টেন গুড জানতে চাইল, 'এরকম নিষ্ঠুর কথা তুমি বলতে পারলে!'

স্যার হেনরি বলল, 'তুমিও খুব শীঘ্রই তার কাছে চলে যাবে। দেখছো না, আমরা কী অবস্থায় আছি। আমরাও যে পাথরের স্তূপে চাপা পড়ে আছি।'

এতক্ষণ আমরা ফৌলাটাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বলে নিজেদের দুরবস্থা নিয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পাইনি। পাথরের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এখান থেকে বের হবার রাস্তা যে দেখাতে পারত সেই বুড়ি গাগুলও মৃত। তাহলে উপায়!

একদিকে ফৌলাটার মৃতদেহ, অন্যদিকে রুদ্ধ পাষাণের দরজা। আমাদের সাহস, শক্তি, পৌরুষত্ব সব কিছুই আমাদের ছেড়ে চলে গেল। এখন ধীর ও নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের নিয়ে মজা করবে বলে বুড়ি গাগুল আমাদের মরণ ফাঁদের মধ্যে টেনে এনেছিল। আমরা শেষ হয়ে গেলে তার ভারি আনন্দ হত। অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও পিপাসায়, ক্ষুধায় আমরা মরে যাই তাই সে চেয়েছিল। খানিক আগে বুড়ি আমাদের বলেছিল

চকচকে পাথরগুলো পেটের মধ্যে পুরে নাও, জলের মতো গিলে নাও। তার বলা কথাগুলোর প্রকৃত অর্থ এবার বোধগম্য হল। ঐসব বলে সে আমাদের প্রচেষ্টাকে উপহাস করেছিল। অতীতে হোসে ডা সিলভেস্ট্রা যখন ছাগলের চামড়ার থলিতে রত্ন ভরে নিয়েছিল তখনও কেউ তার সাথে এমনই নির্দয় আচরণ করেছিল সন্দেহ নেই।

স্যার হেনরি বলল, 'এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। প্রদীপটা একটু পরেই নিভে যাবে। তার মধ্যেই এই দরজা ওঠানোর স্প্রিং আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে আমরা কাজে নামলাম। নিরেট দেওয়ালের গায়ে কোনো স্প্রিং বা হাতল পাওয়া যায় কিনা তা বের করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুই লাভ হল না।

স্যার হেনরি বলল, 'গাগুলের শেষ পরিণতি যা হয়েছে আমাদেরও তাই হবে। দরজাটাকে আমরা কিছুতেই নাড়াতে পারব না। তার চেয়ে চলো, ঐ রত্নাগারেই ফিরে যাই।'

ফেরার পথে আমাদের চোখে পড়ল ফৌলাটার নিয়ে আসা খাবারের ঝুড়িটা। সেটা উঠিয়ে নিয়ে আমরা আবার অভিশপ্ত রত্নাগারের দিকে চললাম। কত ভালোবেসে মেয়েটা আমাদের জন্য খাবার এনেছিল! পরম আদরে ফৌলাটার মৃতদেহকে উঠিয়ে এনে রত্নভর্তি পেটিগুলোর পাশে শুইয়ে দিলাম। রাশি রাশি সোনা ও হিরা ভরা পেটি তিনটার গায়ে ঠেস দিয়ে আমরা মেঝেতে বসে পড়লাম।

স্যার হেনরি বলল, 'যে খাবার আছে তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও। যতটুকু সময় বেঁচে আছি কিছু তো খেতে হবেই।' হিসাব করে দেখলাম, খুব অল্প করে খেলে আমরা মাত্র চার বার খেতে পারব। খাবারের ঝুড়িতে একটা পাত্রে কিছুটা পানিও রাখা ছিল।

জল ও খাবার থাকলেও আমরা এত দুশ্চিন্তায় ছিলাম যে খেতে আমাদের মন চাইছিল না। সকলে মিলে বেরিয়ে যাওয়ার জাদুকাঠিটা খুঁজতে লাগলাম। মেঝে কিংবা দেওয়ালে কোনো ফাঁপা জায়গা পাওয়া যায় কিনা তাই আবিষ্কার করবার চেষ্টায় আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

কিন্তু যে কক্ষে অতুল ঐশ্বর্য রাখা আছে তার মেঝে কিংবা দেওয়ালে কোনো ফাঁক ফোকর থাকবে তা আশা করা অনুচিত।

ওদিকে প্রদীপের আলো ম্লান হয়ে আসতে লাগল। তার মানে, তেল শেষ হয়ে আসছে। স্যার হেনরি জানতে চাইল আমার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে। আমি উত্তর দিলাম 'ছ'টা বাজে।' তার অর্থ হল, আমরা এখানে সাত ঘণ্টা রয়েছি। সকাল এগারোটায় এখানে ঢুকেছিলাম। আমি বললাম, 'আজ রাতের মধ্যে যদি এখান থেকে বের হতে না পারি, কাল সকালে ইনফাদুস আমাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে।'

স্যার হেনরি বলল, 'তার বেরিয়ে পড়াই সার হবে। সে এই দরজার কথাও জানে না, এর গুপ্ত রহস্যও জানে না। গতকাল পর্যন্ত কেবল একজন লোক এর খবর রাখত– তার নাম গাগুল। আজ কোনো জীবিত লোকই এই দরজা খুলবার কৌশল জানে না।

ইনফাদুস যদি দরজাটা খুঁজেও পায়, এটাকে সে ভাঙতে পারবে না। কুকুয়ানাদের পুরো একটা সৈন্য বাহিনীও এটাকে ভাঙতে পারবে না। এখন সবই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছা। গুপ্ত ধনের খোঁজে বহু মানুষ মারা গিয়েছে, আমরা তাদের সংখ্যাটা কেবল বাড়াব।'

প্রদীপের আলো ক্রমে কমে আসতে লাগল। এক সময় দপ করে সেটা জ্বলে উঠল। প্রদীপের আলোয় সাদা গজদন্তের স্তূপ, সোনা ভরা বাক্স, হিরা ভর্তি ছাগলের চামড়ার থলি, কিছু অমার্জিত হীরক খণ্ড, ফৌলাটার শব এবং তিনজন শ্বেতকায় ব্যক্তির অনাহারী মুখমণ্ডল পরিষ্কারভাবে দেখা গেল।

এরপর প্রদীপটা নিভে গেল। এখন চারিদিকে অন্ধকার, কেবল অন্ধকার।

১৮
আশা মরীচিকা

সম্ভাব্য পরিণতির কথা আমাদের মনে যে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা শক্ত। তবে সুখের বিষয় হল, আমরা কিছুটা সময়ের জন্য হলেও ঘুমাতে পেরেছিলাম। একে বলা চলে, প্রকৃতির করুণা। অন্যেরা ঘুমালেও আমি কিন্তু অতি অল্প সময়ের জন্য চোখ বন্ধ করেছিলাম। যে বিপর্যয়ের মধ্যে আছি তা অত্যন্ত ভয়াবহ হলেও ঐ রত্নাগারের নিস্তব্ধতা আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। বিনিদ্র রজনীতে নিস্তব্ধতাকে মানুষ ভয় করে কিন্তু এই কারাগারের নিস্তব্ধতাকে যেন স্পর্শ করা যায়। সে যেন আমার বুকে উঠে গলা চেপে ধরল। পৃথিবীর বুকে সর্বদাই কিছু শব্দ বা গতি আছে। তার ফলে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা খানিকটা ধার হারিয়ে ফেলে। আর এখানে আমরা তো বরফ-ঢাকা পাহাড়ের গর্ভে এক নির্জন গুহায় নির্বাসিত। কয়েক হাজার ফুট উচ্চতায় বায়ুর গতি প্রবল হলেও আমরা তা শুনতে পাচ্ছি না। একটা বিরাট সুড়ঙ্গ বাইরের পৃথিবী থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, যে ঘরে মৃত মানুষের দেহগুলি রাখা আছে সেখান থেকেও আমরা দূরে। পাথরের একটা মোটা দরজা নির্বাক মৃতদের সাথেও আমাদের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর সব কামান যদি একসাথে গর্জে ওঠে সেই শব্দও আমাদের কানে আসবে না। মুহুর্মুহ বজ্রপাত হলেও তার ধ্বনি কিংবা প্রতিধ্বনি আমাদের কানে ঢুকবে না। জীবিত থাকলেও প্রকৃত অর্থে আমরা মৃত।

পরিস্থিতির কী বিদ্রূপ! যে ধনরাশির মধ্যে আমরা শুয়েছিলাম তা দিয়ে একটা দেশের জাতীয় ঋত পরিশোধ করা যায় আর আমরা কিনা ঐ বিপুল ঐশ্বর্যের বিনিময়ে ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য একটা উন্মুক্ত দরজা চাইছি! আর একটু পরে কী চাইব? সামান্য খাদ্যদ্রব্য ও একটুখানি পানি পাবার জন্য আমরা এই ঐশ্বর্য হস্তান্তর করতে পিছপা হব না। যাকে আমরা ধনরত্ন বলে মাথায় তুলে রাখি, তার মূল্য কতটুকু?

কয়েক ঘণ্টা বাদে স্যার হেনরির গলা শুনতে পেলাম। সে জানতে চাইল আমার কাছে যে দেশলাই বাক্স আছে তাতে ক'টা কাঠি আছে। আমি জানালাম, 'আটটা।' হেনরি বলল, 'একটা কাঠি জ্বালো তো, ঘড়ি দেখতে হবে।'

গাঢ় অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে একটা দেশলাই কাঠির আগুন যেন আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। সকাল পাঁচটা বেজে গিয়েছে। তাহলে তো আমাদের মাথার ওপরে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় সাদা বরফের ওপর সূর্য তার সোনালি প্রদীপখানি জ্বেলে দিয়েছে!

আমি বললাম, 'একটু খেয়ে নিলে শরীরে জোর পাওয়া যাবে।'

ক্যাপ্টেন গুড হতাশার সুরে বলল, 'শরীরে জোর পেয়ে কী রাজ্যলাভটা করবে? তার চেয়ে যত তাড়াতাড়ি মৃত্যু আসে তত তাড়াতাড়ি আমাদের দুশ্চিন্তার অবসান ঘটে।'

স্যার হেনরি বলল, 'না, না, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।'

একটু খাবার ও এক চুমুক পানি খাওয়া হল। খানিকটা সময় কাটল। স্যার হেনরি বলল, 'চলো, দরজার কাছে দাঁড়ালে যদি বাইরের কারো সাথে যোগাযোগ হয়ে যায় তো মন্দ কী?' ক্যাপ্টেন গুড বহুদিন সমুদ্রের বুকে কাটিয়েছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সে দরজার কাছে গিয়ে কয়েকবার বিকট চিৎকার করল। কিন্তু বাইরের লোকের কাছে তা মশার গুঞ্জন ছাড়া অন্য কিছুই নয়। বাইরের জগতের কোনো প্রাণী তা শুনতে পেল না।

চিৎকার করতে গিয়ে ক্যাপ্টেন গুডের গলা শুকিয়ে গিয়ে থাকবে। ফিরে এসে সে খানিকটা পানি খেল। চিৎকার করে লাভ কিছুই হল না, জলের খরচ বাড়ল মাত্র। তাই এই পন্থা পরিত্যাগ করতে হল।

মুল্যহীন হিরার বাক্সগুলোর পাশে একেবারে কর্মহীন হয়ে আমরা বসে থাকলাম। ভাগ্যের এই বিদ্রূপ সহ্য করতে না পেরে স্যার হেনরির কাঁধে মাথা রেখে আমি চোখের পানি ফেলতে লাগলাম। ওপাশে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন গুড হতাশার ভঙ্গিতে নিজেকেই গালিগালাজ করতে লাগল।

আমি ও স্যার হেনরি যখন প্রচণ্ড নিরাশায় ভুগছি তখনই দেখলাম ক্যাপ্টেন গুডের মনের জোর কতখানি। আমরা যেন ভয় পাওয়া দুটি শিশু আর সে হল আমাদের অভিভাবক। নানা ধরনের বিপদে পড়া মানুষের গল্প সে আমাদের শোনাতে লাগল এবং বিপদ থেকে কীভাবে তারা মুক্তি পেয়েছে সেই সব ঘটনার কথা বলে সে আমাদের সাহস জোগাতে লাগল। শেষে সে বলল, 'এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে ঈশ্বরের করুণাই একমাত্র ভরসা।'

ক্যাপ্টেন গুডের মতো সুন্দর, শান্ত অথচ সাহসী ব্যক্তি আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি।

কালকের রাত যেভাবে কেটেছিল আজকের দিনটাও এক সময় শেষ হল। একে দিন না বলে তিমির রাত্রি বলাই ভাল। ঘড়িতে সন্ধ্যা সাতটা বাজল।

খাবার ও এক চুমুক পানি খাবার পর আমার মনে হল এই বন্ধ ঘরের বাতাস তো পরিষ্কার। কী করে হয়!

আমার কথা শুনে ক্যাপ্টেন গুড বলে উঠল, 'আরে, তুমি তো দারুণ কথা বললে! পাথরের দরজা ভেদ করে তো আর হাওয়া ভিতরে আসতে পারে না। হাওয়া না এলে আমাদের তো দমবন্ধ হয়ে যেত অনেক আগেই। তাহলে ভিতরে বাতাস আসবার একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে। সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।' আকস্মিকভাবে এই চিন্তার উদয় হতেই আমরা যেন সজীব হয়ে উঠলাম। আমরা তিনজনেই হাতড়াতে শুরু করলাম। এক সময় আমার হাত একটা ঠাণ্ডা জিনিসের স্পর্শ পেল। আশা ভঙ্গ হল সঙ্গে সঙ্গে। শীতল বস্তুটা ছিল সেই ফুলের মতো কোমল কিশোরী ফৌলাটার মৃত মুখ।

এক ঘণ্টা ধরে আমরা তিনজন বাতাসের উৎস মুখ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করলাম। লাভ কিছুই হল না। গজদন্তের স্তূপ ও, মূল্যবান পাথরের পেটির সাথে কেবল আমাদের মাথা ঠুকে গেল বেশ কয়েকবার। ক্যাপ্টেন গুড কিন্তু দমবার পাত্র নয়। সে বলতে লাগল, 'হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে অর্থহীন কিছু কাজ করাও ভাল। তোমরা দুজনেই এখানে এসো।'

রাস্তা হাতড়ে আমরা দুজন তার কাছে পৌছালে সে আমার উদ্দেশে বলল, 'এই যে আমি যেখানে হাত রেখেছি সেই জায়গায় তোমার হাতটা রাখো তো। কিছু বুঝতে পারছো?'

আমি বললাম, 'বাতাস ঢুকছে বুঝতে পারছি।'

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই শব্দটা শোন তো এবার।' কথাটা বলেই মেঝেতে সে একটা জোর লাথি মারল। ভিতরটা যে ফাঁপা তা আর বলবার অপেক্ষা থাকল না। আমরা যেন একটা আশার আলো দেখতে পেলাম।

কাঁপা হাতে আমি একটা দেশলাই কাঠি জ্বালালাম। আর মাত্র তিনটা কাঠি বেঁচে আছে। দেশলাই কাঠির আলোতে দেখলাম ঘোরাঘুরি করতে করতে আমরা ঐ ঘরের একেবারে একটা কোণায় গিয়ে পৌছেছি। যেটুকু সময় দেশলাই কাঠিটা জ্বলছিল তার মধ্যেই আমরা পাথরের দেওয়ালে একটা জোড়া দেওয়া জায়গা এবং পাথরের বড় আকৃতির একটা আংটি দেখতে পেলাম। ওটা চোখে পড়তেই আমাদের মনে যে চাঞ্চল্য হল তাতে আমরা কেউ কথা বলতে পারছিলাম না। ক্যাপ্টেন গুডের কাছে একটা ছুরি ছিল। সেই ছুরির পিছন দিকে বাঁকানো পেরেকের মতো একটা লোহা আটকানো ছিল। ছুরির সাহায্যে পাথরের আংটির মুখটা পরিষ্কার করে নিয়ে সে আস্তে আস্তে ওটাতে চাপ দিতে লাগল। আংটিটা পাথরের বলেই রক্ষা! ওটাতে মরচে পড়েনি। আংটিটা একটু নড়তেই ক্যাপ্টেন গুড আঙ্গুল ঢুকিয়ে ওটাকে তুলে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু লাভ কিছুই হল না।

অধৈর্য হয়ে আমি বললাম, 'আমাকে একবার চেষ্টা করতে দাও তো দেখি। পাথরটার অবস্থান এমন ছিল যে একসাথে দুজন লোক সেটাকে সরাবার চেষ্টা করতেই পারবে না।

আমি অসফল হলে স্যার হেনরি চেষ্টা করল কিন্তু পাথর অনড় হয়েই থাকল।

ক্যাপ্টেন গুড ছুরি বের করে ফাটলের চারদিকটা আরো একটু পরিষ্কার করে পকেট থেকে একটা কালো শক্ত সিল্কের রুমাল বের করে এনে পাথরের ওপরের দিকে রাখা আংটির সাথে বেঁধে দিল। রুমালের অপর প্রান্তটা স্যার হেনরির কোমরের সাথে বেঁধে দিয়ে সে বলল, 'স্যার হেনরি এটাকে সামনের দিকে টানবে। আমরা দু'জন দুদিক থেকে পাথরে চাড় দেব। নাও, টানো।'

স্যার হেনরি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই দেখা গেল পাথরের মুখটা আলগা হয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক খোলা হাওয়া আমাদের মুখে ঝাপটা মারল। ওদিকে টাল সামলাতে না পেরে স্যার হেনরি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বোধ হয়, পেশি শক্তি এভাবে কোনো মানুষের প্রাণ রক্ষা করেনি।

ক্যাপ্টেন গুড আমাকে বলল, 'এবার একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাও তো, খুব সাবধানে জ্বালাবে কিন্তু।'

স্বল্প আলোতে যা দেখলাম তাতে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকল না। দেখলাম, ওখান থেকে একটা সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গিয়েছে।'

ক্যাপ্টেন গুড জানতে চাইল, 'এখন কী করা হবে?'

আমি বললাম, 'ঈশ্বরের ইচ্ছায় আস্থা রেখে সিঁড়ে ধরে নিচে নামা যাক, চলো।'

স্যার হেনরির পরামর্শ মতো যেটুকু পানি ও খাবার বেঁচে ছিল তা আমি সঙ্গে নিয়ে নিলাম। গত চব্বিশ ঘণ্টায় এখানকার হিরার প্রয়োজনীয়তার কথা আমাদের মনেই আসেনি। হিরার কথা মনে পড়তেই আমার গা গুলিয়ে উঠল। হিরার লোভেই তো আজ আমাদের এই অবস্থা! তবুও হিরা ভর্তি পেটিগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হল কয়েকটা হিরা পকেটে ভরে নিলে কেমন হয়! অন্য দুজনের উদ্দেশে আমি বললাম, 'আমি তো পকেট ভরে হিরা নিয়েছি। তোমরাও কয়েকটা করে নিলে পারো।'

স্যার হেনরি বলল, 'হিরার নিকুচি করি। ভগবান করুন আমাকে যেন আর হিরা দেখতে না হয় এজন্মে!'

ক্যাপ্টেন গুড কোনো উত্তর দিল না। যে মেয়েটি তাকে সত্যিকারের ভালোবেসেছিল তার মৃতদেহ এখানে রয়েছে। তাই এই স্থান চিরতরে ছেড়ে যাওয়ার সময় তার মন ভারি হয়ে উঠেছিল। বলতে দ্বিধা নেই, এখানে রাশি রাশি ধন রত্ন থাকলেও গত আঠাশ ঘণ্টায় আমাদের মনে কোনো আনন্দ বা আশা ছিল না। মৃত্যুকে আমরা চোখের সামনে নাচ করতে দেখেছি। তখন ঈশ্বরের কাছে আমরা একটাই প্রার্থনা করেছি যেন এই অন্ধকূপ থেকে বের হতে পারি। হয়ত আমার স্বভাবটাই এমন হয়ে গিয়েছিল যে মৃত্যুগহ্বরে থেকেও দৌলতের লোভ পরিত্যাগ করতে পারিনি।

সিঁড়ির একটা ধাপ নেমে স্যার হেনরি আমাকে বলল, 'কী হল, কোয়ার্টারমেইন, চলে এসো। আমি আগে আগে থাকছি, তুমি আমাকে অনুসরণ কর।'

আমি তাকে খুব সাবধানে পা ফেলতে বললাম। বলা যায় না, কোথাও হয়ত ফাঁপা জায়গা রয়েছে। সিঁড়ির সংখ্যা গুনতে গুনতে স্যার হেনরি এগিয়ে বলল। এক সময় 'পনেরো' পর্যন্ত গুনে সে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখবে এসো, এদিকে আবার একটা সরু সুড়ঙ্গ আছে।'

ক্যাপ্টেন গুড এগিয়ে গেল এবং আমি তার পিছনে পিছনে গেলাম। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট দেশলাই কাঠিগুলোর একটা জ্বেলে দেখলাম যে সুড়ঙ্গটা বাম এবং ডান উভয় দিকেই ভাগ হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি ভাল করে বুঝবার আগেই দেশলাই কাঠিটা পুড়ে শেষ হয়ে গেল এবং আমার আঙ্গুলটা জ্বলে গেল। এখন একটাই প্রশ্ন আমাদের সামনে বড় হয়ে দাঁড়ালো আমরা সুড়ঙ্গের কোন দিকে যাব? সুড়ঙ্গটা কেন তৈরি হয়েছিল, কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে তা আমরা জানি না। সুড়ঙ্গ ধরে এগিয়ে গেলে আমরা হয় মুক্তি পাব নতুবা ধ্বংস হয়ে যাব। ভাবতে ভাবতে দেশলাইয়ের আর একটা কাঠি আমি জ্বেলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাঁ দিক থেকে একটা দমকা বাতাস এসে কাঠিটা নিভিয়ে দিতেই ক্যাপ্টেন গুড বাঁ দিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিল।

তার কথা মতো হাত দিয়ে দেওয়াল হাতড়ে পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। পিছনে ফেলে রেখে এলাম মুখ খোলা রত্নের পেটি, একটা তৈলহীন শুকনো প্রদীপ ও ফৌলাটার প্রাণহীন দেহ।

অন্ধকারে প্রায় পনেরো মিনিট হাতড়ে হাতড়ে যাওয়ার পর আমাদের সরু রাস্তাটা বেঁকে গেল। আরেকটু এগিয়ে যাওয়ার পর রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেল। আবার একটু পর আর একটা রাস্তার সাথে গিয়ে মিশে গেল। এইভাবে আমরা পাথরের গোলক ধাঁধার মধ্যে বেশ কয়েক ঘণ্টা হাঁটলাম। পাহাড়ের অভ্যন্তর কেটে এই ধরনের রাস্তা বানানোর কারণ একটাই হতে পারে। এখানে কোথাও খনিজ পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল এবং তা তুলে আনবার জন্য এইসব সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছিল।

অবশেষে আমরা অবসন্ন হয়ে পড়লে বিশ্রাম নেবার জন্য এক জায়গায় বসে সঙ্গে থাকা পানি ও খাবার খেয়ে নিলাম। গলা তো পিপাসায় শুকিয়ে একেবার কাঠ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মনে হল, রত্নাগারে না মরে এই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে মারা যাওয়াটাই আমাদের কপালে লেখা আছে। নিরাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমি যেন একটা শব্দ শুনতে পেলাম যেটা বাইরে থেকে আসছিল। স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুডকে সে কথা বলতেই তারাও শুনবার চেষ্টা করল। খুব হালকা একটা শব্দ– জল বয়ে যাওয়ার শব্দ। এত দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর জলের কুলকুল শব্দ যেন আমাদের কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে হল।

ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'শব্দটা শুনে মনে হচ্ছে কাছাকাছি কোথাও পানি বয়ে চলেছে। আর একটু এগিয়ে দেখা যাক।'

আবার পাথরের দেওয়ালে হাত রেখে হাতড়াতে হাতড়াতে জলের শব্দকে লক্ষ্য করে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। যত এগোতে লাগলাম শব্দটা যেন ততই বাড়তে লাগল। অতিশয় নির্জন স্থানে হালকা একটু শব্দও কত বড় মনে হয়! এবার আমাদের আর সন্দেহ রইল না যে শব্দটা প্রবহমান জলধারার। কিন্তু পৃথিবীর গভীরতম প্রদেশে প্রবাহিনী আসবে কী করে? আমরা জলধারার কাছাকাছি এসে পড়লে ক্যাপ্টেন গুড আমাদের জানালো সে জলের গন্ধ পাচ্ছে।

জলধারার কাছাকাছি এসে পড়েছি বলেই স্যার হেনরি আমাদের সাবধানে পা ফেলতে বলল কিন্তু তার পূর্বেই ছপাৎ করে একটা শব্দ হল। ক্যাপ্টেন গুড পা পিঁছলে জলের মধ্যে পড়ে গিয়েছে।

বিপদ একটা ঘটেছে বুঝতে পেরে আমরা গুডের নাম ধরে চিৎকার করতে লাগলাম। একটু পরে সে উত্তর দিল, একটা বড় পাথরকে আমি আঁকড়ে ধরে আছি। দেশলাই জ্বালো, আমি তোমাদের দেখতে পাব।'

শেষ দেশলাই কাঠিটি জ্বালালাম। স্বল্প আভায় পায়ের তলায় বিশাল চওড়া এক পানি প্রবাহ দেখলাম কিন্তু সেই স্রোতস্মিনীর অপর প্রান্ত আমাদের চোখে পড়ল না। তবে খানিকটা দূরে একটা পাথরকে আঁকড়ে ক্যাপ্টেন গুডকে ঝুলে থাকতে দেখলাম। সে বলল, 'আমাকে টেনে তুলবার জন্য তোমরা তৈরি থাকো।' কথাটা বলেই ঝপাৎ করে জলে ঝাঁপ দিয়ে বহু কষ্টে আমাদের দিকে একটু এগিয়ে আসতেই স্যার হেনরি তাকে টেনে শুকনো জায়গায় তুলে নিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'ঐ পাথরটাই আমাকে বাঁচিয়ে দিলো! একটু সাঁতার জানতাম বলে টিকে গেলাম আজ! কী প্রচন্ড স্রোতের টান! আমি তো নদীর তল খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

একথা শুনবার পর ঐ গাঢ় অন্ধকারে নদীর পাড় ধরে হেঁটে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যে কোনো সময় আমরা জলে পড়ে যেতে পারি। হাতের সামনে পানি পেয়ে আমরা প্রাণভরে খেলাম সাথে হাত মুখও ধুয়ে নিলাম। কী সুস্বাদু পানি! ক্যাপ্টেন গুডের ভিজে যাওয়া জামা কাপড় থেকে টুপ টুপ করে পানি পড়তে লাগল। জলধারার পাড় ছেড়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে আমরা ডান দিকে মোড় নিলাম।

স্যার হেনরি বলল, 'আমাদের কাছে সব রাস্তাই সমান। চলতে চলতে এক সময় নিস্তেজ হয়ে পড়ে গেলে তবেই আমাদের পথ শেষ হবে।' এবার হেনরি আগে আর আমরা দুজন পিছন। কিছুদূর যাওয়ার পর সে থেমে গেল। আমরাও তার গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম। সে বলল, 'আমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? আলো দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে?'

চোখ বড় বড় করে আমরা দেখবার চেষ্টা করলাম। পর্ণ কুটিরের জানলা দিয়ে যেমন আলো আসে ঠিক সেই রকম আলো আসছে। আলো, আহা! কতদিন আমরা আলো দেখতে পাইনি! যা দেখেছি তা হল নিকষ কালো অন্ধকার।

এ যে আশার আলো, মুক্তির আলো। পাঁচ মিনিট পর আমাদের সব সন্দেহ দূরীভূত হল। আলোর সাথে সাথে খোলা হাওয়া এসে আমাদের সব ক্লান্তি দূর করে দিল। স্যার হেনরি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। সুড়ঙ্গের শেষ সীমায় বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য একটা গর্তের মুখ। মাথার ওপর এখন আর পাথরের ছাদ নেই; মুক্ত আকাশের তলায় পৃথিবীর মাটিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের মাথার ওপর তারা ভরা আকাশ আর শ্বাস নেবার জন্য বিশুদ্ধ বাতাস।

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে আমরা তিন জনেই গড়িয়ে গেলাম। ঘাস, ঝোপঝাড়, নরম মাটি ও কাদার ভিতর দিয়ে আমরা গড়িয়ে যেতে লাগলাম।

হাতের কাছে কিছু একটা শক্ত জিনিস পেয়ে আমি তো আঁকড়ে ধরলাম। এখন আমি আর গড়িয়ে পড়ছিলাম না। স্যার হেনরি একটা সমতল জায়গায় পড়েছিল। আমার ডাকে সে সাড়া দিল কিন্তু ক্যাপ্টেন গুড কোথায়? একটু পরে তাকেও পাওয়া গেল। একটা বড় গাছের শিকড়ে সে আটকে গিয়েছিল।

ঘাসে ঢাকা একটা জমির ওপর আমরা তিনজন বসলাম। আমাদের জীবন রক্ষা হয়েছে দেখে আমরা আনন্দে কেঁদে ফেললাম। পাহাড়ের ঐ গুহা, ঐ অন্তহীন সুড়ঙ্গেই তো আমাদের চির নিদ্রায় শুয়ে থাকবার কথা। কোনো অপার্থিব শক্তির করুণায় আমরা সুড়ঙ্গের বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। ঐ তো এখন অমানিশা শেষ হয়ে আসছে, পুব দিকটা গোলাপি হয়ে উঠছে।

সূর্যের আলোয় পাহাড়ের কোল আলোকিত হয়ে উঠতে লাগল। এবার বুঝতে পারলাম আমরা ঐ ত্রিমূর্তির কাছেই বসে আছি। তার মানে, হিরার খনিতে ঢুকবার যে গুহা আছে তার প্রবেশ পথ এই মূর্তির তলায়। শুধু একটা জিনিস মাথায় ঢুকল না, তা হল, ঐ পাতালে যে নদী বয়ে চলেছে সেটার উৎস কোথায়, শেষ কোথায়। মুক্তির আনন্দে ঐ নিয়ে ভেবে আর মনকে ভারাক্রান্ত করতে ইচ্ছা করল না আমার।

সূর্যের আলো আরো বাড়তে লাগল। এখন আমরা নিজেদের খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। কী বীভৎস চেহারা হয়েছে আমাদের! চোখ গর্তে বসে গিয়েছে, সারা শরীরে কাদা বালি মাখা, হাত পা ছড়ে গিয়েছে, কোনো কোনো জায়গা থেকে আবার রক্তও বের হচ্ছে। আমাদের এই কুৎসিত কদাকার চেহারা দেখে দিনের আলো আবার ভয় না পেয়ে যায়! তবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ক্যাপ্টেন গুডের এক কাচ বিশিষ্ট চশমাটি কিন্তু তার চোখেই লাগানো আছে। এত বিপর্যয়ের মধ্যে সে বোধ হয় একবারের জন্যও তার চশমাটি খোলেনি। কী অন্ধকার, কী পাতালপুরীর নদীতে পতন কিংবা সুড়ঙ্গের বাইরে কাদায় গড়াগড়ি কোনো কিছুই তার চশমা থেকে তাকে আলাদা করতে পারেনি।

ঐখানে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকলে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাংস পেশিগুলো আর নমনীয় থাকবে না ভেবে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। পাহাড়ের গায়ে জন্মে থাকা ঝোপ, গাছের শিকড় ও ডাল ধরে বহু কষ্টে আমরা পাহাড়ের ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম।

কিছুটা উঠে আসবার পর রাস্তার পাশে কয়েকটা বাড়ি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে দেখে আমরা সেদিকে গেলাম। আগুনের ধারে বেশ কিছু মানুষ বসেছিল। একটা মানুষ ওখান থেকে উঠে আমাদের দিকে খানিকটা এগিয়ে এল বটে কিন্তু ভয় পেয়ে চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। আমরা অবশ্য তাকে চিনতে পেরে বললাম, 'ইনফাদুস, তুমি ভয় পেয়ে গেলে কেন? আমরা তো তোমার বন্ধু।'

আমাদের কথা শুনে সে আবার উঠে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আমাদের দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, 'প্রভুরা, আপনারা! মৃত্যুর দেশ থেকে ফিরে এলেন!'

বৃদ্ধ ইনফাদুস আমাদের সামনে মাটিতে বসে পড়ল এবং স্যার হেনরির হাঁটু জড়িয়ে ধরে আনন্দে কাঁদতে লাগল।

১৯
ইগনোসির বিদায়

সলোমনের রত্নাগার থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার পর দশ দিন কেটে গিয়েছে। আমরা তিনজন এবার লু লোকালয়ে ফিরে এসেছি। গত এক পক্ষ কালের মধ্যে আমাদের অনেক শারীরিক পরিবর্তন ঘটেছে; আমার মাথার বেশ কিছু চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। ফৌলাটার মৃত্যু ক্যাপ্টেন গুডকে মানসিকভাবে বেশ বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আমি অবশ্য ফৌলাটার মৃত্যুকে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয়েছে, ফৌলাটা বেঁচে থাকলে কিছু জটিল সমস্যা তৈরি হত। মেয়েটা এইরকম অনগ্রসর অঞ্চলের হলেও তার একটা বিশেষ সৌন্দর্য ছিল এবং একটা উন্নত ধরনের রুচি ছিল। তা সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন গুডের সাথে মিলন হলে তাদের জীবন সুখের হত না। মেয়েটা নিজেই একদিন মন্তব্য করেছিল, 'সূর্য যেমন অন্ধকারের পাশে থাকে না, শ্বেতাঙ্গরা তেমনই কৃষ্ণাঙ্গদের থেকে দূরেই থাকে।'

বলা বাহল্য, রত্নভরা প্রকোষ্ঠ থেকে আমরা সেই যে বেরিয়েছিলাম তারপর ওখানে আর ফিরে যাইনি। ওখান থেকে বের হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে, সুড়ঙ্গে হেঁটে, নদীর জলে ভিজে আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে আমরা ঐ পাহাড়ের বাইরে এসেছিলাম। তবে লু-তে চলে আসবার আগে 'মৃতদের কক্ষে, আরেকবার গিয়েছিলাম। সেখানে রাখা মৃতদেহগুলোর ওপর সাদা চুনামাটির প্রলেপ পড়ে কী রকম যেন অপার্থিব পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। ওখান থেকে একটু দূরেই পড়েছিল বুড়ি গাগুলের থেঁতলানো মৃতদেহটা। ঠাণ্ডা মাথায় ওখানে দাঁড়িয়ে থেকেও আমরা পাথরের ভারি দরজা খুলবার রহস্য বা চাবিকাঠির কোনো হদিশ পেলাম না। এক ঘণ্টা চেষ্টা করেও বিফল হলাম। আমার ধারণা, এই ধরনের দ্বিতীয় দরজা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

একটা কথা আমার বার বার মনে হচ্ছে যে, পাথরের দরজাটা আমাদের চোখের সামনেই ওপরে উঠেছিল। অতএব গাগুলের মৃতদেহটা যেখানে পড়েছিল তার আশে পাশে আমরা যদি পরবর্তীকালে খুঁজে দেখতাম তাহলে হয়ত দরজা ওঠানোর হাতলটা আবিষ্কার করতেও পারতাম। একবার হাতলের সন্ধান পেয়ে গেলে অফুরন্ত হিরার সন্ধানও পেতাম। পৃথিবীতে এমন কোনো ধন-ভাণ্ডার নেই যেখানে এত হিরা সাজিয়ে রাখা আছে। ডিনামাইট দিয়ে ঐ দরজা ফাটানো যেতে পারত কিন্তু আমাদের সাথে তো ঐ বিস্ফোরক পদার্থ ছিল না। তাই ও নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। তবে পেটি তিনটার মধ্যে রাখা অমূল্য সব হীরক খণ্ড চিরকাল অন্ধকারেই থেকে যাবে; কোনো সুন্দরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজে লাগবে না।

পরের দিন আমরা লু-তে ফিরে যাব ঠিক হয়েছে। এত ঘটনা-দুর্ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাতের কারণ কী ছিল? হিরা। কিন্তু হিরা তো নিজের জায়গাতেই থেকে গেল। প্রত্যাশিত ফল না পেলে মানুষের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উপায় ছিল না। তবে আমার কথা একটু স্বতন্ত্র। রত্নাগার থেকে– না, রত্ন-কারাগার থেকে বের হবার সময় আমি তো পকেট বোঝাই করে হিরার টুকরো নিয়েছিলাম। তবে কারাগার থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার পর যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিলাম তাতেই বেশ কয়েকটা হিরা হারিয়ে গিয়েছে। তবুও আঠারোটা হীরক খণ্ড আমি নিয়ে আসতে পেরেছি এবং এগুলোর ওজনও বেশ ভাল। হিরাগুলো আমরা তিনজনে ভাগ করে নিলেও সারাটা জীবন আমাদের বেশ ভালভাবে চলে যাবে।

লু পৌছালে ইগনোসি আন্তরিকভাবে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। এত বড় একটা যুদ্ধের পর নানা কাজের মধ্যে নিজের সৈন্য বাহিনীর পুনর্গঠন করা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে সে আমাদের অভিযানের বিবরণ শুনল। গাগুলের মৃত্যু সংবাদ শুনে সে একটু আনমনা হয়ে গেল।

অদূরে বসে থাকা অতি বৃদ্ধ একজন লোককে নিকটে ডেকে নিয়ে ইগনোসি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, তোমার তো বেশ বয়স হয়েছে, তাই না?'

বয়স্ক লোকটি উত্তর দিল, 'তা আর বলতে! তোমার বাবার বাবা আর আমি তো একই দিনে জন্মেছিলাম।'

– তুমি যখন খুব ছোট ছিলে, গাগুলকে দেখেছিলে?

– তা আবার দেখব না!

– গাগুল তখন কী রকম দেখতে ছিল? নিশ্চয়ই কম বয়সি?

– কী যে বল! গাগুলের চেহারা এখন যেমন আছে তখনও তেমনই ছিল। দাদুর মুখেও শুনেছি গাগুলের চেহারা তখনও একই রকম ছিল– কুৎসিত, শুকনো; লোকের ক্ষতি ও চিরকাল করে এসেছে।

– তুমি বোধ হয় জানো না, গাগুল আর বেঁচে নেই।

– দেশটা বাঁচলো, একটা অভিশাপ বিদায় নিয়েছে।

উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ইগনোসি বলল, 'ভাইসব তোমাদের একটা সুখবর দিই, ডাইনি গাগুল আর বেঁচে নেই। সে আমার বাবাকে হত্যা করিয়ে টোয়ালাকে সিংহাসনে বসিয়েছিল। তার পরিকল্পনা ছিল আমাদের শ্বেতাঙ্গ বন্ধুদের ঐ কারাগারের মধ্যে মেরে ফেলে এখানে চলে আসা। তারপর আমাকে হত্যা করা। এঁদের মুখ থেকেই গাগুলের ঘটনা তোমরা শোন।'

রত্নাগারের ঘটনা আগাগোড়া বলবার পর এই দেশ ছেড়ে আমাদের চলে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা ইগনোসিকে বললাম।

আমি বললাম, 'তোমাদের থেকে বিদায় নেবার সময় এসেছে। আমরা নিজেদের দেশে ফিরে যেতে চাই। দেখ, ইগনোসি, তুমি আমাদের কাছে এসেছিলে ভৃত্যের চাকরি করবার জন্য। আজ আমরা তোমাকে দেশের রাজা হিসাবে দেখে যাচ্ছি। এর জন্য তুমি যদি আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকো, তাহলে আমরা চাইব তোমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তুমি কাজ করবে। তুমি শপথ করেছিলে ন্যায় পরায়ণ থাকতে,

আইন মেনে চলতে এবং উপযুক্ত কারণ ছাড়া কাউকে মৃত্যুদণ্ড না দিতে। হে রাজা, তোমার উন্নতি হোক, তুমি সুখে রাজত্ব কর। আগামীকাল সকালে আমরা প্রস্থান করব। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তুমি আমাদের সাথে একজন লোক দিও।'

উত্তর দেওয়ার আগে ইগনোসি হাত দিয়ে নিজের মুখটা ঢেকে ফেলল।

অনেকক্ষণ সেইভাবে থেকে এক সময় সে বলল, 'তোমার কথা শুনে আমার বুকটা ফেটে গেল। বলতে পারো, আমি তোমাদের তিন জনের কী ক্ষতি করেছি যে আমাকে এভাবে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছো? বিদ্রোহের সময়, সংগ্রামের সময় তোমরা আমরা পাশে ছিলে আর বিজয়ের দিনে, শান্তির দিনে চলে যাবে! এই দেশ তো তোমাদের। যা চাই তাই নাও, যত জমি প্রয়োজন ততই নাও। তোমরা যে ধরনের বাড়িতে থাকতে অভ্যস্ত তা এখানে নেই ঠিকই তবে শিখিয়ে দিলে এখানকার লোকরা ঠিক সেই রকম বাড়ি বানিয়ে দিতে পারবে। শিকার করতে চাইলে তোমরা এই ভূখণ্ডের যে কোনো জায়গায় যেতে পারো। সংসারী হতে চাইলে যে কোনোদিন যাকে খুশি বিয়ে করতে পারো।'

ইগনোসিকে বললাম, 'না, এসব কোনো কিছুরই আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা এখন নিজেদের মাতৃভূমিতে ফিরতে চাই।'

হতাশার সুরে ইগনোসি বলল, 'আমার চেয়েও তোমরা ঐ চকচকে সাদা পাথরগুলোকে বেশি ভালোবাস, তাই না? কিছু পাথর তোমাদের হস্তগত হয়েছে। নাটাল শহরে গিয়ে ওগুলো বিক্রি করলে তোমরা বেশ ধনী হয়ে যাবে। শ্বেতকায় লোকরা তো ধনী হতেই চায়। ধিক, সাদা পাথরকে! ধিক, তার অনুসন্ধানকারীদের! ঐ মৃত্যুর দেশে যে পদার্পণ করবে সে যেন আর ফিরে না আসে! তোমরা কখন যাত্রা করবে বল, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

ইগনোসির কাঁধে হাত রেখে আমি বললাম, 'আচ্ছা বলো তো, তুমি যখন জুলুদের দেশে কিংবা নাটালে শ্বেতকায় ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে ঘুরে বেড়াতে তখন কি তোমার মায়ের মুখে শোনা তোমার জন্মভূমির জন্য মন খারাপ হত না? যে দেশে তুমি জন্মেছিলে, যে দেশের আলো, যে দেশের মানুষকে তুমি ভালোবেসেছিলে সেই দেশে ফিরে আসবার জন্য তোমার মন খারাপ করত না?'

ইগনোসি তা স্বীকার করলে আমাদের মনের ইচ্ছাটা যে খুবই স্বাভাবিক তাকে সে কথা বুঝিয়ে বললাম।

এবার তার কণ্ঠস্বরে অন্য ভাব ফুটে উঠল। সে বলল, 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। যে জিনিস উড়ে বেড়ায় তা মাটিতে ছুটে চলে না। শ্বেতকায় ব্যক্তিরা কৃষ্ণকায়দের স্তরে নেমে এসে বাঁচতে পারে না। ঠিক আছে, তোমরা যাও আমরা যেমন পরলোকের কোনো খবর পাই না, তোমরা চলে গেলে তোমাদের ভাল মন্দের কোনো সংবাদই আমাদের কাছে পৌঁছাবে না। এ বিদায় যে, চির বিদায়!'

সে বলেই চলল, 'তবে এটা বলে রাখছি, এই দেশে কোনো শ্বেতকায় ব্যক্তিকে আমি ঢুকতে দেব না। যদি একজন শ্বেতকায় ব্যক্তি আসে তাকে চলে যেতে বলব। যদি একশোজন আসে আমি বল প্রয়োগ করে তাদের বের করে দেব, যদি একটা সেনাদল আসে তাহলে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করব। সাদা

পাথরের খোঁজে কাউকে আমি পাহাড়ের ওদিকে যেতেই দেব না। আমি গুহার ভিতরের থামগুলো ভেঙে দিয়ে পাথর দিয়ে ঐ গুহা বুজিয়ে দেব, এমনভাবে রাস্তা কেটে দেব যাতে সলোমনের রত্নাগার কোথায় ছিল তা যেন কেউ জানতে না পারে। তবে তোমাদের তিনজনের কথা স্বতন্ত্র। তোমাদের জন্য এই দেশের সমস্ত পথ, সমস্ত গুহার মুখ সর্বদাই উন্মুক্ত থাকবে। নিশ্বাসের বায়ুর চেয়েও তোমরা আমার প্রিয়।

'তোমরা যদি চলে যাবেই ঠিক করে থাকো, তাহলে যাও। আমার কাকা ইনফাদুস ও ইনদুনা তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে এবং অন্য একটা পাহাড়ি পথ দেখিয়ে দেবে। আমি আজ আদেশ জারি করলাম যে তোমরা তিনজন 'হোনিপা' নামে আমাদের দেশে পরিচিত হবে এবং তোমাদের সম্মান দেখানোর জন্য এই দেশের লোক সব সময় প্রস্তুত থাকবে।

'মেয়েদের মতো আমার চোখ জলে ভরে ওঠবার আগেই তোমরা চলে যাও। ভবিষ্যতে তোমরা যখন বুড়ো হবে এবং একসাথে আগুনের ধারে বসে গল্প করবে তখন নিশ্চয়ই আমাদের কথা স্মরণ করো। কীভাবে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিলাম, যুদ্ধক্ষেত্রে কী বিশাল পরাক্রম তোমরা দেখিয়েছিলে এবং মহা শক্তিধর টোয়ালার মাথাটা তোমরা কীভাবে কেটে নিয়েছিলে তা নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করো। তোমাদের পরামর্শ ও পরিকল্পনা ছাড়া এই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না! তোমাদের বিদায় জানাই।'

ইগনোসি উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড আমাদের দিকে তাকালো তারপর চোখের পানি চাপার জন্য অন্যত্র চলে গেল।

নীরবে আমরা ওখান থেকে প্রস্থান করলাম। পরের দিন ভোরবেলা আমরা লু থেকে রওয়ানা হলাম। ইনফাদুস ও মহিষ বাহিনীর বহু সংখ্যক সেনা আমাদের সঙ্গী হল। রাস্তার দুধারে কাতারে কাতারে মানুষ দাঁড়িয়েছিল। তারা আমাদের বিদায় অভিবাদন জানাচ্ছিল। দেশটাকে টোয়ালার হাত থেকে মুক্ত করবার জন্য মহিলারা আমাদের আশীর্বাদ করছিল। তারা আমাদের মাথায় ফুলও ছড়াচ্ছিল। তাদের আন্তরিকতায় আমরা অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম। আদিবাসী সম্প্রদায় যে এভাবে বিদায় সংবধনা দিতে পারে তা আমাদের জানা ছিল না।

প্রস্থানের পথে এমন একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল যা উল্লেখ না করে আমি থাকতে পারছি না। ঘটনার কথা মনে পড়লে হাসতে হাসতে আমার দম বন্ধ হয়ে যায়। আমরা যখন লোকালয়ের শেষ সীমানায় পৌঁছেছি ঠিক তখনই এক সুন্দরী যুবতী খুব সুন্দর কয়েকটা সাদা ফুল নিয়ে এসে ক্যাপ্টেন গুডের সামনে দাঁড়ালো। মনে হল, সে যেন কিছু বলতে চায়। ক্যাপ্টেন গুড তাকে মনের কথা বলতে উৎসাহিত করলে মেয়েটি বলল : প্রভু যদি তার শ্বেতশুভ্র পা দুখানি আমাকে দেখান তাহলে ঐ ছবি আমি চিরদিন মনের পটে এঁকে রাখব এবং পরবর্তীকালে আমার সন্তানদেরও এই ঘটনার কথা বলব। আপনার পায়ের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমি চার দিন হেঁটে আজ এখানে এসেছি। ক্যাপ্টেন গুড প্রথমে রাজি হয়নি; কোনো মহিলাকে প্রকাশ্যে অনাবৃত পা দেখানো রুচিহীন কাজ। পরে অবশ্য

স্যার হেনরির অনুরোধে সে রাজি হয়েছিল। গোড়ালি থেকে প্যান্ট তুলে হাঁটু পর্যন্ত এনে সে তার পদ যুগলের নিম্নভাগ প্রদর্শন করেছিল। তার পা দেখে ঐ যুবতীসহ উপস্থিত অন্যান্য রমণীরা আনন্দধ্বনি করেছিল দীর্ঘক্ষণ ধরে। তবে দর্শকদের খুশি রাখবার জন্য ক্যাপ্টেন গুডকে এভাবেই আরো বেশ কিছুটা পথ হাঁটতে হয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার পদ যুগলের জন্য ক্যাপ্টেন গুড অন্য কোনোখানে এত প্রশংসা অর্জন করেনি।

রাস্তায় যেতে যেতে ইনফাদুস বলল সলোমনের রাজপথ নামে যে বিখ্যাত রাস্তাটা আছে তার উত্তর দিকে বেশ কিছুদূর গেলে একটা গিরিবর্ত্ম পড়বে যার একদিকে কুকুয়ানাদের দেশ এবং অন্যদিকে মরুভূমি। বছর দুয়েক আগে উটপাখির পালকের জন্য বেশ কয়েকজন সৈন্য মরু অঞ্চলে চলে গিয়েছিল। কুকুয়ানা সৈন্যদের মাথায় এই পাখির পালক গোঁজা হয় বলে এর বেশ চাহিদা আছে। মরু অঞ্চলে সৈন্যরা যখন তৃষ্ণায় কাতর তখন তারা দূরে সবুজ গাছের সারি দেখতে পায় এবং কয়েক মাইল বিস্তৃত এক মরুদ্যানের সন্ধান পায়। ঐ মরুদ্যানে সুপেয় জলের উৎসও পেয়েছিল তারা। যে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে মরুদ্যান পাওয়া যাবে সেইখানে এসে ইনফাদুস বিদায় নেবে ঠিক হল।

নির্বিঘ্নে পথ চলতে চলতে যাত্রার চতুর্থ দিন রাতের বেলায় আমরা এক পাহাড়ের চূড়ায় এসে পৌছলাম। এই পাহাড়টা কুকুয়ানাদের দেশকে ঢেউভরা মরুভূমি থেকে পৃথক করেছে। এই বালুরাশি উত্তরে পঁচিশ মাইল গিয়ে সেই পাহাড়ের পাদদেশে শেষ হয়েছে যার একটা শৃঙ্গের নাম 'শেবার স্তন।'

পরের দিন সকালে আমাদের এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল যার পাশেই রয়েছে অন্ধকার এক খাদ, মনে হল, এই খাদের গভীরতা দু'হাজার ফুটেরও অধিক। নিচের সমভূমিতে পৌছাতে হলে ঐ খাদের গা বেয়েই আমাদের নামতে হবে।

এইখানে এসে ইনফাদুস থামল। বিদায় বেলায় সে আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারছিল না। সখেদে সে বলল, 'আমার বয়স হয়েছে। তোমাদের মতো মানুষ আমি হয়ত আর দেখতেও পাব না, তবে তোমাদের বীরত্ব, কৃতিত্ব ও শৌর্যের ছবি আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখব।'

ইনফাদুস আর আমাদের সঙ্গে যাবে না ভাবতেই মন খারাপ হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন গুড বোধ হয় সবচেয়ে বেশি দুঃখিত হয়েছিল। সে ঠিক করল ইনফাদুসকে একটা স্মৃতিচিহ্ন উপহার দেবে। ব্যাগ খুলে একটা চশমা বের করে সেটাকেই উপহার হিসাবে ইনফাদুসের হাতে তুলে দিল। পরে জেনেছিলাম, ওটা তার দ্বিতীয় চশমা যা আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য তার ব্যাগে রাখা থাকে। চশমা পেয়ে তার কী আনন্দ! এই উপহার প্রাপ্তি কী কম গৌরবের! সারা দেশবাসীকে সে এই কাহিনী শোনাবে। কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর চশমাটা ইনফাদুস নিজের চোখে লাগাতে সক্ষম হল। মাথায় উটপাখির পালক গোঁজা, গায়ে চিতা বাঘের চামড়ার পোশাক থাকলে কি চোখে চশমা মানায়!

যে সব শিকারিরা আমাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে যাবে তাদের থলিতে পর্যাপ্ত পানি ও খাদ্য দ্রব্য আছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ইনফাদুস আমাদের সাথে হাত মেলালো এবং অন্য সৈনিকরা আমাদের অভিবাদন জানালো। এরপর আমরা পাহাড়ের নিচের

দিকে নামতে শুরু করলাম। অবতরণ খুব পরিশ্রম সাধ্য হলেও সন্ধ্যার মুখোমুখি নিরাপদে আমরা নেমে এলাম।

রাত্রি নেমে এলে আগুনের ধারে বসে গল্প করতে করতে স্যার হেনরি বলল, 'কুকুয়ানাদের দেশের থেকেও খারাপ দেশ আরো আছে এবং গত দুমাসের চেয়েও খারাপ সময় আমার জীবনে এসেছে। সময়টা খারাপ হলেও বৈচিত্র্য ছিল। তোমরা কী বলো?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্যাপ্টেন গুড বলল, 'এটা বলতে পারি, কুকুয়ানাদের দেশে ফিরে গেলে আমার খারাপ লাগবে না।'

নিজের মনের কথা বলি। আমি মনে করি, যার শেষ ভাল, তার সব ভাল তবে কুকুয়ানাদের দেশে এসে যে বিপদে পড়েছিলাম সে একেবারে নজির বিহীন। এইরকম অভিজ্ঞতা পূর্বে কখনো হয়নি, যুদ্ধের কথা মনে পড়লে আমার হাত পা কাঁপতে থাকে আর রত্নাগারের কথা চিন্তা করলে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়।

পরের দিন পাঁচজন পথ প্রদর্শকের সহায়তায় আমরা মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার লক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আজ আর দিগন্ত বিস্তৃত বালুরাশিকে ভয় পেলাম না কারণ আমাদের সাথে পিপাসা নিবারণের জন্য প্রচুর পরিমাণে পানি আছে। দিন শেষে আমরা খোলা আকাশের নিচে বিশ্রাম নিতে বসলাম। আগামীকাল সকালেই তো আবার বেরিয়ে পড়তে হবে!

তৃতীয় দিন দুপুরে আমরা মরুদ্যানের বৃক্ষরাজি দেখতে পেলাম যার কথা আমরা আগেই জেনেছি। সূর্যাস্তের ঘণ্টা খানেক পর প্রবহমান জলধারার মধুর সঙ্গীত শুনতে শুনতে সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর আমরা পায়চারি করতে লাগলাম।

২০
পুনরাবির্ভাব

রত্নাগারের অনুসন্ধান আমাদের কাছে এক অবিস্মরণীয় অভিযান হয়েই থাকবে। কিন্তু আরো বড় এক বিস্ময়কর ঘটনা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

মরুদ্যান থেকে যে জলধারাটা বের হয়েছিল খানিকটা দূরে গিয়ে সেটা আবার বালির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। ঐ জলধারার তীরে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পায়চারি করছিলাম হঠাৎ আমার চোখে পড়ল কুড়ি গজ দূরে একটা বড় গাছের তলায় একটা কুঁড়েঘর রয়েছে। ঘরের মুখটা নদীর দিকে, ঘরের মাথাটা শুকনো লম্বা ঘাস দিয়ে ছাওয়া কিন্তু দরজাটা বেশ বড় আকৃতির। এদেশের লোকরা সাধারণত খুব ছোট দরজা লাগায় বলেই বাড়িটা দেখে আমার কৌতূহল হল।

এটা কার বাড়ি হতে পারে? কেন লোকটা এইরকম জনশূন্য স্থান বেছে নিয়ে বাড়ি করতে গেল? এইসব নানা প্রশ্ন যখন আমার মনে উদয় হচ্ছে তখনই দরজা খুলে একটা লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে কুটির থেকে বেরিয়ে এল। লোকটার পরণে ছিল পশু চামড়ার পোশাক। তার গালভর্তি কালো দাড়ি এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল তার গাত্রবর্ণ। তার গায়ের রং সাহেবদের মতো সাদা। প্রথমটায় মনে হল সারাদিন আমার চোখে প্রখর সূর্যের আলো পড়েছে বলে ভুল দেখছি। লোকটা যদি শিকারের উদ্দেশ্যেই এসে থাকে তাহলেও সে পাকাপাকিভাবে এখানে ঘর বেঁধে বাস করবে না। অবাক হয়ে আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে লোকটাও অপলক দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুড সেই জায়গায় এসে উপস্থিত হল।

কুঁড়েঘরের ঐ লোকটাকে দেখিয়ে আমি বললাম, 'ঐ লোকটা কি সত্যিকারের একজন সাহেব, না আমি ভুল দেখছি? স্যার হেনরি ও ক্যাপ্টেন গুড দুজনেই খুব ভাল করে তাকে যখন নিরীক্ষণ করছিল লোকটা তখন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আমাদের দিকে ছুটে আসতে শুরু করল এবং কাছাকাছি এসে প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে বালির ওপর পড়ে গেল।

তাকে তুলে ধরবার জন্য স্যার হেনরিও ছুটে এল এবং লোকটাকে ভাল করে দেখা মাত্রই চিৎকার করে বলল, 'আরে, এ যে আমার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ভাই, জর্জ!'

হৈ চৈ শুনে কুটির থেকে আর একটা লোক বেরিয়ে এল। তার হাতে ছিল একটা বন্দুক। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমাকে দেখেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'প্রভু, আমাকে চিনতে পারছেন না, বস? আমি শিকারি জিম, আমার মালিককে দেওয়ার

জন্য আপনি একটা চিঠি লিখে আমার হাতে দিয়েছিলেন, মনে পড়ে? সেই চিঠিটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। বিগত দু'বছর ধরে আমি এখানে বাস করছি।'

ইতিমধ্যে কালো দাড়িওয়ালা লোকটার মানে, স্যার হেনরির ভাইয়ের জ্ঞান ফিরে এসেছে। তারা দু'জনে কোনো কথা না বলে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অতীত দিনের বিবাদের কারণ বোধ হয় দুজনেই বিস্মৃত হয়েছিল।

স্যার হেনরি এক সময় মুখ খুলল, 'আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম তুই আর এই পৃথিবীতে নেই। কত জায়গায় না আমি তোকে খুঁজেছি! শেষে আমি সলোমন পর্বতেও গিয়েছিলাম। আর তুই কিনা বুড়ো শকুনির মতো এই মরুভূমিতে পড়ে আছিস!'

দীর্ঘকাল নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে অনভ্যস্ত লোকের ভঙ্গিতে জর্জ বলল, 'বছর দুয়েক আগে আমিও সলোমন পর্বতে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করেছিলাম কিন্তু পায়ের ওপর একটা পাথর পড়ে আমাকে একেবারে অকেজো করে দিয়েছে।'

তাদের কাছে এসে আমি জর্জকে বললাম, 'আমাকে চিনতে পারছো? কেমন আছো তুমি ভাই?'

আমার কথা শুনে জর্জ বলল, 'আরে আমার মাথা ঘুরছে মনে হচ্ছে, তুমি কোয়ার্টারমেইন না? পৃথিবীটা কী বিচিত্র জায়গা! যখন সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম তখন সব আশাই পূর্ণ হল! আজ আমি সত্যিকারের সুখী!'

ঐ দিন সন্ধ্যায় আগুনের ধারে বসে জর্জ কার্টিস তার জীবনের ঘটনাবহুল কাহিনী শোনাতে লাগল। সেই সব কাহিনীর সাথে আমাদের জীবনের বর্ণময় কাহিনীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বছর দুয়েক আগে সিতান্দা গ্রাম থেকে সলোমন পর্বতের উদ্দেশে সে রওয়ানা দেয়। এই সময় শিকারি জিমের হাত দিয়ে আমি তাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম। অবশ্য জিম সেই চিঠি হারিয়ে ফেলেছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা তাকে সেই পাহাড়ি রাস্তা ধরতে বলেছিল যেটাতে ধাপে ধাপে সিঁড়ি কাটা আছে। এই পাহাড়ি রাস্তা ধরেই তো আমরা এই মরুদ্যানে গতকাল পৌছেছি। হোসে ডা সিলভেস্ট্রার ডায়েরিতে এই রাস্তার উল্লেখ নেই। মরুভূমিতে জর্জ ও শিকারি জিমের দুভোর্গের সীমা ছিল না। বহু কষ্টে তারা এই মরুদ্যানে পৌছেছে। যেদিন তারা এখানে পৌছেছিল সেদিন শিকারি জিম একটা মৌচাক দেখতে পেয়ে মধু সংগ্রহের জন্য এগিয়ে যায়। এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে মরুভূমির বিশেষ এক প্রজাতির মৌমাছির হুল নেই। জিম যেখানে মধু সংগ্রহের জন্য উঠেছিল ঠিক তার তলায় নদীর ধারে বসেছিল জর্জ। মধু সংগ্রহের সময় হঠাৎ জিমের পা পিছলে যায় এবং বড় একটা পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে এসে জর্জের পায়ে পড়ে। এরপর থেকে তার হাঁটবার শক্তিটুকুও হারিয়ে যায়। তখনই সে ঠিক করে নেয় এই মরুদ্যানে থেকেই সে দেহত্যাগ করবে।

রাতের বেলায় অনেক পশু মরুদ্যানে পানি খেতে আসে। জর্জের কাছে বন্দুক ও প্রচুর পরিমাণে গুলি থাকায় শিকার জুটে যেত খুব সহজে। পশুর মাংসই ছিল তার খাদ্য এবং তাদের চামড়া দিয়ে সে পোশাকও বানিয়ে নিত।

জর্জ কার্টিস বলল, 'রবিনসন ক্রুশোর মতো আমরা দুটি বছর এখানে কাটিয়েছি। আমাকে দ্বিতীয় ক্রুশো বলা যায়। তবে তার সাথী হিসাবে ফ্রাইডে নামের একটা লোক এসেছিল কিন্তু আমার কপালে তা জোটেনি। গত কাল রাত্রেই জিমকে বলেছিলাম ও যেন সিতান্দা যায় এবং কোনো লোকের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে

আসবার ব্যবস্থা করে। আগামীকাল ওর যাওয়ার কথা। তবে এটাও ঠিক ও একবার চলে গেলে ফিরে আসবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আমি ধরেই নিয়েছিলাম তুমি বেশ আরামে ইংল্যান্ডে বাস করছো। তোমাকে যে মরুভূমির মাঝে দেখতে পাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এই ঘটনা আমার কাছে যেমন বিস্ময়কর তেমনই কল্যাণকর।'

গভীর রাত্রি পর্যন্ত আমরা গল্প করলাম, কথাবার্তার একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল আমাদের অভিযানের কথা। এক সময় পকেট থেকে কয়েকটা হিরা তাকে দেখালে সে বলল, 'তোমরা যা কষ্ট করেছো তার বিনিময়ে কিছুটা তো পেয়েছো। তবে এই অভিযানের জন্য তোমরা আমার মতো একটা অকেজো লোককেও পেয়েছো।'

স্যার হেনরি হেসে বলল, 'অভিযানের পূর্ব শর্ত অনুযায়ী যা কিছু উপরি পাওয়া যাবে, তার মালিক হবে কোয়ার্টারমেইন ও ক্যাপ্টেন গুড।'

ক্যাপ্টেন গুড ও আমি আলোচনা করে ঠিক করলাম আমাদের সাথে যে হিরাগুলো আছে তা তিনভাগে ভাগ করে একটা অংশ স্যার হেনরিকে দেওয়া হবে। সে নিতে রাজি না হলে ঐ ভাগটা তার ভাইকে দেওয়া হবে। জর্জ কার্টিস আমাদের চেয়েও বেশি কষ্ট করেছে কিন্তু পায়নি কিছুই। আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্যার হেনরি এক ভাগ হিরা নিতে রাজি হল। জর্জ কার্টিস বহুদিন পরে আমাদের পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছিল।

* * * * * *

এখানেই আমার কাহিনী শেষ করব। জর্জ কার্টিসের ডান পা খুব মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিল। বহু কষ্টে আমরা তাকে নিয়ে মরুভূমি অতিক্রম করে সিতান্দাতে পৌছে ছিলাম। পৌছানোর ছয় মাস পরে ওখানে গচ্ছিত করে রাখা আমাদের গুলি ও বন্দুকগুলো ফেরত পেয়েছিলাম। তবে যে স্থানীয় অধিবাসীর কাছে ওগুলো রেখে গিয়েছিলাম সে কিন্তু আমাদের প্রত্যাবর্তনে খুব একটা খুশি হয়নি।

পুনশ্চ : লেখা শেষ করে দেখলাম স্থানীয় একটা লোক ডাকঘর থেকে আমার নামে লেখা একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। চিঠিটা স্যার হেনরির লেখা এবং চিঠির বক্তব্য নিচে হুবহু তুলে ধরছি :

১ অক্টোবর ১৮৮৪
ব্রেলি হল, ইয়র্কশায়ার

প্রিয় কোয়ার্টারমেইন,
কয়েক দিন আগে চিঠি মারফত তোমাকে জানিয়েছি যে আমি, আমার ভাই জর্জ ও ক্যাপ্টেন গুড ভালভাবে ইংল্যান্ডে এসে পৌছেছি। এখানে পৌছে ক্যাপ্টেন গুড শৌখিন পোশাক চড়িয়ে রাস্তায় বেড়াতে বের হয়। সম্প্রতি সে একটা দামী চশমাও কিনেছে। টোয়ালার দেশে যে ক্যাপ্টেন গুডকে দেখেছিলাম এ যেন ভিন্ন কোনো ব্যক্তি। তবে রাস্তাঘাটে তার শ্বেতশুভ্র পদযুগল প্রদর্শনের মজার কাহিনী আমি সবাইকে বলেছি। সেটা আবার একটা স্থানীয় খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। ক্যাপ্টেন গুড খুব খেপে আছে আমার ওপর।

কাজের কথায় আসি, ক্যাপ্টেন গুড ও আমি দুজনে মিলে আমরা এক রত্ন ব্যবসায়ীর কাছে হিরাগুলো নিয়ে দেখা করেছিলাম। ঐ হিরার যে কত দাম তা তুমি ভাবতেও পারবে না। দু একটা হিরা বাদ দিলে অন্যগুলোকে ব্রাজিলের শ্রেষ্ঠ রত্নের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা ঐ হিরা কিনতে আগ্রহী হলেও একসাথে এত দাম দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। পর্যায়ক্রমে এইসব হিরা বিক্রির পরামর্শ তারা দিয়েছে। খুব সামান্য পরিমাণের জন্য তারা এক লক্ষ আশি হাজার পাউন্ড দিতে চেয়েছে।

বাড়ি ফিরে এলে তুমি নিজের চোখেই সব কিছু দেখতে পাবে। হিরার তৃতীয় ভাগটা আমার নয়, ওটা আমার ভাই জর্জের। এবার ক্যাপ্টেন গুডের কথা বলি। সে এখন সাজগোজে মত্ত। প্রত্যহ শৌখিন পোশাক দেখা যাচ্ছে তার পরণে, কিন্তু এখানকার মেয়েদের কাউকেই তার ভাল লাগছে না। কেউই নাকি শারীরিক সৌন্দর্যে কিংবা মনের ভাব প্রকাশের মাধুর্যে ফৌলাটার ধারে কাছে যেতে পারে না।

তোমার দিন ফুরিয়েছে, কাজও শেষ হয়েছে এবং পয়সারও অভাব নেই। আমার বাড়ির কাছেই একটা বাড়ি বিক্রি হবে। আমি বলি, তুমি এটা কিনে নাও, তাহলে আমাদের প্রতিদিন দেখা সাক্ষাৎ হবে। যত তাড়াতাড়ি চলে আসবে, ততই ভাল। আমাদের অভিযানের কাহিনী তুমি লিখলে তা লোকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য হবে।

চিঠি পাওয়া মাত্র রওয়ানা হলে তুমি আমাদের এখানে বড়দিনের আগেই পৌঁছে যাবে, এখানে এলে তুমি তো আমার বাড়িতেই থাকবে। ক্যাপ্টেন গুড ও আমার ভাই জর্জ ঐ সময় আসছে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, তোমার পুত্রটি খুবই ঠাণ্ডা মাথার। কয়েক দিন আগে তার খেলনার বন্দুক থেকে সে আমার পায়ে গুলি মেরেছিল, তবে অপারেশন করে ছররা গুলো বের করে দিয়ে বলেছে : প্রতিটি শিকারি দলের সাথে একজন ডাক্তারি পড়া ছাত্র থাকলে দলের লোকদের খুব সুবিধা হয়।

ভাল থেকো, এখানে অবশ্যই আসবার চেষ্টা করো।

তোমার বন্ধু
হেনরি কার্টিস

পুনশ্চ : যে হাতিটি খিবাকে মেরেছিল তার দাঁত দুটো আমার হল ঘরে সাজিয়ে রেখেছি। যে কুড়ালটা দিয়ে আমি টোয়ালার শিরচ্ছেদ করেছিলাম সেটা আমার টেবিলের ওপর রাখা আছে। তুমি যখন এখানে আসবে তখন টোয়ালার দেওয়া লৌহ গালিচার বর্মটা নিয়ে আসবে।

হেনরি কার্টিস।

আজ মঙ্গলবার। শুক্রবারে যে জাহাজটা ইংল্যান্ড যাচ্ছে সেটা ধরেই আমি কার্টিসের কাছে যাব। আমার এই বই প্রকাশ করবার জন্য কার্টিস ছাড়া অন্য কারোর ওপর আস্থা রাখা যায় না।

অ্যালান কোয়ার্টারমেইন।

-০-



স্যার হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড ২২ জুন ১৮৫৬ সালে ইংল্যান্ডের নরফোক-এর ব্র্যাডেনহ্যামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন আইনজীবী। দশ ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম। উনিশ বছর বয়সে বাবার ইচ্ছানুযায়ী তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ উপ-রাজ্যপালের অফিসে চাকুরি নিয়ে চলে যান। তিনি ছিলেন একজন সরকারি অফিসার, সংস্কারক, কৃষি বিশারদ এবং সুপরিচিত গল্প লেখক। তাঁর রচিত চৌত্রিশটি অভিযান ভিত্তিক উপন্যাসের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, কিং সলোমন'স মাইনস, SHE এবং অ্যালান কোয়ার্টারমেইন।

১৮৮২ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে আইন নিয়ে পড়াশুনা করেন। এই সময় শুরু হয় তাঁর সাহিত্য রচনার জীবন। তাঁর লেখা বহু গল্পের বিষয়বস্তুর উৎস ছিল আফ্রিকাতে অর্জন করা অভিজ্ঞতা।

সাহিত্যচর্চা ছাড়াও কৃষি ও ভূমি ব্যবহারের ওপর তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। এই কাজের উপদেষ্টা হিসাবে তাঁকে পৃথিবীর নানা জায়গায় যেতে হয়েছে। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট কমান্ডার' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৪ মে ১৯২৫ সালে হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড ৬৮ বছর বয়সে ইংল্যান্ডের লন্ডন শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

অনুবাদক : চুনিলাল মুখোপাধ্যায় অন্য ভাষায় রচিত গল্প ও উপন্যাসকে অত্যন্ত সরল ভাষায় বাংলাতে নিয়ে আসেন। শুধু বিষয়বস্তু নয়, গল্পের আবেগ, মাধুর্য্য ও হাস্যরহস্যটি পর্যন্ত অবিকৃতভাবে পাঠকের কাছে পৌছে দিতে পারেন তিনি। অনুবাদ ছাড়াও তার মৌলিক রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে থাকে। ইংরেজি সাহিত্য, আইন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনি। বাস করেন কলকাতায়।

হারিয়ে যাওয়া একজনের খোঁজে তিন বন্ধু আফ্রিকার এক প্রত্যন্ত জায়গায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং নানা বিপদের মধ্যে পড়ে শেষে এমন এক দেশে পৌঁছায় যা বহির্বিশ্ব থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। সেখানে রয়েছে রাজা সলোমনের হিরের খনি; কিন্তু সেই রত্নাগারের কাছাকাছি পদার্পণ করা মানেই মৃত্যুভূমিতে পা রাখা।

রোমাঞ্চে ভরা এক দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী।

–অ্যান্ড্রু ল্যাং

ISBN 978 984 92345 1 7

9 789849 234517